ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।”

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতের সংবিধান, ধারা ৫১এ)

- সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ।
- মহৎ যেসব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।
- আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।
- ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্‌বোধন।
- দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ।
- অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ।
- বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের বিকাশ।
- সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা।
- জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছোতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা।
- পিতা-মাতা / অভিভাবকের দায়িত্ব ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনীতি

ভাগ - ২

দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

এন সি ই আর টি
অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ

©এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনীতি (ভাগ-২)
দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই

(এন সি ই আর টি-র Politics in India since Independence *(Part II)* পাঠ্যবইয়ের ২০১৯ সালের অনূদিত সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ২০২০

প্রকাশক : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা
ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

মূল্য : ১৪০ টাকা (একশত চল্লিশ টাকা)

অক্ষর বিন্যাস
পীযূষ পাল

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গো থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক,
এন ই আর আই ই, শিলং (এন সি ই আর টি)

ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক,
আর আই ই, ভুবনেশ্বর (এন সি ই আর টি)

অনুবাদক

ড. মোস্তাফা কামাল, শিক্ষক
কমল কুমার ভৌমিক, শিক্ষক
পৌলমী চক্রবর্তী, শিক্ষক
কিরীটি কুমার সাহা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
ড. প্রদীপ দে, শিক্ষক
সৌরভ বিশ্বাস, শিক্ষক
নির্মল চন্দ্র দেব, শিক্ষক

ভাষা পরিমার্জনা

শ্রী গৌতম রুদ্র পাল, শিক্ষক
শ্রীমতী এমেলি নাগ, শিক্ষিকা

Foreword

The National Curriculum Framework (NCF), 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily timetable is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days is actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or boredom. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hard work done by the textbook development committee responsible for this book. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in Social Sciences, Professor Hari Vasudevan, the Chief Advisors,

Professor Yogendra Yadav and Professor Suhas Palshikar and the Advisor, Professor Kanti Bajpai for guiding the work of this committee. Several teachers contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resources Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

New Delhi
20 November 2006

Director
National Council of Educational
Research and Training

Preface

Contemporary World Politics is part of the NCERT's effort to help students understand politics. Other books for students of Political Science in Classes XI and XII deal with various facets of politics — the Indian Constitution, politics in India, and political theory. *Contemporary World Politics* enlarges the scope of politics to the world stage.

The new Political Science syllabus has finally given space to world politics. This is a vital development. As India becomes more prominent in international politics and as events outside the country influence our lives and choices, we need to know more about the world outside. International affairs are discussed with great passion in India, but not always with sufficient understanding. We tend to rely on the daily newspaper, television, and casual conversation for our knowledge of how the world works. We hope this book will help students comprehend what is happening outside and India's relations with it.

Before we go any further, it is necessary to say something about why the book is titled 'world politics' rather than the more traditional 'international politics' or 'international relations'. In this world, the relationship between governments of different countries, or what we call international politics or international relations, is of course crucial. In addition, though, there are vital connections between governments, non-government institutions, and ordinary people. These are often referred to as transnational relations. To understand the world, it is not possible any longer to understand only the links between governments. It is necessary to understand what happens across boundaries also — and governments are not the only agents of what happens.

In addition, world politics includes politics within other countries, understood in comparative perspective. For instance, the chapter on events in the "second world" of the communist countries after the Cold War deals with internal developments in this region. The South Asia chapter presents the state of democracy amongst India's neighbours. This is the field of comparative politics.

The book is concerned with world politics as it is today, more or less. It does not deal with world politics through the 19th or 20th centuries. The politics of those eras is dealt with in the History textbooks. We deal with the 20th century only to the extent that it is the background to present events and trends. For instance, we begin with the Cold War because it is impossible to comprehend where we are today without an understanding of what the Cold War was and how it ended.

How should you use this book? Our hope is that this book will serve as an introduction to world politics. Teachers and students will use the book as a springboard to find out more about contemporary world politics. Each chapter will give you a certain amount of information. It will also, though, give you some useful concepts with which to understand the world: the Cold War; the notion of hegemony; international organisations; national security and human security; environmental security; globalisation; and so on.

Each chapter begins with an overview to quickly give you an idea of what to

expect. Each chapter also has maps, tables, graphics, boxes, cartoons, and other illustrations to enliven your reading and to get you to reflect on world politics by provoking, challenging, or amusing you. The characters — Unni and Munni, introduced in earlier books, reappear. They ask their innocent, often mischievous, frequently probing questions. The chapters have suggestions on group activity ("Let's Do It Together")—collecting materials together, solving an international problem, making you negotiate as if you were a diplomat. Then there are the "plus boxes" which provide information not so much for tests and examination questions but rather to fill out knowledge, to summarise information that would burden the text, and, sometimes, to urge you to think further about the subject. The exercises at the end of each chapter should help review materials that you have read and take you beyond what has been said in the chapter.

You will notice also that the book is filled with maps. It is difficult if not impossible to understand world politics without a sense of where various places are located, who lives next door to whom, where boundaries, rivers, and other political and geographical features are in relation to each other. We have, therefore, been quite liberal in providing maps. These maps are to help orient you, to visualise the political and geographical spaces that you read about. They are not intended to be things you have to draw and memorise for tests!

This brings us to a crucial point about how to use the book. We have made a conscious effort not to load you down with information—with names, dates, events. We have tried to keep these to a minimum. The idea is not for you to become an expert on world politics but instead to begin to grapple with the complexity and urgency of this new world around us. At the same time, should you wish to know more about world politics, you can consult the various sources mentioned separately under, "If you want to read more…".

If the book succeeds in stimulating you, in making you ask even more questions than we have posed for you, and in making you impatient with what you have read here, then we have succeeded! We sincerely hope that you will like this book and find it engaging and useful.

We are grateful to Professor Krishna Kumar, Director, NCERT, for his support and guidance in the preparation of this book. He encouraged us in making this book as student-friendly as possible. He also patiently waited for the final draft of the book.

Contemporary World Politics would not have been possible without the valuable time and academic expertise of the members of the Textbook Development Committee. Each of the members gave us their precious time and set aside prior commitments at various junctures. Professor Sanjay Chaturvedi and Dr. Siddharth Mallavarapu deserve our special thanks for their help in selecting maps and in editing the text. We are grateful for the devotion and sincerity of Dr. M. V. S. V. Prasad, the coordinator of this textbook from the NCERT, as also Mr. Alex M. George and Mr. Pankaj Pushkar who worked day and night to ensure the quality of the text, the authenticity of the contents, and above all, the readability of this book. Ms. Padmavathi worked on all the exercises. The designer of this book, Ms. Shweta Rao, gave the book the attractive look and feel that it has. Without their unstinting and creative help, we could not have produced the book in its present form.

Kanti Bajpai
Advisor

Yogendra Yadav, Suhas Palshikar
Chief Advisors

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Committee for Textbooks at the Senior Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor*, Department of History, University of Calcutta, Kolkata

Chief Advisors

Yogendra Yadav, *Senior Fellow*, Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), Delhi

Suhas Palshikar, *Professor*, Department of Politics and Public Administration, University of Pune, Pune

Advisor

Kanti P. Bajpai, *Headmaster*, The Doon School, Dehradun

Members

Alex M. George, *Independent Researcher*, Eruvatty, District Kannur, Kerala

Anuradha M. Chenoy, *Professor*, Centre for Russian and Central Asian Studies, SIS, JNU, New Delhi

Madhu Bhalla, *Professor*, Department of East Asian Studies, University of Delhi, Delhi

Navnita Chadha Behera, *Reader*, Department of Political Science, University of Delhi, Delhi

Padmavathi, B.S., *Faculty*, Social Sciences, International Academy for Creative Teaching (iACT), Bangalore

Pankaj Pushkar, *Senior Lecturer*, Directorate of Higher Education (Uttarakhand), Haldwani

Sabyasachi Basu Ray Chaudhury, *Reader*, Department of Political Science, Rabindra Bharati University, Kolkata

Samir Das, *Reader*, Department of Political Science, University of Calcutta, Kolkata

Sanjay Chaturvedi, *Reader*, Centre for Study of Geopolitics, Department of Political Science, Panjab University, Chandigarh

Sanjay Dubey, *Reader,* DESSH, NCERT

Shibashis Chatterjee, *Lecturer*, Department of International Relations, Jadavpur University, Kolkata

Siddharth Mallavarapu, *Assistant Professor*, Centre for International Politics, Organisation and Disarmament, SIS, JNU, New Delhi

Varun Sahni, *Professor*, Centre for International Politics, Organisation and Disarmament, SIS, JNU, New Delhi

Member-coordinator

Malla V. S. V. Prasad, *Lecturer,* Department of Education in Social Sciences and Humanities (DESSH), NCERT, New Delhi

Acknowledgements

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) acknowledges all those who contributed – directly and indirectly – to the development of this textbook.

We offer thanks to Professor Savita Sinha, *Head,* DESSH for her support. We gratefully acknowledge the efforts of the administrative staff of DESSH.

We want to record our sincere appreciation of the generous institutional support provided by the *Lokniti* programme of the Centre for the Study of Developing Societies (CSDS). We would like to thank Professor Peter R. De Souza, *Director, Lokniti*, in particular.

The Council gratefully acknowledges the contribution of the following individuals and institutions: Mr. Robert W. Gray, *Chief,* United Nations Postal Administration, New York for granting approval to use UN stamps; Professor K. C. Suri for valuable inputs; Cagle Cartoons Inc. for providing copyrights of the cartoons of Andy Singer, Angel Boligan, Ares, Cam Cardow, Christo Komarnitski, Deng Coy Miel, Harry Harrison, Mike Lane, Milt Priggee, Pat Bagley, Petar Pismestrovic and Tab; Mr. Kutty (*Laughing with Kutty*), *The Hindu*, and *Pakistan Tribune* for the cartoons; cartoonist Irfaan Khan for the drawings; M/s. Cartographic Designs for providing two maps (India and its neighbours and the world map); the Parliament Library, the United Nations Information Centre, New Delhi and Gobar Times (*Down to Earth* supplements) for providing materials; and wikipedia and flickr.com (downloaded before 31 Dec 2006) for providing images.

The production of the book benefited greatly from the efforts of the Publications Department. Our special thanks to Purnendu Kumar Barik, *Copy Editor,* and Neelam Walecha, *DTP Operator*.

সূচিপত্র

ভাগ-II স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনীতি

অধ্যায় 1	রাষ্ট্র নির্মাণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ	1
অধ্যায় 2	এক দলীয় আধিপত্যের যুগ	26
অধ্যায় 3	পরিকল্পিত উন্নয়নের রাজনীতি	46
অধ্যায় 4	ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক	64
অধ্যায় 5	কংগ্রেসি ব্যবস্থার সমস্যা ও তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা	82
অধ্যায় 6	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট	102
অধ্যায় 7	গণ-আন্দোলনের উত্থান	128
অধ্যায় 8	আঞ্চলিক প্রত্যাশা	148
অধ্যায় 9	ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক ঘটনাবলি	172

1947 সালে কোলকাতা শহরটিতে টহলরত ট্রাক থেকে হিন্দু এবং মুসলমানরা ভারত ও পাকিস্তানের পতাকা সম্মিলিতভাবে উড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। এই বিরল চিত্রটি ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার আনন্দ এবং দেশভাগের দুঃখকে একসাথে ধারণ করেছিল।

এই অধ্যায়ে...

স্বাধীন ভারতের প্রথম কয়েক বছর ছিল অত্যন্ত সমস্যা বহুল। ভারতের সব থেকে বড় সমস্যা ছিল রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং প্রাদেশিক অখণ্ডতা রক্ষা করা। স্বাধীন ভারতের রাজনীতির আলাচনা আমরা এইসব সমস্যার কথার মাধ্যমেই শুরু করবো। এই অধ্যায়ে আমরা দেখবো কীভাবে 1947 সালের প্রথম দশকে রাষ্ট্র গঠনের এই তিনটি সমস্যার কীভাবে মীমাংসা করা হয়েছিল।

- স্বাধীনতা দেশভাগের মাধ্যমে আসে। যার ফলস্বরূপ ব্যাপক আকারে সহিংসতা এবং বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ধারনার উপর আঘাত করে।
- রাজন্যশাসিত অঞ্চলগুলোকে ভারতীয় ইউনিয়নে সংযুক্তিকরণের জন্য জরুরি সমাধানের প্রয়োজন ছিল।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাই তাদের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করার জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ সীমারেখা নতুন করে নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল।

পরবর্তী দুটো অধ্যায়ে আমরা অন্যান্য চ্যালেঞ্জগুলোরও চর্চা করবো, যেগুলো স্বাধীনতার প্রারম্ভিক পর্যায়ে দেশ মুখোমুখি হয়েছিল।

অধ্যায় 1

রাষ্ট্র নির্মাণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Challenges of Nation Building)

নতুন রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Challenges for the new nation)

1947 সালের 14-15 আগস্টের মধ্যরাতে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সেই রাতে গণপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছিলেন। এটি উনার প্রসিদ্ধ ভাষণ “নিয়তির সঙ্গো মিলন” (tryst with destiny) এর সঙ্গো তোমরা সবাই পরিচিত।

ভারতীয় জনগণ এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল। তোমরা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে পড়েছো যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে অনেকেই জোড়ালো দাবি তুলেছিল। কিন্তু দুটি লক্ষ্যের প্রতি সকলেই প্রায় একমত ছিলেন। প্রথমতঃ স্বাধীনতার পরে আমরা আমাদের দেশকে গণতান্ত্রিক সরকারের মাধ্যমে পরিচালনা করবো এবং দ্বিতীয়তঃ সরকার সবার স্বার্থে কাজ করবে, বিশেষত দরিদ্র এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য পরিচালিত হবে। দেশ যখন স্বাধীন হল তখন স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবের মাটিতে রূপ দেওয়ার সময় এসেছিল।

এই কাজটি করা এতটাও সহজ ছিল না। স্বাধীন ভারতের জন্ম অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে হয়েছিল। সম্ভবত 1947 সালে ভারতের থেকে বেশি কঠিন পরিস্থিতিতে অন্য কোনো দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেনি। স্বাধীনতা আসে কিন্তু দেশ ভাগের ফলে। 1947 সালটি ছিল অভুতপূর্ব সহিংসতা এবং বাস্তুচ্যুতির মতো এক মানসিক যন্ত্রণা। এই পরিস্থিতিতেই স্বাধীন ভারতবর্ষকে নিজস্ব বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করার জন্য যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল। তবু স্বাধীনতার সাথে আসা এই অশান্তি আমাদের নেতৃবৃন্দকে এটা ভুলে যেতে দেয়নি যে এই নতুন দেশ বহুবিদ্ সমস্যার সম্মুখীন।

Credit: PIB

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু লালকেল্লা থেকে বক্তব্য রাখছেন, 15ই আগস্ট, 1947

The Hindustan Times

LARGEST CIRCULATION IN NORTHERN, NORTH-WESTERN AND CENTRAL INDIA

VOL. XXIV, NO. 198 NEW DELHI: SATURDAY, JULY 19, 1947 PRICE TWO ANNAS

END OF 200-YEAR-OLD BRITISH RULE IN INDIA

ROYAL ASSENT TO INDEPENDENCE BILL

BRIEF BUT COLOURFUL CEREMONY IN LORDS

Two Dominions Created

Provisional Govt. For Burma

ANNOUNCEMENT LIKELY NEXT WEEK

FREE INDIA FLAG

MESSAGE FROM PREMIER

CONSTITUENT ASSEMBLY

UNION'S RELATIONSHIP WITH RULERS

PROVISION FOR PROVINCES' JURISDICTION IN STATES

Sir Shafaat Ahmed Khan Dead

Return Of Bullaert To Viet-Nam Welcomed

Hindustan Times, 19 July 1947

তিনটি প্রতিবন্ধকতা (Three Challenges)

> আগামীকাল আমরা ব্রিটিশ আধিপত্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত হব। কিন্তু মধ্যরাতে তারাও বিরক্ত হয়ে যাবে। এই কারণে আগামীকাল আমাদের জন্য আনন্দের পাশাপাশি শোকের দিন।
>
> *মহাত্মা গান্ধি*
> 14ই আগস্ট 1947, কোলকাতা।

মূলত, স্বাধীন ভারতবর্ষ তিন ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছিল। প্রথম এবং তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ ছিল ঐক্যবন্ধ দেশকে গঠন করা, যেখানে আমাদের সমাজের বিবিধতার জন্য উপযোগী জায়গা থাকবে। ভারত আকারে এবং বিবিধতায় একটি মহাদেশের সমান ছিল। এখানকার জনগণ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ধর্ম অনুসরণ করে। তখন অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে এই ধরনের বিবিধতায় ভরপুর একটি দেশ দীর্ঘকাল এক থাকতে পারে না। দেশের বিভাজন জনগণের মনে এই আশঙ্কাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছিল। ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল : ভারত কি ঐক্যবন্ধ দেশ হিসেবে থাকতে পারবে? ভারত কি জাতীয় ঐক্যকে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য উদ্দেশ্যকে বলিদান দেবে? এর অর্থ কি সমস্ত আঞ্চলিক এবং উপজাতীয় পরিচয়কে প্রত্যাখ্যান করা? এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল : কীভাবে ভারতের ভূখণ্ডের একীকরণ সম্ভবপর হবে?

দ্বিতীয় প্রতিন্ধকতা ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তোমরা আগেই ভারতের সংবিধান অধ্যয়ন করেছ। তোমরা জান যে ভারতীয় সংবিধান তার প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং ভোটাধিকার প্রদান করেছ। ভারত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রকে গ্রহণ

করেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সুনিশ্চিত করে যে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হবে। গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রয়োজনীয় কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। আরেকটি প্রতিবন্ধকতা ছিল সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিকাশ করা।

তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি ছিল শুধুমাত্র কয়েকটি বিভাগের নয়, সমগ্র সমাজের উন্নয়ন ও মঙ্গল সুনিশ্চিত করা। সংবিধান এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে সামাজিক দিক থেকে সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের জন্য সাম্য ও বিশেষ সুরক্ষার নীতি গ্রহণ করেছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যে সকল জনকল্যাণমূলক লক্ষ্য অর্জন করতে হবে তা সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিতে ঘোষণা করেছে। তখন প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থনৈতিক উনয়ন ও দারিদ্র্যতা বিমোচন করার জন্য কার্যকর নীতি তৈরি করা।

স্বাধীন ভারত কীভাবে এই প্রতিবন্ধকতাগুলিকে মোকাবেলা করেছিল? সংবিধান নির্ধারিত বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ভারত কতটা সফল হয়েছিল? এই বইটি এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা। এই বইটিতে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের ভারতীয় রাজনীতির বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে, যার ফলে তোমরা এই সকল বড় প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকেই বিকশিত করতে পারবে। স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে দেশ কীভাবে উপরে বর্ণিত তিনটি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছিল তা আমরা প্রথম তিনটি অধ্যায় থেকে জানায় চেস্টা করবো।

এই অধ্যায়ে, আমরা দেশ গঠনের প্রথম প্রতিবন্ধকতার দিকে মনোনিবেশ করবো, যা স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল। প্রথমে আমরা সেইসব ঘটনা নিয়ে চর্চা করবো যেগুলো স্বাধীনতা প্রাপ্তি পটভূমি তৈরি করেছিল। এটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করতে পারে কেন স্বাধীনতার সময় জাতীয় একতা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপরে আমরা দেখতে পাবো যে ভারতে কীভাবে প্রচলিত ইতিহাস এবং যৌথ নিয়তিকে সংঘবন্ধ করে নিজেকে একটি রাষ্ট্রের রূপ দিয়েছিল। এই ঐক্য বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করেছিল এবং অঞ্চল ও বিভিন্ন বিভাগের লোকেদের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যকেও মোকাবিলা করতে হয়েছিল। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সাম্য ও ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিকাশ অর্জনের প্রতিবন্ধকতার উপর আলোচনা করবো।

আমার ইচ্ছে ছিল আমার কাছে যেন একটি টাইম মেশিন থাকে, সুতরাং তার সাহায্যে আমি 1947 সালের 15 আগস্টে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতা উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এখানে বিষয়টি আমার ভাবনা থেকে অন্যরকম

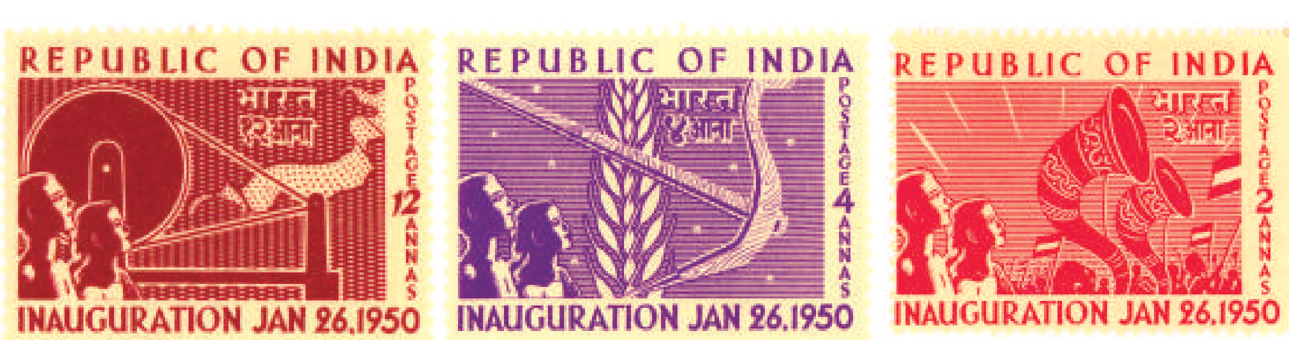

এই তিনটি ডাক টিকিট 1950 সালে 26 জানুয়ারি প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে 1950 সালে জারি করা হয়েছিল। এই ডাক টিকিটের চিত্রগুলো তোমাকে নতুন গণতন্ত্রের কোন্ কোন্ প্রতিবন্ধকতার কথা বলছে? যদি তোমাকে 1950 সালে এই ডাকটিকিগুলোর নক্সা করতে বলা হয়, তবে তুমি কোন্ চিত্রটি বেছে নেবে?

FUTURE CORRESPONDENCE ABOUT
MAARIF-UL-QURAN
please be made at the following address—
Publisher, MAARIF-UL-QURAN,
C/o Mr. PARVEZ
HOME DEPARTMENT
GOVERNMENT OF PAKISTAN
KARACHI

Dawn

Founded By QAED-E-AZAM MOHAMMAD ALI JINNAH
Edited by ALTAF HUSAIN

WHILE IN KARACHI
VISIT
MANCHESTER HOUSE
TAILORS
The Authority on Style & Clothes
(Sherwani Specialists)
Phone: 7331
ELPHINSTONE STREET
KARACHI

QAED-E-AZAM'S TRIBUTE TO BRITISH PEOPLE

Absolute Transfer Of Power Unknown In World History

PAKISTAN TO MAINTAIN FRIENDSHIP WITH BRITAIN AND HINDUSTAN

JINNAH'S SPEECH AT STATE DINNER TO LORD & LADY MOUNTBATTEN

Dawn, Karachi, 14 August 1947

স্বাধীনতার প্রভাব

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ

এই অস্বচ্ছ, মলিন আবছা আলো
এই নিশি বিধৌত প্রভাত
এটা নিশ্চিতভাবে কাঙ্খিত সেই সকাল নয়।
এটা সেই সকাল নয় যার খুঁজে বন্ধুদের প্রত্যাশায় আমরা বেড়িয়েছিলাম
কখনো বা কোথাও তাদের খুঁজ পাবো বলে,
হয়তো তাদের খোঁজে পাবো গহিন আকাশের তারাপুঞ্জের দূর প্রান্তরে
হয়তো বা খুঁজে পাবো তরঙ্গাময় রাতের গভীরে, সমুদ্রের কিনারার খাঁজে,
মর্মাহত হৃদয়ের শোকার্ত নৌকা,
নিশ্চয়ই থমকে দাঁড়াবে কোথাও না কোথাও...

উর্দু কবিতা 'সুবহ-ই-আজাদি' থেকে অংশ বিশেষ অনুদিত।

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ (1911-1944) শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ, দেশ বিভাজনের পর পাকিস্তানে বসবাস করেছিলেন, রাজনৈতিক দিক থেকে বামপন্থী, পাকিস্তানি সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাকে কারাবন্দি করা হয়েছিল। তার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে নক্সে-ই-ফরিয়াদি, দস্ত-এ-সভা এবং জিন্দা-নামা। বিংশ শতাব্দিতে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মহা কবি হিসেবে সম্মানিত।

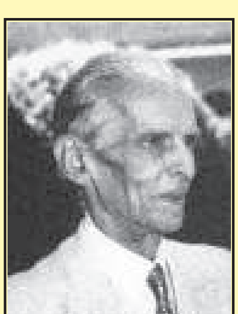

আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই জটিলতাকে দূর করার জন্য প্রাণবন্তভাবে কাজ করতে হবে। হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় দুটিতেই বিভিন্ন লোক রয়েছে, কারণ মুসলমান হিসেবে আমাদের মধ্যে পাঠান, পাঞ্জাবী, সিয়া, সুন্নি এবং আরো অনেক কিছু রয়েছে আর হিন্দু হিসেবে আপনাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈষ্নব, ক্ষত্রিয়, বাঙালি, মাদ্রাসি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে— বিলুপ্ত হয়ে যাবে... আপনারা মুক্ত; আপনারা নির্দ্বিধায় পাকিস্তানের মন্দিরে মসজিদে বা অন্য কোনো উপাসনালয়ে যেতে পারেন। আপনি যে-কোনো বর্ণ ও ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারেন— তার সাথে রাষ্ট্রের কোনো যোগসূত্র নেই।

Mohammad Ali Jinnah, Presidential Address to the Constituent Assembly of Pakistan at Karachi, 11 August 1947.

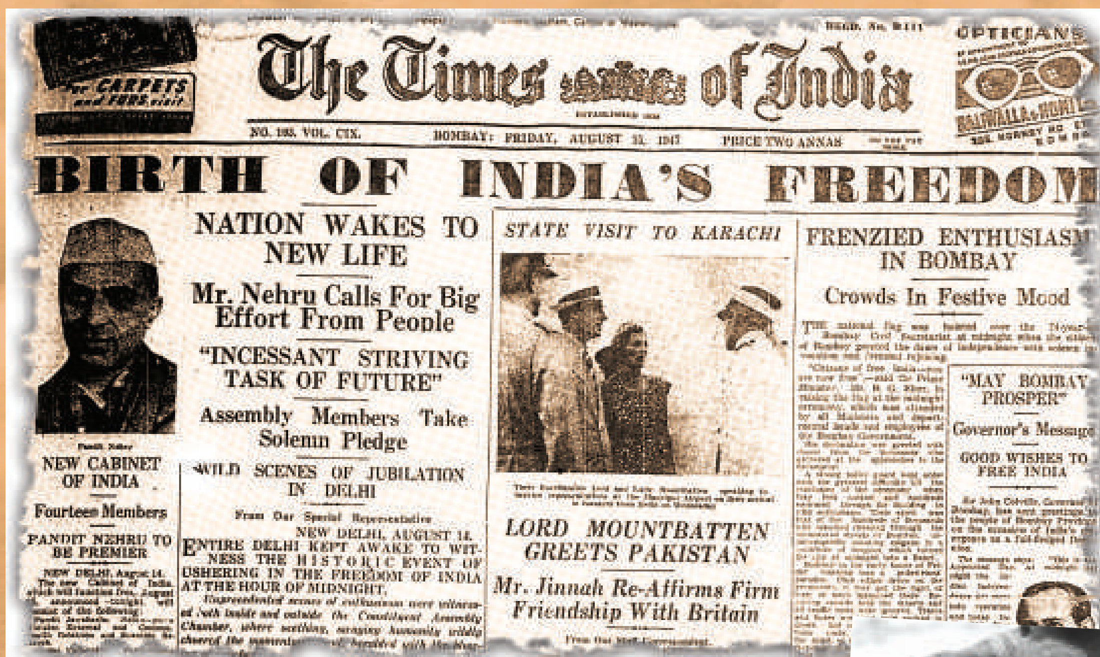
The Times of India

NO. 193. VOL. CIX. BOMBAY: FRIDAY, AUGUST 15, 1947 PRICE TWO ANNAS

BIRTH OF INDIA'S FREEDOM

NATION WAKES TO NEW LIFE

Mr. Nehru Calls For Big Effort From People

"INCESSANT STRIVING TASK OF FUTURE"

Assembly Members Take Solemn Pledge

WILD SCENES OF JUBILATION IN DELHI

NEW CABINET OF INDIA

Fourteen Members

PANDIT NEHRU TO BE PREMIER

ENTIRE DELHI KEPT AWAKE TO WITNESS THE HISTORIC EVENT OF USHERING IN THE FREEDOM OF INDIA AT THE HOUR OF MIDNIGHT

STATE VISIT TO KARACHI

LORD MOUNTBATTEN GREETS PAKISTAN

Mr. Jinnah Re-Affirms Firm Friendship With Britain

FRENZIED ENTHUSIASM IN BOMBAY

Crowds In Festive Mood

"MAY BOMBAY PROSPER"

Governor's Message

GOOD WISHES TO FREE INDIA

The Times of India, Bombay, 15 August 1947

ওয়ারিশ শাহ্ এর প্রতি আজ আমার আহ্বান

অমৃতা প্রীতম

আজ ওয়ারিশ শাহ এর প্রতি আমার আহ্বান, "কবর থেকে সাড়া দাও"
আজই জেগে ওঠো, প্রেম পুস্তকের নতুন ভালোবাসার পাতা খুলো,
একদা, পাঞ্জাব দুহিতা কেঁদেছিল এবং তুমি লিখেছিলে বিরহের বিরল কাহিনী
আজ, লক্ষ দুহিতা কাঁদছে আবার, তোমার কাছে, হে ওয়ারিশ শাহ
জাগ্রত হও ! হে বেদনার কথাকার; জাগ্রত হও ! তোমার পাঞ্জাবের দিকে তাকাও
আজ, মাঠে মাঠে মৃত্যুর মিছিল, রক্ত মাখা চেনাব
পঞ্চ নদীর প্রবাহমানতাকে বিষাক্ত করেছে কেউ
আমাদের বিস্তৃত মাঠ বিষাক্ত জলে সিঞ্চিত এখন
উর্বর ভূমিতে এমন অঙ্কুরিত হও বিষাক্ত জল বিন্দু
দিগন্ত বিস্তৃত জমাট বাঁধা রক্তের কারণে আকাশ এখন লাল
অরণ্য এখন বিষাক্ত বাতাসে ভরপুর, যন্ত্রণার গভীর থেকে উঠে আসে আর্তচিৎকার
বাঁশের বাঁশি যেন এখন বিষধর সাপ...

"আজ আখান ওয়ারিশ শাহ্ নান" নামক পাঞ্জাবী কবিতার অংশ বিশেষের অনুবাদ

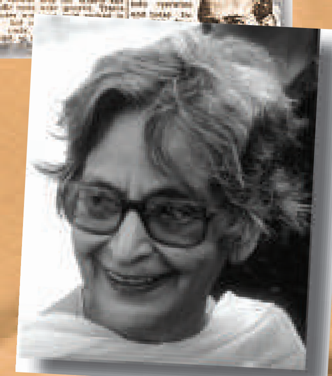

অমৃতা প্রিতম (1919-2005) : বিশিষ্ট পাঞ্জাবী কবি ও কথা সাহিত্যিক; সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী ও জ্ঞানবীর পুরস্কার প্রাপক, দেশ বিভাগের পর তিনি দিল্লিতে বসবাস করেন এবং তিনি শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাবী মাসিক পত্রিকা 'নাগমনি' রচনায় এবং সম্পাদনায় সক্রিয় ছিলেন।

আমাদের মুসলিম সংখ্যালঘু সংখ্যায় এত বেশি যে তারা ইচ্ছা করলেও অন্য কোথাও যেতে পারেনা। এটি একটি মৌলিক সত্য যা সম্পর্কে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না। পাকিস্তানের যে কোনো উস্কানি হোক না কেন এবং সেখানে অমুসলিমদের উপর যে-কোনো রকমের অসম্মান ও ভয়াবহতার ঘটনা ঘটুক না কেন আমাদের ওই সংখ্যালঘুদের সাথে সভ্য আচরণ করতে হবে। আমরা অবশ্যই তাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুরক্ষা এবং নাগরিক অধিকার প্রদান করবো। যদি আমরা এটি করতে ব্যর্থ হই তবে আমাদের একটি জ্বলন্ত ক্ষত হবে যা অবশেষে রাজনীতির অঙ্গানকে বিষাক্ত করবে এবং সম্ভবত এটিকে ধ্বংস করে দেবে।

Jawaharlal Nehru, Letter to Chief Ministers, 15 October 1947.

বিভাজন : স্থানচ্যুতি এবং পুনর্বাসন (Partition: displacement and rehabilitation)

1947 সালে 14-15 আগস্টে একটি নয় দুটি জাতি-রাষ্ট্র তথা ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। এটি ছিল ‘বিভাজন’ এর ফল, ব্রিটিশ ভারতকে ‘ভারত’ ও ‘পাকিস্তানে’ ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি দেশের ভূ-ভাগের সীমানা নির্দেশ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত সীমা চিহ্নিত করা হয়েছিল যা তোমরা ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে পড়েছো। মুসলিম লিগের ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব’ অনুযায়ী ভারতে এক রকম নয়, দু’রকম ‘মানুষ’ রয়েছে, তা হল হিন্দু এবং মুসলমান। সেই কারণেই তারা পাকিস্তানের দাবি করেছিল যা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক দেশ। কংগ্রেস এই তত্ত্ব এবং পাকিস্তানের দাবির বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু 1940 এর দশকে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনাক্রম, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনের সিদ্ধান্তকে সহায়তা করেছিল।

বিভাজন প্রক্রিয়া (Process of partition)

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে তখন পর্যন্ত যে ভূভাগ ‘ভারত’ নামে পরিচিত ছিল তা দুটি দেশ— ‘ভারত’ এবং ‘পাকিস্তানে’ বিভক্ত হবে। এই ধরনের বিভাজন শুধুমাত্র বেদনাদায়কই ছিল না, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করাও কঠিন ছিল। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মূলত এর অর্থ হলো, যে অঞ্চলগুলোতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তারা পাকিস্তান অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অবশিষ্ট অংশ ভারতের সাথেই থাকবে।

এই ধারণাটি সহজ মনে হতে পারে কিন্তু এই ধারণাটি অনেক ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল, প্রথমত ব্রিটিশ ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল ছিল না। পূর্ব এবং পশ্চিম এই দুটি অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এই দুটি অঞ্চলকে একত্রিত করার কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে পাকিস্তান নামে নতুন দেশ দুটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে, যা হল পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান। এই দুটি অঞ্চল ভারতের বিস্তৃর্ণ ভূ-ভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। দ্বিতীয়তঃ সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানে থাকতে চায়নি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবিসংবাদিত নেতা এবং ‘সীমান্ত গান্ধি’ নামে পরিচিত খান আব্দুল গফফর খান দ্বি-জাতি তত্ত্বের তীব্র বিরোধী ছিলেন। অবশেষে তার দাবিকে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

তৃতীয় সমস্যাটি হল ব্রিটিশ ভারতের দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বাংলায় এমন অনেক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল যেখানে অমুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যে জেলা বা নিম্নস্তর পর্যায়ে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুসারে এই দুটি প্রদেশকে দ্বি-খণ্ডিত করা হবে। 1947 সালের 14-15 আগস্টের মধ্যরাত্র পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যয়নি। এর অর্থ হলো স্বাধীনতার দিন বিপুল সংখ্যক মানুষ জানত না যে তারা ভারতের না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঞ্জাব এবং বাংলা এই দুটি প্রদেশের বিভাজন গভীরতম দুর্দশার কারণ হয়েছিল।

এই বিভাজনের সকল সমস্যার মধ্যে চতুর্থ এবং সবচেয়ে জটিল সমস্যাটি হল সীমান্তের দু’দিকের ‘সংখ্যালঘুদের’

সমস্যা। যেসব অঞ্চল পাকিস্তানে ছিল সেখানে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ এবং একইভাবে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান ভারতীয় অংশের পাঞ্জাব ও বাংলায় (এবং কিছুটা দিল্লি ও আশপাশের অঞ্চল) আটকে পড়েছিল। তারা দেখতে পেল যে তারা নিজেদের গৃহে অনাকাঙ্খিত বিদেশি হয়ে গিয়েছিল, যেখানে তারা এবং তাদের পূর্ব পুরুষরা শতাব্দী ধরে বসবাস করে আসছে। দেশ বিভাজনের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে উভয়দিকের সংখ্যালঘুরা আক্রমণের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হয়। কেউ অনুমান করতে পারেনি যে এই সমস্যাটি একটি বিকট সমস্যায় পরিণত হতে চলছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কারো হাতে কোনো পরিকল্পনা ছিল না। প্রাথমিকভাবে জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই আশা করেছিলেন যে এই সহিংসতা ক্ষণস্থায়ী এবং শীঘ্রই এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কিন্তু খুব শীঘ্রই সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সীমান্তের উভয় দিকের সংখ্যালঘুদের কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তাদের গৃহ ছেড়ে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না।

বিভাজনের পরিণাম (Consequences of partition)

1947 সালে অনেক বড় পরিসরে জনগণ স্থানান্তর হতে বাধ্য হয়েছিল। জনগণের এই স্থানান্তর ছিল অপ্রত্যাশিত, অপরিকল্পিত এবং মর্মান্তিক যা মানব ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য স্থানান্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। সীমান্তের দু'দিকে হত্যা ও নৃশংসতার ঘটনা ঘটে। ধর্মের নামে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্য সম্প্রদায়ের লোককে নির্বিচারে হত্যা করে। লাহোর, অমৃতসর ও কলকাতার মতো শহরগুলো

Credit: DPA.

শরণার্থী ভর্তি একটি রেল, সাল 1947

অতিথিসেবায় বিলম্ব

সাদাত হাসান মন্টো

দাঙ্গাবাজরা চলমান ট্রেনটিকে থামিয়ে দিয়েছিল। অন্য সম্প্রদায়ের লোকজনকে টেনে এনে তরোয়াল ও গুলি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

অবশিষ্ট যাত্রীদের হালুয়া, ফল ও দুধ দেওয়া হয়েছিল।

প্রধান সংগঠন বলেছিলেন, 'ভাই ও বোনেরা, ট্রেন আগমনের খবর আসতে বিলম্ব হয়েছিল। সেই কারণেই আমরা আপনাদেরকে মনমুগ্ধকরভাবে আপ্যায়ণ করতে পারিনি— আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম'।

উৎস : উর্দু ছোট গল্প কাসের-নাফসি এর ইংরেজি অনুবাদ

'সাম্প্রদায়িক অঞ্চলসমূহে' বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানরা এমন সব অঞ্চলে যাওয়া এড়িয়ে যেত যেখানে মূলত হিন্দু বা শিখরা বসবাস করত; একইভাবে হিন্দু ও শিখরা মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে দূরে থাকত।

মানুষকে প্রচুর দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে বাড়িঘর ত্যাগ করে সীমান্ত পেরিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। সীমান্তের উভয় দিকের সংখ্যালঘুরা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং 'শরণার্থী শিবিরগুলোতে অস্থায়ী আশ্রয় নেয়। তারা তাদের নিজের দেশেই পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা প্রায়শই অবহেলিত হয়েছিল। নতুন সীমান্তের অন্যদিকে যাতায়াতের জন্য তারা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করেছিল, এমনকি তারা পায়ে হেঁটেও গিয়েছিল। এই যাত্রার সময় তারা প্রায়শই আক্রমণ, হত্যা বা ধর্ষণের শিকার হতো। সীমান্তের দু'পাশে হাজার হাজার মহিলাকে অপহরণ করা হয়েছিল। তাদের অপহরণকারীর ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল এবং তাদের বিবাহ করতেও বাধ্য করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সম্মান রক্ষা করার জন্য তাদের পরিবারের সদস্যরা মহিলাদের হত্যা করেছিল। অনেক শিশু তাদের মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অনেকেই যারা সীমান্ত অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল তারা দেখতে পেয়েছিল যে তাদের কোন বাড়িঘর নেই। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের জন্য দেশের স্বাধীনতার অর্থ ছিল শরণার্থী শিবিরগুলোতে কয়েক মাস এবং কখনো কখনো বছরের পর বছর ধরে জীবন-যাপন করা।

Credit: Nehru Memorial Museum and Library

1947 সালে নোয়াখালিতে (বর্তমানে বাংলাদেশ) মহাত্মা গান্ধি

ভারত ও পাকিস্তানের লেখক, কবি এবং চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাদের উপন্যাস, ছোট গল্প এবং চলচ্চিত্রগুলোতে হত্যার নির্মমতা, বাস্তুচ্যুতি ও সহিংসতার যন্ত্রণা প্রকাশ করেছেন। দেশভাগের মানসিক আঘাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে তারা একটি বাক্যের ব্যবহার প্রায়শই করেছেন, যা জীবিত ব্যক্তিরা বিভাজনকে বর্ণনা করেছিলেন— এটি একটি 'হৃদয়ের বিভাজন'।

এই বিভাজনটি কেবল সম্পত্তি, ঋণ ও সম্পদের বিভাজন বা দেশের রাজনৈতিক বিভাজন এবং প্রশাসনিক বিভাজনই ছিল না,আর্থিক সম্পত্তি এবং টেবিল, চেয়ার, টাইপ

রাইটার, কাগজের ক্লিপ, বই এবং পুলিশ ব্যান্ডের বাদ্যযন্ত্রগুলোর মতো জিনিসগুলোও বিভাজিত হয়েছিল! সরকার ও রেলওয়ে কর্মীদেরও 'বিভক্ত' করা হয়েছিল। সর্বোপরি এটি ছিল এমন সম্প্রদায়গুলোর সহিংস বিচ্ছেদ যা তখনো পর্যন্ত প্রতিবেশী হিসেবে একত্রে বসবাস করছিলেন। অনুমান করা হয় যে দেশভাগের কারণে প্রায় 80 লক্ষ মানুষকে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে নতুন সীমান্ত পেরিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। দেশ বিভাজন সম্পর্কিত সহিংসতায় পাঁচ থেকে দশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল।

প্রশাসনিক অসুবিধা এবং আর্থিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও বিভাজনের ফলে অন্যান্য গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দ্বি-জাতি তত্ত্বকে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তার পরেও ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল। এটা কি ভারতকে নিজে নিজেই হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল? এমনকি নতুন নির্মিত পাকিস্তানে মুসলমানদের বৃহৎ অংশ দেশান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও 1951 সালে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার 12 শতাংশ ছিল। সুতরাং, ভারত সরকার কীভাবে তার মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের (শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সী এবং ইহুদি) সাথে ব্যবহার করেছিল? বিভাজন তখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব তৈরি করেছিল।

এই বিরোধগুলোর পেছনে প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম লিগ গঠন করা হয়েছিল। এটি ছিল পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবির প্রধান বিষয়। একইভাবে কিছু সংগঠন ছিল, যারা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য হিন্দুদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছিল। তবে জাতীয় আন্দোলনের বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করতেন যে ভারতকে সকল ধর্মের ব্যক্তির সাথে সমান আচরণ করতে হবে এবং ভারত এমন একটি দেশ হওয়া উচিত নয় যা একটি ধর্ম বিশ্বাসের অনুসারীকে বেশি এবং অন্য ধর্ম অনুসরণকারীদের কম

চলো ছায়াছবিটি দেখি

গরম হাওয়া

আগ্রার সেলিম মির্জা জুতো প্রস্তুতকারক ছিলেন। বিভাজনের পরে তিনি আপন লোকেদের মধ্যেই নিজেকে অপরিচিত ভাবতে লাগলেন, যেখানে তিনি সারা জীবন ধরে বসবাস করছিলেন। দেশভাগের পর উদীয়মান বাস্তবতায় তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে লাগলেন, তার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিভক্ত ভারতের অন্য প্রান্তের একজন শরণার্থী তার পৈত্রিক বাসস্থান দখল করে। তার মেয়েটিরও করুণ পরিণতি হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন শীঘ্রই সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

তবে তার পরিবারের অনেক সদস্যই পাকিস্তানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেলিম পাকিস্তানে চলে যাওয়ার প্রবণতা এবং ভারতে থেকে যাওয়ার ইচ্ছের মধ্যে ফেঁসে গিয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তটি আসে যখন সেলিম সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায্যতার দাবিতে শিক্ষার্থীদের মিছিলের পরিকল্পনা করেন। তার ছেলে সিকান্দার এই মিছিলে যোগ দিয়েছিল। তোমরা কি ভাবতে পারবে মির্জা সেলিম শেষ পর্যন্ত কি করলেন? এই পরিস্থিতিতে তোমরা কি করতে?

বছর : 1973
নির্দেশক : এম.এস. সত্যু
চিত্রনাট্য : কাইফি আজমি
অভিনেতা : বলরাজ শাহানি, জালাল আগা, ফারুক শেখ, গীতা সিদ্ধার্থ।

মহাত্মা গান্ধির আত্মত্যাগ (Mahatma Gandhi's sacrifice)

1947 সালে 15 আগস্ট মহাত্মা গান্ধি স্বাধীনতা দিবসের কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি কলকাতায় সব অঞ্চলে ছিলেন যেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা ছড়িয়ে পরেছিল। সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। এটা দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন যে 'অহিংসা' এবং 'সত্যাগ্রহের' যে নীতিগুলোকে নিয়ে তিনি আজীবন কাজ করেছেন তা আজ বিপদের সময় মানুষকে একসাথে আবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। গান্ধিজি হিন্দু এবং মুসলমানদেরকে সহিংসতা ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান করেন। কলকাতায় তার উপস্থিতি পরিস্থিতিকে অনেকটা স্বাভাবিক করেছিল এবং স্বাধীনতার আগমণকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনায় নাচ-গানের আনন্দের সহিত উত্থাপিত করা হয়েছিল। গান্ধিজির প্রার্থনা সভাগুলোয় প্রচুর জনসমাগমকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতি বেশিদিন থাকেনি, কারণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আবার দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং গান্ধিজিকে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য অনশন শুরু করতে হয়েছিল।

পরবর্তী মাসে গান্ধিজি দিল্লি চলে আসেন যেখানে বৃহৎ আকারে সহিংসতা শুরু হয়েছিল, ভারতে মুসলমানদের মার্যাদার সহিত সমনাগরিতা নিয়ে থাকার ব্যাপারে গান্ধিজির গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক নিয়েও তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। পাকিস্তানকে দেওয়া আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার জন্য তিনি ভারত সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই সমস্ত বিষয় মাথায় রেখেই তিনি 1948 সালে জানুয়ারিতে অনশন শুরু করেন যা তাঁর অন্তিম অনশন ছিল। কলকাতার মতো তাঁর এই অনশন দিল্লিতেও নাটকীয় প্রভাব ফেলেছিল। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সহিংসতা হ্রাস পায়। দিল্লি ও তার আশেপাশের অঞ্চলের মুসলমানগণ নিরাপদে তাদের ঘরে ফিরে আসতে শুরু করে। ভারত সরকার পাকিস্তানকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে সম্মত হয়।

গান্ধিজির এই কাজগুলো অবশ্য অনেকেরই পছন্দ হয়নি। উভয় সম্প্রদায়ের চরমপন্থীরা তাদের এই অবস্থার জন্য গান্ধিজিকে দায়ী করেছিল। যারা চেয়েছিল যে হিন্দুরা প্রতিশোধ নেবে বা ভারত একটি হিন্দু রাস্ট্র হবে, যেরকমভাবে পাকিস্তান মুসলিম রাস্ট্র হয়েছিল তারা গান্ধিজিকে অপছন্দ করতেন। তারা গান্ধিজিকে মুসলিম ও পাকিস্তানের স্বার্থে কাজ করার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন। গান্ধিজি ভেবেছিলেন যে এইসব লোকেরা বিপথগামী। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে ভারতকে শুধু হিন্দুদের জন্য একটি রাস্ট্রে পরিণত করার যে কোনো প্রচেস্টা ভারতবর্ষকে ধ্বংস করে দেবে। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রতি তাঁর দৃঢ় মনোভাব হিন্দু চরমপন্থীদের এতটাই উস্কে দিয়েছিল যে তারা গান্ধিজিকে গুপ্ত হত্যার বিভিন্ন প্রচেস্টা চালিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সশস্ত্র সুরক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং প্রার্থনা সভায় জনগণের সাথে সম্মিলিতও হতেন। অবশেষে, 1948 সালের 30 জানুয়ারি নাথুরাম বিনায়ক গডসে নামে একজন চরমপন্থী দিল্লিতে সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় গান্ধিজিকে পরপর তিনটি গুলি করে হত্যা করেন। এভাবে সত্য, অহিংসা, ন্যায়বিচার এবং সহনশীলতার জন্য দীর্ঘ একটি জীবন সংগ্রামের অবসান ঘটে।

গান্ধিজির মৃত্যু দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উপর এবং জাদুকরি প্রভাব বিস্তার করেছিল। দেশভাগ সম্পর্কিত ক্রোধ এবং সহিংসতা হঠাৎ হ্রাস পায়। ভারত সরকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো বিভিন্ন সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মতো সংস্থাগুলোকে কিছু সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তার প্রভাব হারাতে শুরু করে।

The news of Gandhi Ji's assasination drew a crowd in Kolkata.

মর্যাদা দেবে। সকল নাগরিক তাদের ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে সমান হবে। ধর্মীয় বিশ্বাস নাগরিকত্বের পরিচয় হতে পারে না। তারা তাই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শের ধারণাকে পোষণ করতেন। এই আদর্শটিকে ভারতীয় সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

চলো অনুসন্ধান করি

শ্বেতা লক্ষ্য করছিলেন যে তার দাদু যখন কারো কাছ থেকে পাকিস্তানের কথা শুনতেন তখন খুব শান্ত হয়ে যেতেন। একদিন সে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশ বিভাজনের সময় তিনি কীভাবে লাহোর থেকে লুধিয়ানায় এসেছিলেন সে সম্পর্কে দাদু তাকে জানায়। তিনি বললেন, তার বাবা-মা দু'জনেই মারা গিয়েছিলেন। এমনকি তিনিও জীবিত থাকতেন না, তবে প্রতিবেশী একটি মুসলিম পরিবার তাকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং বেশ কয়েকদিন তাকে লুকিয়ে রেখেছিল। তারা তাকে কিছু আত্মীয় পরিজন খোঁজে পেতে সহায়তা করেছিল এবং এভাবেই তিনি সীমান্ত পেরিয়ে একটি নতুন জীবন শুরু করতে সক্ষম হন।

তোমরা কি অনুরূপ গল্প শুনেছো? তোমাদের দাদু-দিদা বা সেই প্রজন্মের যে কোনো ব্যক্তিকে তাদের স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতি সম্পর্কে, এর আনন্দ উৎসব সম্পর্কে, দেশ বিভাজনের দুঃখ সম্পর্কে এবং স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রত্যাশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো।

কমপক্ষে এরকম দু'টি গল্প লিখ।

রাজন্য শাসিত প্রদেশের সংযুক্তিকরণ (Integration of Princely States)

ব্রিটিশ ভারতকে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ এবং রাজন্য শাসিত প্রদেশ হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলো প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অন্যদিকে রাজন্যশাসিত বেশ কয়েকটি বড় এবং ছোট রাজ্য ব্রিটিশ আধিপত্যকে মেনে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করছিল। এটিকে বলা হতো ব্রিটিশ মুকুটের সর্বশক্তি বা সার্বভৌম কর্তৃত্ব। রাজন্য শাসিত প্রদেশগুলো ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ ভূ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং চারজন ভারতীয়ের মধ্যে একজন রাজন্য শাসনের অধীনে ছিল।

সমস্যা (The problem)

স্বাধীনতার কিছুদিন আগে ব্রিটিশরা ঘোষণা করেছিল যে ভারতবর্ষে তাদের শাসনের অবসানের সাথে সাথে রাজপরিবারের উপর ব্রিটিশ শাসনেরও অবসান হবে। এর অর্থ এই ছিল যে সর্বমোট ৫৬৫টি রাজ্য আইনত স্বাধীন হবে। ব্রিটিশ সরকারের অভিমত ছিল যে এই সমস্ত রাজ্য ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান করতে পারে বা ইচ্ছে করলে তারা স্বাধীনও থাকতে পারবে। এই সিদ্ধান্ত জনগণের উপর নয়, রাজন্যবর্গের হাতে ছিল। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা এবং সংঘবন্ধ ভারতের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলতে পারত।

খুব শীঘ্রই সমমস্যা দেখা দেয়। সর্বপ্রথম, ট্রাভানকোরের শাসক ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর রাজ্য

ভারত বিভাজনের পূর্বে এবং পরে

বি:দ্র: এই মানচিত্রটি স্কেল অনুসারে নয়, এটিকে ভারতের বাহ্যিক সীমানার একটি প্রকৃত মানচিত্র হিসেবে মানা যাবে না।

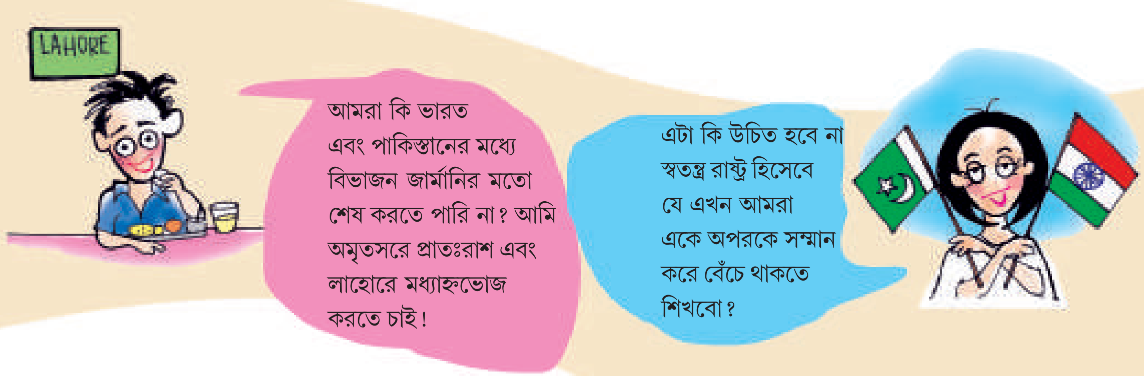

স্বাধীন থাকবে। পরের দিন হায়দ্রাবাদের নিজামও একই রকম ঘোষণা করলেন। ভূপালের নবাবের মতো শাসকগণ গণপরিষদে যোগদানে বিরোধী ছিলেন। রাজন্য শাসিত রাজ্যের শাসকদের এইসব প্রতিক্রিয়ার অর্থ ছিল স্বাধীনতার পর ভারত অনেক ছোট ছোট দেশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এইসব রাজ্যের জনগণের জন্য গণতন্ত্রের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ দেখাচ্ছিল। এটি একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি ছিল, কারণ ভারতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল ঐক্য, আত্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি গণতন্ত্র। অধিকাংশ রাজন্য শাসিত রাজ্যগুলোতে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছিল এবং শাসকরা তাদের জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

> আমরা ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রয়েছি। সাধারণ প্রচেষ্টায় আমরা দেশকে নতুন মহিমায় উন্নিত করতে পারি। কিন্তু ঐক্যের অভাব আমাদের অপ্রত্যাশিত বিপর্যের সামনে ফেলে দেবে। আমি আশা করি যে ভারতীয় রাজ্যগুলো সম্পূর্ণভাবে উপলব্দি করবে যে আমরা যদি সাধারণ স্বার্থে সহযোগিতা না করি এবং একসাথে কাজ না করি তবে আমরা বড় বা ছোট হইনা কেন সকলকেই অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলতা গ্রাস করবে এবং আমাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে...
>
> ***সর্দার প্যাটেল***
> রাজন্যশাসিত শাসকদেরকে লেখা একটি চিঠি
> ১৯৪৭

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী (Government's approach)

অন্তবর্তীকালীন সরকার ভারতের বিভিন্ন ছোট-বড় আকারের স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাব্য বিভাজনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিল। মুসলিম লিগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করে এবং তাদের অভিমত ছিল যে রাজ্যগুলোকে তাদের পছন্দমত যে কোনো রাস্তা অবলম্বন করার স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত। স্বাধীনতা লাভের পরই এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সর্দার প্যাটেল ভারতের উপ প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি রাজন্যশাসিত শাসকদের দৃঢ়তার সাথে কিন্তু কূটনৈতিকভাবে আলোচনা করে তাদের বেশিরভাগকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই কাজটি এখন সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত জটিল কাজ যেখানে দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রয়োজন ছিল। উদাহরণস্বরূপ আজকের উড়িষ্যায় ২৬টি ছোট রাজন্যশাসিত রাজ্য ছিল। গুজরাটের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে ১৪টি বড় রাজ্য ছিল, ১১৯টি ছোট ছোট রাজ্য এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রশাসন ছিল।

সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী তিনটি উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। প্রথমত; বেশিরভাগ রাজন্যশাসিত অঞ্চলের জনগণ স্পষ্টতই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সরকার কয়েকটি অঞ্চলকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। ভারত সরকার বৈচিত্র্যতাকে বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের দাবিগুলো পূরণ করার ক্ষেত্রে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পক্ষপাতি ছিল। তৃতীয়ত, দেশ বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এর ফলে দেশের প্রাদেশিক সীমানার এককীকরণ ও সমন্বয় সাধনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্টের পূর্বে শান্তিপূর্ণ আলোচনার ফলে প্রায় সমস্ত রাজন্যশাসিত রাজ্য যাদের সীমানা ভারতের নতুন সীমানার সাথে যুক্ত ছিল তারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হয়। বেশিরভাগ রাজ্যের শাসকরা 'সংযুক্তিকরণের দলিল' (Instrument of Accession) নামক নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন যার অর্থ তাদের রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ হতে রাজি হয়েছিল। জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর ও মণিপুরের মতো রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলোর সংযুক্তিকরণ অন্য রাজ্যগুলির সংযুক্তিকরণের তুলনায় কঠিন প্রমাণিত হয়েছিল। জুনাগড়ের সমস্যাটি সমাধান হয় তখন, যখন সেখানকার জনগণ গণভোটের মাধ্যমে ভারতের সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তোমরা অষ্টম অধ্যায়ে কাশ্মীর সম্পর্কে পড়বে। চলো এখন হায়দ্রাবাদ এবং মণিপুরে বিষয়টি দেখি।

Credit: PIB

হায়দ্রাবাদের নিজামের সাথে সর্দার প্যাটেল।

হায়দ্রাবাদ (Hyderabad)

রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলোর মধ্যে বৃহত্তম হায়দ্রাবাদ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পুরাতন হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের কিছু অংশ আজ মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অংশ। এর শাসক 'নিজাম' উপাধি ধারণ করতেন এবং তিনি বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন। নিজাম চেয়েছিলেন হায়দ্রাবাদকে যেন স্বাধীন মর্যাদা দেওয়া হয়। নিজাম 1947 সালে নভেম্বর মাসে ভারতের সাথে স্থিতাবস্তা বজায় রাখার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি এক বছরের জন্য হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে ভারত সরকারের সাথে নিজামের আলাপ-আলোচনা চলছিল।

এরই মধ্যে নিজামের শাসনের বিরুদ্ধে হায়দ্রাবাদের জনগণ এক শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করে। মূলত তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষক শ্রেণি নিজামের দমনমূলক শাসনের শিকার হয়েছিল। ফলস্বরূপ তারা নিজামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যেসব মহিলারা এই দমন-পীড়নের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছিল তারাও বিপুল সংখ্যায় এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। হায়দ্রাবাদ শহরটি ছিল। এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। কমিউনিস্ট এবং হায়দ্রাবাদ কংগ্রেস এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল। জনগণের আন্দোলনকে দমন করার জন্য নিজাম রাজাকার নামে পরিচিত একটি আধা সামরিক বাহিনীকে নিযুক্ত করেন। রাজাকাররা ছিল অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক প্রকৃতির এবং তাদের নৃশংসতার কোনো সীমারেখা ছিল না। তারা

সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল (1875-1950)

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা; কংগ্রেসের নেতা; মহাত্মা গান্ধির অনুসারী; স্বাধীন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী; ভারতের সাথে রাজন্যশাসিত রাজ্যের সংযুক্তিকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন; মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু, প্রাদেশিক সংবিধান ইত্যাদি সম্পর্কিত গণপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য।

আমার ভাবতে অবাক লাগে যে এই সহস্র রাজা-রানি, রাজকুমার-রাজকুমারীদের কী হয়েছিল। সাধারণ নাগরিক হওয়ার পরে তাদের জীবন কীরকম হয়েছিল?

হত্যা, অঙ্গাচ্ছেদ ধর্ষণ এবং লুটপাট শুরু করেছিল এবং তাদের মূল শিকার ছিল অমুসলিম জনগণ। কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য সেনাবাহিনীকে আদেশ দিতে হয়েছিল। 1948 সালে সেপ্টেম্বরে, ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজাম বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অগ্রসর হয়। কিছুদিন পর্যায়ক্রমিক লড়াই এর পর নিজাম আত্মসম্পর্ণ করেন এবং হায়দ্রাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মণিপুর (Manipur)

স্বাধীনতার কিছুদিন পূর্বে মণিপুরের মহারাজা বোধচন্দ্র সিং মণিপুরের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার আশ্বাসে ভারত সরকারের সাথে সংযুক্তিকরণের দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন। জনগণের মতামতের চাপে মহারাজা 1948 সালের জুনে মণিপুরে নির্বাচন করিয়েছিলেন এবং এর ফলস্বরূপ রাজ্যটি একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। মণিপুর ছিল ভারতের প্রথম প্রদেশ যেখানে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধীকারের ভিত্তিতে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

মণিপুরকে ভারতের সাথে সংযুক্তিকরণের প্রশ্নে মণিপুরের বিধানসভায় তীব্র মতপার্থক্য ছিল। রাজ্য কংগ্রেস যখন সংযুক্তিকরণ চেয়েছিল তখন অন্য রাজনৈতিক দলগুলো তার বিরোধিতা করেছিল। ভারত সরকার মণিপুরের নির্বাচিত বিধানসভার সাথে পরামর্শ না করেই 1949 সালে সেপ্টেম্বরে মহারাজকে সংযুক্তিকরণের চুক্তিতে সাক্ষর করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে সফল হয়। এই ঘটনাটি মণিপুরে ক্ষোভ-বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল যার ফল এখনো অনুভূত হয়।

Credit: R. K. Laxman in the Times of India

এই ব্যাঙ্গাচিত্রটি রাজন্যশাসিত রাজ্যের জনগণ ও শাসকদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে এবং এই সমস্যা সমাধানে প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও মন্তব্য করে।

রাজ্যগুলোর পুনর্গঠন

(Reorganisation of States)

দেশ গঠনের প্রক্রিয়াটি বিভাজন এবং রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলোর সংযুক্তিকরণের সাথেই শেষ হয়নি। তখন মূল সমস্যা ছিল ভারতীয় রাজ্যগুলোর সীমারেখা নির্ণয় করা। এটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিভাজনের বিষয় ছিল না। সীমারেখা এমনভাবে নির্ণয় করতে হয়েছিল যাতে দেশের ঐক্যকে প্রভাবিত না করে এর ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করতে পারে।

ঔপনিবেশিক শাসনের সময় রাজ্যের সীমানা প্রশাসনিক সুবিধার্থে বা ব্রিটিশ সরকার দ্বারা জয় করা অঞ্চলগুলোকে একত্রিত করে অথবা রাজন্যশাসিত অঞ্চলের দ্বারা নির্ণয় করা হতো।

আমাদের জাতীয় আন্দোলন সীমানা নির্ণয়ের এই বিভাগগুলোকে আরোপিত হিসেবে প্রত্যাক্ষান করেছিল এবং রাজ্যগঠনের ভিত্তি হিসেবে ভাষাতত্ত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। 1920 সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এর পরেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিজেদের পুনঃগঠনের জন্য এই নীতিটিকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বহু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ভাষাগত অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, যা ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনিক বিভাজনকে অনুসরণ করেনা।

স্বাধীনতা এবং বিভাজনের পর দেশের পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছিল। আমাদের নেতৃবৃন্দ অনুভব করেছিলেন যে ভাষার ভিত্তিতে যদি রাজ্যগুলোকে গঠন করা হয় তাহলে অব্যবস্থা এবং বিভেদ দেখা দেবে। তারা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো থেকে মনোযোগ দূরে সরিয়ে দেবে যা দেশটির প্রধান সমস্যা ছিল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের নীতিটিকে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্থগিতাদেশের প্রয়োজনীয়তার আরেকটি কারণ হল রাজন্যশাসিত রাজ্যের ভাগ্য তখনো নির্ধারিত হয়নি। এছাড়াও দেশভাগের স্মৃতি তখনো তাজা ছিল।

জাতীয় নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তকে স্থানীয় নেতৃত্ব এবং জনগণ মেনে নিতে অস্বীকার করে। পুরাতন মাদ্রাজ প্রদেশের তেলেগুভাষী অঞ্চলের বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল যার মধ্যে বর্তমান তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ, কেরল এবং কর্ণাটক অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশালন্ধ্র আন্দোলন (অন্ধ্রপ্রদেশ নামে পৃথক রাজ্য গঠনের আন্দোলন) দাবি করেছিল যে মাদ্রাজ প্রদেশের তেলেগুভাষী অঞ্চলকে পৃথক করে অন্ধ্রপ্রদেশ তৈরি করা হোক। অন্ধ্র অঞ্চলের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল তৎকালীন মাদ্রাজ প্রদেশের ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের পক্ষে ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণের অনিশ্চয়তার ফলে এই আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং বিখ্যাত গান্ধিবাদী পট্টি শ্রীরামুলু অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসেন। 56 দিন অনশন করার পর তাঁর মৃত্যু হয়। এটি অন্ধ্র অঞ্চলে অস্থিরতা এবং সহিংসতার সৃষ্টি করে। বিপুল সংখ্যক জনগণ রাস্তায় নেমেছিল। পুলিশের গুলিতে অনেকে আহত বা প্রাণ হারিয়েছিল। মাদ্রাজে বেশ কয়েকজন বিধায়ক এই প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী 1952 সালের ডিসেম্বরে পৃথক অন্ধ্র রাজ্য গঠনের ঘোষণা দেন।

“...যদি ভাষাভিত্তিকে প্রদেশের গঠন করা হয় তাহলে এটি আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে উৎসাহ যোগাবে। ফলে সমস্ত প্রদেশে হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা অসম্ভব হবে এবং তার থেকেও অর্থহীন হবে ইংরেজিকে এরজন্য ব্যবহার করা।”

মহাত্মা গান্ধি,
জানুয়ারি 1948

রাজ্যের পুনর্গঠনের পর ভারতের প্রশাসনিক মানচিত্র 1961

বি:দ্র: এই মানচিত্রটি স্কেল অনুসারে নয়, এটিকে ভারতের বাহ্যিক সীমানার একটি প্রকৃত মানচিত্র হিসেবে মানা যাবে না।

মানচিত্রটি পড় এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

1. স্বতন্ত্র রাজ্য হওয়ার পূর্বে নিম্নলিখিত রাজ্যগুলো কোন্ মূল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

   গুজরাট　　　　হরিয়ানা

   মেঘালয়　　　　ছত্তিশগড়

2. দেশ বিভাজনের দ্বারা প্রভাবিত দুটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করো?
3. বর্তমানের দুটি রাজ্যের নাম লিখ যা এক সময় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল।

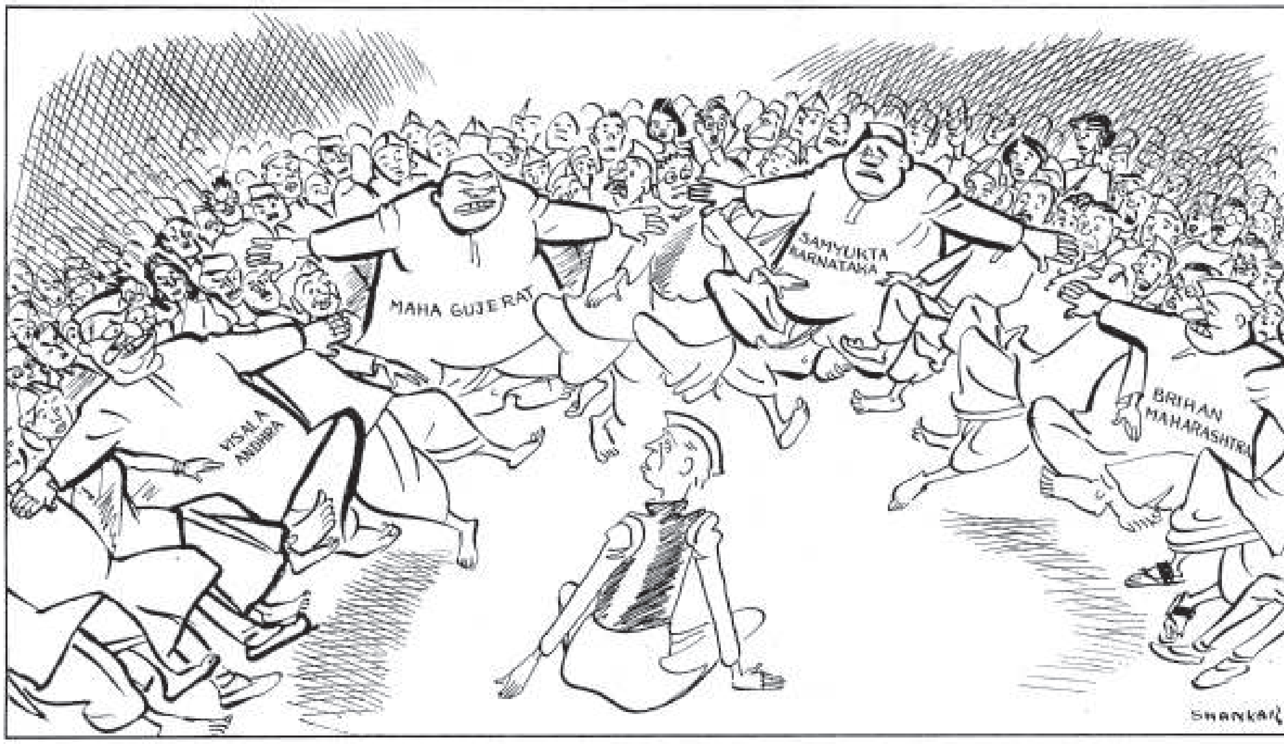

Credit: Shankar

"অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম" (26 জুলাই 1953) ব্যাঙ্গাচিত্রটি ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের সমসাময়িক দাবিটিকে তুলে ধরেছে।

অন্ধ্র গঠনের ফলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের সংগ্রামকে উৎসাহিত করেছিল। এই সংগ্রামের ফলে কেন্দ্র সরকার বাধ্য হয়ে 1953 সালে রাজ্যগুলোর সীমানা পুনর্গঠনের বিষয়টিকে দেখার জন্য রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করে। কমিশন তার প্রতিবেদনে এটা স্বীকার করেছে যে রাজ্যের সীমানা নির্ধারন সেখানকার বিভিন্ন ভাষার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে 1956 সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ হয়। এর ফলে 14টি রাজ্য ও 6টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি হয়েছিল।

এটি খুব কৌতুহলের বিষয় নয়? নেহরু এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ খুব জনপ্রিয় ছিলেন, তবুও জনগণণ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলন করতে দ্বিধা করেনি!

পট্টি শ্রীরামুলু

(1901-1952) : গান্ধিবাদী কর্মী; লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার জন্য সরকারি চাকুরি ছেড়ে দেন; এছাড়াও একক সত্যাগ্রহে অংশ নিয়েছিলেন; 1946 সালে মাদ্রাজ প্রদেশের মন্দিরগুলো দলিতদের জন্য উন্মুক্ত করার দাবিতে অনশন শুরু করেছিলেন; 1952 সালের 19 অক্টোবর পৃথক অন্ধ্র রাজ্যের দাবিতে অনশন শুরু করেন; 1952 সালের 15 ডিসেম্বর অনশন চলাকালীন সময়ে মারা যান।

Credit: Shankar

"চতুরতার সাথে জিনকে পুনরায় নিয়ে আসা" (Coaxing the Genic back) (5 ফেব্রুয়ারি 1956) এই ব্যাঙ্গচিত্রে রাজ্য পনর্গঠন কমিশন ভাষাতত্ত্বের জিনকে সংযত করতে পারবে কি না তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

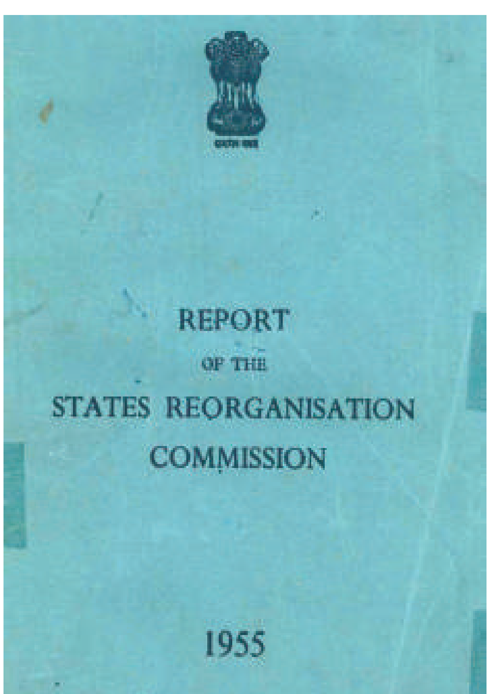

স্বাধীনতার পরের বছরগুলোতে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় ছিল পৃথক রাজ্যের দাবি যা দেশের ঐক্যকে বিপন্ন করতে পারে। এটা অনুভব করা হচ্ছিল যে ভাষাগত রাজ্যগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহিত করতে এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত দেশের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তবে দেশের নেতৃবৃন্দ জনগণের চাপের ফলে অবশেষে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটা আশা করা হয়েছিল যে আমরা যদি সমস্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক এবং ভাষাগত দাবি মেনে নেই তাহলে বিবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ হ্রাস পাবে। এছাড়াও, আঞ্চলিক দাবি ও ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি মেনে নেওয়ার বিষয়টি অনেকটা গণতান্ত্রিক কাঠামোর রূপ হিসেবে দেখা হয়েছিল।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের বিষয়টি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেছে। আমরা বলতে পারি যে ভাষাভিত্তিক রাজ্য এবং এই রাজ্যগুলো গঠনের আন্দোলন গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং নেতৃত্বের প্রকৃতিকে বদলে দেয়। রাজনীতি ও ক্ষমতার পথ তখন কিছু ইংরেজি বলা অভিজাতদের ছাড়াও অন্যান্য মানুষদের জন্য উন্মুক্ত ছিল, ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ করার ব্যাপারে কিছুটা অভিন্ন ভিত্তি দিয়েছিল। এই বিষয়টি দেশটিকে অনৈক্যের দিকে নিয়ে যায়নি যা অনেকে পূর্বে আশঙ্কা করেছিল। বিপরীতে এটি জাতীয় ঐক্যকে দৃঢ় করেছে।

সর্বোপরি, ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলো বৈচিত্র্যের নীতিটির গ্রহণযোগ্যতার উপর জোর দিয়েছিল। যখন আমরা বলি যে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে, এর অর্থ এই নয় যে ভারতে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক সংবিধান, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, এর অর্থ ছিল আরও বৃহৎ। গণতন্ত্রকে চয়ন করার অর্থ ছিল বিদ্যমান বৈষম্যগুলোকে চিহ্নিত করা এবং স্বীকার করা। এই বৈষম্যগুলোর মধ্যে কখনো কখনো পরস্পর বিরোধিতা ছিল। অন্যভবে বলা যায়, ভারতে গণতন্ত্র ধারণা বহুত্ব এবং জীবন পদ্ধতির সাথে যুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ের বেশিরভাগ রাজনীতি এই কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত হয়েছিল।

নতুন রাজ্যের গঠন

ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের নীতি গ্রহণের অর্থ এই নয় যে, সমস্ত রাজ্য তাৎক্ষণিকভাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। গুজরাটি এবং মারাঠীভাষী জনগণকে নিয়ে 'দ্বি-ভাষিক' বুম্বাই রাজ্যের একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল। একটি গণআন্দোলনের পর 1960 সালে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট রাজ্য গঠন করা হয়েছিল।

পাঞ্জাবেও দুটি ভাষাগত গোষ্ঠী ছিল : হিন্দি-ভাষী এবং পাঞ্জাবী-ভাষী। পাঞ্জাবী-ভাষী জনগণ পৃথক রাজ্যের দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু এই দাবিকে 1956 সালে অন্যান্য রাজ্যের সাথে মঞ্জুর করা হয়নি। দশ বছর পর 1966 সালে যখন বৃহত্তর পাঞ্জাব রাজ্য থেকে বর্তমানের হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশ নামক দুটি রাজ্য হয় তখনই পাঞ্জাব রাজ্যের মর্যাদা পায়।

1972 সালে উত্তর-পূর্বে আরেকটি বড় রাজ্যের পুনর্গঠন হয়েছিল। 1972 সালে আসাম থেকে মেঘালয় রাজ্যের গঠন করা হয়।ওই সালে মণিপুর এবং ত্রিপুরাও পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়। 1947 সালে মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশ নামক দুটি রাজ্যের সৃষ্টি হয়। নাগাল্যান্ড অনেক আগেই 1963 সালে একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

শুধুমাত্র ভাষাই রাজ্যগুলো গঠনের একমাত্র ভিত্তি ছিল না, পরবর্তী বছরগুলোতে অঞ্চলগুলো পৃথক আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতার অভিযোগের ভিত্তিতে পৃথক রাজ্যের দাবি উত্থাপন করেছিল। 2000 সালে এরকম তিনটি রাজ্য যথা ছত্রিশগড়, উত্তরখণ্ড এবং ঝাড়খণ্ড তৈরি করা হয়েছিল। পুনর্গঠনের বিষয়টি এখনো শেষ হয়নি। দেশে এমনো অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে পৃথক ও ছোট ছোট রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন চলছে। এর মধ্যে রয়েছে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ, উত্তর প্রদেশের হরিত অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরদিকের কিছু অঞ্চল।

অনুশীলনী

1. ভারতে বিভাজন সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলোর মধ্যে ক'টি ভুল?
   (a) ভারতের বিভাজন "দ্বি-জাতি তত্ত্বের" ফলস্বরূপ হয়েছিল।
   (b) ধর্মের ভিত্তিতে পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করা হয়েছিল।
   (c) পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান পাশাপাশি অবস্থিত ছিল না।
   (d) ভারত বিভাজনের পরিকল্পনায় দু'দেশের জনগণের স্থানান্তরের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

2. নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তের সাথে উদাহরণগুলো মিলাও :

(a) ধর্মীয় ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ	(i) পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ
(b) বিভিন্ন ভাষার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ	(ii) ভারত এবং পাকিস্তান
(c) দেশের মধ্যে ভৌগোলিক অঞ্চল দ্বারা সীমানা নির্ধারণ	(iii) ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়
(d) দেশের মধ্যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ	(iv) হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড

3. ভারতের একটি সমকালীন রাজনৈতিক মানচিত্র (যেখানে রাজ্যগুলোর সীমানা দেখানো হয়েছে) নাও এবং নিম্নলিখিত রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলোর অবস্থান চিহ্নিত কর।

(a) জুনাগড়	(b) মণিপুর
(c) মহীশূর	(d) গোয়ালিয়র

4. এখানে দুটি মতামত রয়েছে—
   বিস্ময় : "রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলো ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একীকরণের ফলে সেখানকার জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল।"
   ইন্দ্রপ্রিত : "আমি ততটা নিশ্চিত নই যে এখানে বল প্রয়োগ করা হয়েছিল। ঐক্যমতের ভিত্তিতেই গণতন্ত্র আসে।"
   রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলোর সংযুক্তিকরণ এবং ওই অংশের জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তোমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত কর।

5. 1947 সালে আগস্টে দেওয়া নীচের বক্তব্যগুলো পড়—
   "আজ আপনি আপনার মাথায় কাঁটার মুকুট পড়েছেন। ক্ষমতার আসন একটি নোংরা জিনিস। আপনাকে সদা সচেতন থাকতে হবে। আপনাকে আরো নম্র ও সহনশীল হতে হবে। এখন আপনার পরীক্ষা নেওয়া শেষ হবে না" — ***মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধি***
   "...ভারত স্বাধীনতার আলোকে জীবনযাপনের জন্য জেগে উঠবে... আমরা পুরানো থেকে নতুনের দিকে যাত্রা করবো... আজ আমরা দুর্ভাগ্যের সময় শেষ করবো এবং ভারত আবার নিজেকে আবিষ্কার করবে। আজ আমরা যে কৃতিত্বটি উদ্‌যাপন করছি তা কেবল একটি পদক্ষেপ, যা সুযোগের শুরু..."
   —***জওহরলাল নেহরু***
   এই দুটি বিবৃতি থেকে ধ্বনিত দেশ গঠনের বিষয়সূচি ব্যাখ্যা কর। কোনটি তোমার কাছে বেশি কাম্য বলে মনে হয় এবং কেন?

6. ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার জন্য নেহরুর যুক্তি-তর্ক কী ছিল? তুমি কি মনে করো এই যুক্তি-তর্কগুলো নৈতিক এবং সংবেদনশীল ছিল? অথবা সেখানে বিচক্ষণ কারণও ছিল?

7. স্বাধীনতার সময় দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে দেশ গঠনের সমস্যার মধ্যে দুটি প্রধান পার্থক্য উল্লেখ কর।

8. রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাজ কী ছিল? কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশটি কী ছিল?

9. এটা বলা হয়ে থাকে যে ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্র একটি "কল্পিত জনসমাজ" যা সাধারণ বিশ্বাস, ইতিহাস, রাজনৈতিক আকাঙ্খা এবং কল্পনা দ্বারা একত্রিত। ভারতকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলে এমন বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করো।

10. নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি পড় এবং নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

"দেশ গঠনের ইতিহাসে কেবলমাত্র সোভিয়েত রাষ্ট্র নির্মাণের প্রয়োগের সঙ্গে ভারতের তুলনা করা যায়। সেখানেও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, ধর্মীয়, ভাষাগত সম্প্রদায় এবং সামাজিক শ্রেণির মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি তৈরি করতে হয়েছিল। ভৌগোলিক এবং জনসংখ্যাগত দিক থেকে এই বিষয়টি তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ছিল। রাষ্ট্রগঠনের কাজটি যে কাঁচা সামগ্রী দিয়ে করতে হয়েছিল তা ছিল প্রতিকূল প্রকৃতির; ব্যক্তি বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভক্ত এবং ঋণ ও রোগের দ্বারা নিমজ্জিত ছিল।"— রামচন্দ্র গুহ

(a) লেখক ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে মিলের উল্লেখ করেছেন তার একটি তালিকা তৈরি করো এবং ভারত থেকে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে উদাহরণ দাও।

(b) লেখক ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্র নির্মাণের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অমিলের কথা উল্লেখ করেননি। তুমি কি দুটি অমিলের কথা উল্লেখ করতে পারো?

(c) যদি অতীতের দিকে লক্ষ্য করা যায় তাহলে রাষ্ট্র নির্মাণের এই দুটি প্রয়োগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ এবং কেন?

চল এটা একসাথে করি

- কোনো ভারতীয় এবং পাকিস্তানি/বাংলাদেশি লেখকের দেশ বিভাজন নিয়ে লিখিত একটি উপন্যাস/গল্প পড়। সীমানার এপার-ওপারের অভিজ্ঞতার মধ্যে কি মিল ছিল?
- এই অধ্যায়ে 'চল অনুসন্ধান করি' পরামর্শ থেকে সমস্ত গল্পগুলো সংগ্রহ করো। একটি দেওয়াল পত্রিকা প্রস্তুত করো যা সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলোকে প্রস্ফুটিত করবে এবং এখানে অসাধারণ অভিজ্ঞতার গল্পও থাকবে।

শঙ্করের বিখ্যাত এই ব্যাঙ্গাচিত্রটি তাঁর 'ডোন্ট স্পেয়ার মি শঙ্কর' এর প্রচ্ছদ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাঙ্গাচিত্রটি ভারতের চিন নীতির প্রসঙ্গে আঁকা হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যাঙ্গাচিত্রটি একদলীয় আধিপত্যের যুগে কংগ্রেস দলের দ্বৈত ভূমিকাকে উপস্থাপন করেছে।

এই অধ্যায়ে (In this chapter)...

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা রাষ্ট্র গঠনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছি। স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কিছুকাল পরেই আমাদের সামনে গণতান্ত্রিক রাজনীতি প্রবর্তন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা আসে। এর ফলস্বরূপ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই অধ্যায়ে আমরা নির্বাচনী রাজনীতির প্রথম দশক সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করবো।

- একটি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা;
- স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে কংগ্রেস দলের একাধিপত্য; এবং
- বিরোধী দল এবং তাদের কার্যপ্রণালীর উদ্ভব।

একদলীয় আধিপত্যের যুগ (era of one-party dominance)

অধ্যায় 2

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা (Challenge of building democracy)

তোমরা এখন অনুমান করতে পারছো যে স্বাধীন ভারতের জন্ম কিরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পরেই রাষ্ট্রগঠন করার ক্ষেত্রে দেশ যে কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল এ বিষয়ে তোমরা পড়েছ। এরকম কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বিশ্বের অনেক নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাদের দেশে গণতন্ত্র বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাদের বক্তব্য হল জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, তাদের মতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বিভেদ ও সংঘাতের সৃষ্টি হবে। এই কারণে উপনিবেশবাদ থেকে স্বাধীনতা অর্জনকারী অনেক দেশই অ-গণতান্ত্রিক শাসনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। অ-গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যেমন— নামমাত্র গণতন্ত্র কিন্তু কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ কোন্ একজন নেতার হাতে ছিল, আবার অন্যদিকে দেখা যায় একদলীয় শাসন বা প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন। অ-গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সর্বদা অতিদ্রুত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুরু হয় কিন্তু একবার তারা নিজেদেরকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেললে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা কঠিন হয়ে পরে।

ভারতের পরিস্থিতি ও খুব একটা আলাদা ছিল না। কিন্তু সদ্য স্বাধীন ভারতের নেতৃবৃন্দ আরো কঠিন পথ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাসনপন্থা গ্রহণ অবাক করার মতো হতো কারণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম গণতন্ত্রের ধারণার প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। আমাদের নেতৃবৃন্দ যে-কোনো গণতন্ত্রে রাজনীতির নির্ণায়ক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তারা রাজনীতিকে সমস্যা হিসেবে দেখেননি; তারা এটাকে সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে দেখতেন। প্রত্যেক সমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা কীভাবে নিজেকে শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ করবে। নির্বাচন করার জন্য সবসময় বিভিন্ন নীতিগত বিকল্প রয়েছে, এখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী রয়েছে যাদের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী। আমরা কীভাবে এই পরস্পর বিরোধিতাকে সমাধান করব? এই সকল প্রশ্নের উত্তর হল গণতান্ত্রিক রাজনীতি। ক্ষমতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনীতির দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হল জনস্বার্থকে অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং এটাই হওয়া উচিত। আমাদের নেতৃবৃন্দ এই পথকেই অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গত বছর তোমরা অধ্যয়ন করছো কীভাবে আমাদের সংবিধানের খসড়া তৈরি করা হয়েছিল। তোমাদের অবশ্যই মনে আছে আমাদের সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি তা স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এটি কার্যকর হয়েছিল। এই সময় অন্তবর্তীকালীন সরকার দ্বারা দেশ শাসিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে দেশ শাসনের জন্য প্রথম গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সংবিধান বিধি-বিধান তৈরি করে দিয়েছে, এখন এই বিধি-বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পরে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল যে এটি কয়েকমাসের ব্যাপার মাত্র। ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে

“ভারতে.... রাজনীতিতে বীরপূজা বড়ো ভূমিকা পালন করে যা বিশ্বের অন্য কোন দেশের রাজনীতির সাথে জড়িত বীরপূজার তুলনা করা যায় না। ..... কিন্তু রাজনীতিতে বীরপূজা দ্রুত পতনের দিকে নিয়ে যায় এবং এর পরিণতি হয় একনায়কতন্ত্র”

বাবা সাহেব ড: বি. আর. আম্বেদকর
সংবিধান সভায় ভাষণ
২৫ নভেম্বর, ১৯৪৯

আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক, এতে বিশেষত্ব কী? আগে হোক বা পরে, সব দেশই গণতান্ত্রিক হয়ে গেছে, তাই নয় কি?

এটি একটি ভাল সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এই সকল পুরুষদের সম্পর্কে কি বলা যায় যারা একজন মহিলাকে এখনও মিসেস বলে সম্বোধন করে, যেন ঐ মহিলার নিজের কোন নাম নেই?

তবে নির্বাচন কমিশন এটা উপলব্ধি করেছিল যে ভারতের মতো বিশাল দেশে অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের কাজটা এতটা সহজ হবে না। নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলোর সীমানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি ভোটার তালিকা বা ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য সকল নাগরিকের তালিকাও প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই দুটো কাজের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় হল। নির্বাচনী ভোটার তালিকার প্রথম খসড়া যখন প্রকাশিত হয় তখন দেখা যায় যে প্রায় চল্লিশ লক্ষ মহিলার নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়নি। এই মহিলাদের নাম "এর স্ত্রী ..." বা "এর কন্যা..." হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। নির্বাচন কমিশন এই তালিকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং সম্ভব হলে তা সংশোধন বা প্রয়োজনে মুছে ফেলার নির্দেশ দেন? প্রথম সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি ছিল এক বিশাল কাজ। বিশ্বে এর আগে এই বিশাল মাপের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ঐ সময়ে দেশে ১৭ কোটি ভোটার ছিলেন যারা প্রায় ৩২০০ বিধায়ক এবং লোকসভায় ৪৮৯ জন সদস্যকে নির্বাচিত করবেন। এই ভোটদাতাদের মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ সাক্ষর ছিলেন। সেইজন্য নির্বাচন কমিশনকে ভোটদানের কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে হয়েছিল। এরজন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন (৩) লক্ষেরও বেশি কর্মকর্তা ও ভোটগ্রহণ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

এই সাধারণ নির্বাচন কেবলমাত্র বিশালাকার দেশ ও বিশাল সংখ্যক নির্বাচনমণ্ডলীর কারণে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেনি। ভারতের মতো দরিদ্র ও নিরক্ষর দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল গণতন্ত্রের প্রথম বড় পরীক্ষা। তৎসময়ে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল সমৃদ্ধশালী দেশগুলোতে, প্রধানত ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতে যেখানে প্রায় প্রত্যেকেই সাক্ষর ছিলেন। তখনকার সময়ে ইউরোপের অনেক দেশ মহিলাদের ভোটদানের অধিকার প্রদান করেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার প্রদান করার কাজটি ছিল অত্যন্ত সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ। একজন

Credit : Sankar, 20 May, 1951

১৯৫১ সালে কংগ্রেস পার্টির সদস্য নির্বাচন করার জন্য গঠিত নির্বাচন সমিতির উপর ব্যাঙ্গা চিত্রকরের একটি ছবি। কমিটিতে নেহরুর পাশে মোরারজি দেশাই, রফি আহমেদ খিদওয়াই, ড: বি.সি রায়, কামরাজ নাডার, রাজা গোপালাচারী, জগজীবন রাম, মৌলানা আজাদ, ডি.পি. মিশ্রা, পি.ডি ট্যান্ডন এবং গোবিন্দবল্লভ পন্থকেও দেখা যাচ্ছে।

পরিবর্তনশীল ভোটাদান পদ্ধতি

(Changing methods of voting)

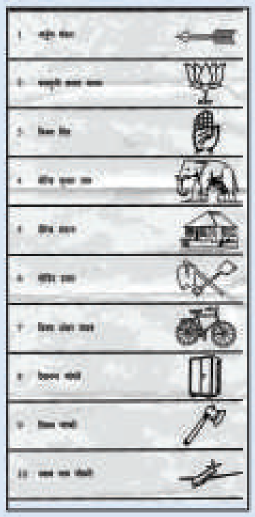

তৃতীয় থেকে ত্রয়োদশ লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের একটি নমুনা

বর্তমানে আমরা ভোটারদের পছন্দকে নথিভুক্ত করার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটার মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করি। কিন্তু প্রথম দিকে আমরা এভাবে শুরু করিনি, প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনী প্রতীকচিহ্নসহ একটি বাক্স রাখা হবে। প্রত্যেক মতদাতাকে একটি ফাঁকা ব্যালট পেপার দেওয়া হবে যেটি তার পছন্দমত প্রার্থীর ভোট বাক্সে ফেলবে। প্রায় ২০ লক্ষ স্টিল বক্স এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। পাঞ্জাবের একজন প্রিসাইডিং অফিসার বর্ণনা করেছিলেন যে কীভাবে তিনি ব্যালট বাক্সগুলো প্রস্তুত করেছিলেন— "প্রত্যেকটি ভোট বাক্সের ভেতরে এবং বাইরে প্রার্থীর প্রতীক চিহ্ন থাকবে এবং ভোট বাক্সের বাইরে যে-কোনো একদিকে প্রার্থীর নাম উর্দু, হিন্দি এবং পাঞ্জাবী ভাষাতে থাকতে হবে। এর সাথে নির্বাচনী কেন্দ্রের নাম, ভোটদান কেন্দ্র এবং ভোটদান কেন্দ্রের সংখ্যাও উল্লেখ থাকবে। প্রার্থীর সংখ্যার বিবরণসহ সিলমোহর দেওয়া একটি কাগজ প্রিসাইডিং অফিসারের হস্তাক্ষর সহ ভোটবাক্সের টোকেন ফ্রেমে নিবদ্ধ করতে হবে, এবং ভোটবাক্সের ঢাকনাকে তারের সাহায্যে বাঁধতে হবে। এই সকল কাজ নির্বাচনের নির্ধারিত দিনের ঠিক একদিন আগেই করতে হতো। বিভিন্ন প্রতীক এবং লেবেল ভোট বাক্সগুলোতে লাগানোর জন্য স্টিলের বাক্সগুলোকে প্রথমে শিরিষ কাগজ বা ইটের টুকরো দিয়ে ঘষতে হয়েছিল, আমি দেখতে পেয়েছি যে এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে আমরা দুই মেয়েসহ ছয়জন ব্যক্তির পাঁচ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এই সকল কাজ আমার বাড়িতে করা হয়েছিল।"

ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)

প্রথম দুটি নির্বাচনের পর এই পদ্ধতিটি পরিবর্তন করা হয়েছিল। এখন ব্যালট পেপারে সকল প্রার্থীর নাম ও চিহ্ন অঙ্কিত করা থাকে। ভোটদাতাকে এই ব্যালট পেপারে নিজের পছন্দের প্রার্থীর নামের উপর সিলমোহর লাগাতে হয়। এই পদ্ধতিটি প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত কার্যকর ছিল। নব্বুইয়ের দশকের শেষদিকে নির্বাচন কমিশন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করতে শুরু করে। ২০০৪ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে ইভিএমের ব্যবহার শুরু হয়।

চলো গবেষণা করি

তোমার পরিবার বা আশপাশের প্রবীণদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো।

- প্রথম বা দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কেউ কী ভোট দিয়েছেন? তারা কাকে ভোট দিয়েছিলেন এবং কেন?
- এখানে এমন কেউ কি আছেন যিনি ভোটদানের তিনটি পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন? তারা কোন পদ্ধতিটি পছন্দ করেন?
- পুরোনো নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে কী পার্থক্য আছে বলে তারা মনে করেন?

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮)
প্রকৃত নাম আবুল কালাম মহিউদ্দিন আহমেদ। ইসলামের বিদ্বান; স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কংগ্রেস নেতা; হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা; দেশভাগের বিরোধী; গণপরিষদের সদস্য; স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী।

ভারতীয় সম্পাদক এটিকে "ইতিহাসের বৃহত্তম জুয়া" বলে অভিহিত করেছেন। অর্গানাইজার নামক একটি সাময়িক পত্রিকায় লিখা হয়েছিল যে জওহরলাল নেহরু "ভারতে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যর্থতা বেঁচে থাকতেই স্বীকার করে নেবেন।" ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একজন ব্রিটিশ সদস্য দাবি করেছিলেন যে "ভবিষ্যত এবং আরো বেশি আলোকিত সমাজ লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর মানুষের ভোট লিপিবদ্ধ করার অযৌক্তিক প্রহসনকে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবে।"

নির্বাচন দু'বার পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫১ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এই নির্বাচনকে ১৯৫২ সালের নির্বাচন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কারণ ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের বেশিরভাগ অংশে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। প্রচারাভিযান, ভোটগ্রহণ এবং ভোট গণনা সম্পন্ন করতে ছয়মাস সময় লেগেছিল। নির্বাচন ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, প্রতিটি আসনের জন্য গড়ে চারজনের বেশি প্রার্থী ছিল। জনগণ অতি উৎসাহের সঙ্গে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন— নির্বাচনের দিন প্রায় অর্ধেকের বেশি ভোটার ভোটদানে অংশ নিয়েছিলেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পরাজিত প্রার্থীরাও এই ফলাফলকে নিরপেক্ষ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ভারতীয় নির্বাচন পদ্ধতির পরীক্ষা সমালোচকদের ভুল প্রমাণিত করেছিল। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মতে, নির্বাচনের ফলাফল— "সেই সমস্ত সংশয়বাদীদের ভুল প্রমাণিত করেছে যারা এই দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রবর্তনকে ঝুঁকিপূর্ণ প্রয়োগ বলে মনে করেছিল।" হিন্দুস্থান টাইমস-এর মতে, "সমগ্র বিশ্ব একমত যে, ভারতীয় জনগণ বিশ্বের ইতিহাসে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের বৃহত্তম পরীক্ষায় প্রশংসনীয়ভাবে সফলতা অর্জন করেন।" বিদেশি পর্যবেক্ষকরাও সমানভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে ভারতের সাধারণ নির্বাচন সমগ্র বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। দারিদ্র বা শিক্ষার অভাবে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন হতে পারেনা এই তর্কটিকে আর মানা সম্ভব ছিল না। এই নির্বাচন প্রমাণ করেছিল যে বিশ্বের যে-কোনো জায়গায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব।

প্রথম তিনটি সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের আধিপত্য (Congress dominance in the first three general elections)

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল কাউকেই অবাক করেনি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে বলে আশা ছিল। জাতীয় আন্দোলনের পরম্পরাগত দল হিসেবে কংগ্রেস জনপ্রিয় ছিল। তখনকার সময়ে এটিই একমাত্র দল ছিল যার সংগঠন সমগ্র দেশে ছড়িয়েছিল। পরিশেষে এই দলে জওহরলাল নেহরু যিনি ভারতীয় রাজনীতির সব থেকে জনপ্রিয় এবং দক্ষতা সম্পন্ন জননেতা ছিলেন, তিনি কংগ্রেসের প্রচারাভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সমগ্র দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। যখন চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল তখন কংগ্রেসের বিশাল জয়ের পরিণাম অনেককে অবাক করে দিয়েছিল। দলটি প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ৪৮৯ আসনের মধ্যে ৩৬৪টি আসন জয়লাভ করে এবং অন্য যে-কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে ফলাফলের ভিত্তিতে অনেক এগিয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৬টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন ও সংগঠিত হয়েছিল।

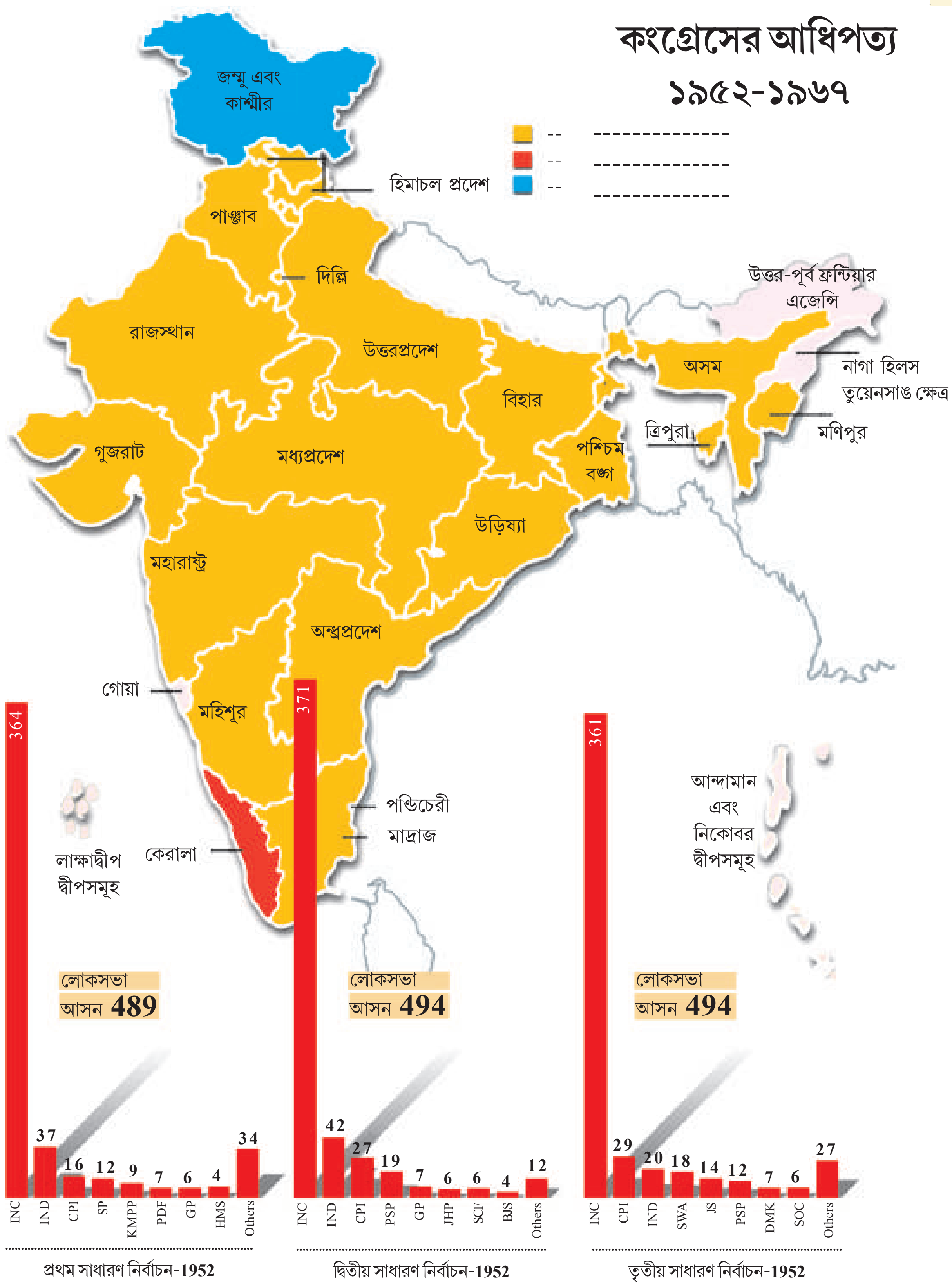

Note: This illustration is not a map drawn to scale and should not be taken to be an authentic depiction of India's external boundaries.

Can you identify the places where the Congress had a strong presence?
In which States, did the other parties perform reasonably well ?

Congress Voted Back To Power At Centre

266 SEATS ANNEXED SO FAR OUT OF 500

THE Congress Party has been voted back to power at the Centre. By Wednesday night, it had secured 266 seats—15 more than needed for an absolute majority in the 500-member Lok Sabha. The combined Opposition strength at that stage was 83.

This verdict in favour of a Congress Government at the Centre for the next five years came on the same day as the communists made virtually sure of forming a Government in Kerala.

Reds' Success In Kerala

Working Majority Achieved

Credit : The Hindu

কংগ্রেস দল রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনগুলোতেও বড় জয়লাভ করেছিল। ট্রাবানকোর-কোচিন (আজকের কেরালার অংশ) মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যাকে বাদ দিয়ে সমগ্র রাজ্যগুলোতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। এমনকী শেষ পর্যন্ত এই রাজ্যগুলিতেও কংগ্রেস সরকার গঠন করেছিল। এইভাবে জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে সমগ্র দেশে কংগ্রেস দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হন।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় সাধারণ নির্বাচনী মানচিত্রের দিকে নজর দিলে তোমরা ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস দলের আধিপত্যের ধারণা পাবে। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল লোকসভায় তিন-চতুর্থাংশ আসনে জয়লাভ করে একই অবস্থা বজায় রেখেছিল। কংগ্রেস দল সবগুলো আসনে জয়লাভ করেছিল। ঐ নির্বাচনে দশভাগের একভাগ আসনও বিরোধী দলগুলো জয়লাভ করতে পারেনি। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল কয়েকটি ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৫৭ সালে কেরালায় সিপিআই (CPI) এর নেতৃত্বে একটি জোট সরকার গঠন। এইরকম ব্যতিক্রম বাদ দিলে জাতীয় এবং রাজ্য সরকারগুলোতে কংগ্রেস দলের আধিপত্য ছিল।

রাজকুমারী অমৃত কৌর (১৮৮৯-১৯৬৪) : একজন গান্ধীবাদী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী; কপুরথলা রাজ পরিবারের সদস্য; খ্রিস্টান ধর্ম উত্তরাধিকার সূত্রে মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত, গণপরিষদের সদস্য; স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী; ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন।

কংগ্রেসের এই বিপুল জয় আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে তুলেছিল। কংগ্রেস প্রতি চারটি আসনের মধ্যে তিনটিতে জয়লাভ করে কিন্তু সমগ্র ভোটের অর্ধেক পরিমাণও পায়নি। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫২ সালে কংগ্রেস পার্টি মোট ভোটের ৪৫ শতাংশ পেয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস ৭৪ শতাংশ আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। ভোটের ফলাফলের দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল সোসালিস্ট পার্টি সারা দেশে ১০ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছিল। কিন্তু এই দল তিন শতাংশ আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি। এটা কীভাবে হল? এর জন্য তোমাদের গত বছর *'ভারতীয় সংবিধানের কার্যপ্রণালী' নামক* পাঠ্যপুস্তকে সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি (first-past-the-post method) আলোচনাটিস্মরণ করতে হবে।

আমাদের দেশে নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে যে দল অন্যের চেয়ে বেশি ভোট পায় সেই দল তার আনুপাতিক অংশের চেয়ে অনেক বেশি আসন লাভ করে। ঠিক এটাই কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করেছিল। আমরা যদি সমস্ত অ-কংগ্রেসি প্রার্থীদের ভোটকে যুক্ত করি তবে দেখবো যে এটি কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের চেয়েও বেশি। কিন্তু অ-কংগ্রেসি ভোটগুলি বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীদের মধ্যে বিভক্ত ছিল। সুতরাং, কংগ্রেস দল বিরোধীদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল এবং এর ফলস্বরূপ বেশি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER

MADRAS, FRIDAY, JULY 31, 1959.

10 PAGES

For Silk SAREES Quality Design Price.... Nalli CHINNASAMI CHETTY

Konar's TAMIL NOTES

PRESIDENT'S RULE IN KERALA

CABINET ADVISES ACTION UNDER ARTICLE 356

PROCLAMATION MAY BE ISSUED TO-DAY

(From Our Correspondent)

NEW DELHI, July 30.

The Central Cabinet to-day advised the President of India, it is learnt, to take over the administration of Kerala State under powers vested in him by Article 356 of the Constitution to end the impasse there.

The proclamation by the President taking over the functions of the State Government, the draft of which has been sent for his approval, is expected to be issued to-morrow. It is likely to take effect from the mid-night of July 31.

INTERVENTION BY CENTRE

KERALA MINISTER'S REACTION

"TRAGIC DRAMA" NEARING END

MADURAI, July 30.

Queen Elizabeth receiving on behalf of her children a gift of lacrosse equipment from a Canadian child dressed in North American Indian costume during her tour of the Dominion. Lacrosse was the favourite game of the aborigines of Canada as well as of the early settlers.

EXTERNAL RESOURCES FOR 3RD PLAN SCHEMES

CONGRESS GOVT. IN BENGAL

CHARGES AGAINST

ANOTHER MAJOR WAR UNLIKELY

KHRUSHCHEV'S VIEW: "FOREIGN BASES MUST BE DISBANDED"

PLEA FOR SUMMIT TALKS REITERATED

SOVIET-AMERICAN RELATIONS

REVIEW OF TALKS WITH NIXON

MOSCOW, July 30.

কেরালায় কমিউনিস্টদের জয় (Communist victory in Kerala)

১৯৫৭ সালের শুরুতেই কংগ্রেস দল কেরালায় পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেয়েছিল। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে কেরালায় অনুষ্ঠিত বিধানসভার নির্বাচনে কমিউনিস্ট দল বিশাল সংখ্যক আসনে জয়লাভ করে। দলটি ১২৬টি আসনের মধ্যে ৬০টি আসন জয়লাভ করে এবং ৫টি স্বতন্ত্র দলের সমর্থন পেয়েছিল। রাজ্যপাল কমিউনিস্ট বিধায়ক দলের নেতা ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। বিশ্বে প্রথমবারের মতো একটি কমিউনিস্ট দলের সরকার গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে।

রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পরে, কংগ্রেস দল নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে 'মুক্তি সংগ্রাম' শুরু করে। ক্রান্তিকারী ও প্রগতিশীল শাসন ব্যবস্থা অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) ক্ষমতায় এসেছিল। কমিউনিস্টরা দাবি করেছিল যে কংগ্রেসের ডাকা এই আন্দোলন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারকে বরখাস্ত করে। এই সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত বিতর্কিত প্রমাণিত হয়েছিল এবং সাংবিধানিক জরুরি ক্ষমতাগুলো অপব্যবহারের প্রথম উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে ত্রিবান্দ্রামে তার মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ইএমএস নাম্বোদ্রিপাদ।

সমাজতান্ত্রিক দল (Socialist party)

সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভবের ইতিহাস স্বাধীনতার পূর্বে খুঁজে পাওয়া যায় যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গণআন্দোলন চলছিল। ১৯৩৪ সালে একদল তরুণ নেতৃবৃন্দের দ্বারা কংগ্রেস দলের মধ্যেই কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক (CSP) দলের গঠন হয়। এই নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসকে আরো পরিবর্তনশীল এবং সমতাবাদী করতে চেয়েছিল। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেসের নিজ দলের সদস্যদের দ্বৈত সদস্যপদ প্রতিরোধের জন্য দলীয় সংবিধান সংশোধন করে। এটি ১৯৪৮ সালে সমাজতন্ত্রীদের একটি পৃথক সমাজতান্ত্রিক দল গঠনে বাধ্য করেছিল। এই দলের নির্বাচনী ফলাফল তার সমর্থকদের নিরাশ করেছিল। যদিও দেশের বেশিরভাগ রাজ্যে এই দলের উপস্থিতি ছিল, তবে এটি কেবল কিছু অঞ্চলেই নির্বাচনী সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল। সমাজতান্ত্রিকরা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন যা তাদেরকে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টের থেকে পৃথক করেছিল। তারা পুঁজিপতি এবং জমিদারের পক্ষ নেওয়ার জন্য এবং শ্রমিক ও কৃষকদের উপেক্ষা করার জন্য কংগ্রেস দলের সমালোচনা করেছিল। ১৯৫৫ সালে সমাজতন্ত্রীরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় যখন কংগ্রেস ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠন করা। সুতরাং সমাজতান্ত্রিকদের পক্ষে কংগ্রেসের একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করা কঠিন হয়ে পরেছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন রামমনোহর লোহীয়ার নেতৃত্বে কংগ্রেস দল থেকে দূরত্ব বজায় রাখে এবং কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হতে থাকে। অশোক মেহেতার মতো অন্য কয়েকজন কংগ্রেসের সাথে সীমিত সহযোগিতার পক্ষে ছিলেন।

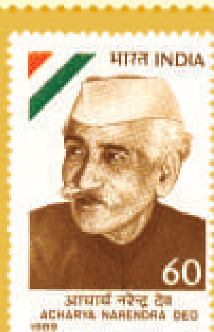

আচার্য নরেন্দ্র দেব (১৮৮৯-১৯৫৬) : স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠাতা; স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বেশ কয়েকবার কারাগারে ছিলেন; কৃষক আন্দোলনে সক্রিয়; বৌদ্ধ ধর্মের একজন বিদ্বান, স্বাধীনতার পরে সমাজতান্ত্রিক দল এবং পরবর্তীতে প্রজা সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সমাজতান্ত্রিক দলে অনেক বিভাজন ও পুনর্মিলনের কারণে নানাহ নতুন সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। এর মধ্যে রয়েছে কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি, প্রজা সমাজতান্ত্রিক দল, সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক দল। জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, অশোক মেহেতা, আচার্য নরেন্দ্র দেব, রামমনোহর লোহিয়া এবং এস.এম. যোশী এইসব নতুন সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর অন্যতম নেতৃবৃন্দ ছিলেন। সমাজবাদী পার্টি, জাতীয় জনতা দল, জনতা দল (ইউনাইটেড), জনতাদল (সেকুলার) এর মতো সমসাময়িক ভারতের অনেক দলের উদ্ভবও সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

কংগ্রেস আধিপত্যের প্রকৃতি (Nature of Congress dominance)

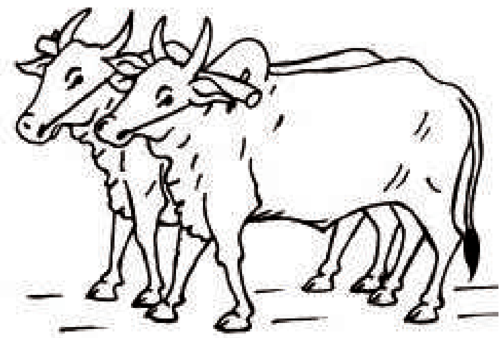

শুধুমাত্র ভারতই একমাত্র দেশ নয় যেখানে একটি দলের আধিপত্যের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমরা যদি বিশ্বের দিকে তাকাই তবে একদলীয় আধিপত্যের অনেক উদাহরণ দেখতে পাব। বিশ্বের অন্যান্য দেশের একদলীয় আধিপত্য এবং ভারতীয় একদলীয় আধিপত্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সাথে আপোশ করে একদলীয় আধিপত্য নিশ্চিত করা হয়েছিল। চিন, কিউবা এবং সিরিয়ার মতো দেশের সংবিধান শুধুমাত্র একটি দলকেই দেশ শাসন করার অনুমতি দিয়েছে। মায়ানমার, বেলারুশ, মিশর এবং ইরিত্রিয়ার মতো আরও কিছু দেশে আইনি ও সামরিক পদক্ষেপের কারণে কার্যকরভাবে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কয়েকবছর আগেও মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানে একদলীয় আধিপত্য কার্যকর ছিল, উপরোক্ত উদাহরণের তুলনায় ভারতে কংগ্রেস দলের আধিপত্য আলাদা ছিল, কারণ এই আধিপত্য গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে কার্যকর হয়েছিল। ভারতবর্ষে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অনেক দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও কংগ্রেস দল একের পর এক নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য সমাপ্তির পর আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস যে আধিপত্য কায়েম করেছিল এটি ছিল তারই অনুরূপ।

১৯২৯ সাল ন্যাশনাল রেভুলুশনারি পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ইনস্টিটিউশনাল রেভুলুশনারি পার্টি হিসাবে নতুন নামকরণ হয় (স্প্যানিশে একে পি.আর.আই বলা হয়)। এই দল প্রায় ছয়দশক ধরে মেক্সিকোতে ক্ষমতা ভোগ করে। এটি মেক্সিকান বিপ্লবের প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী দল। মূলত পি.আর.আই. হল রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন এবং অসংখ্য রাজনৈতিক দল সহ আরো বিভিন্ন স্বার্থের মিশ্রণ। কিছুকাল পর পি.আর.আই.-এর প্রতিষ্ঠাতা প্লুটারকো এলিয়াস কলস সংগঠনটি দখল করে এবং এর মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নির্বাচন নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিবারই পি.আর.আই. বিজয়ী হয় ক্ষমতাসীন দলকে আরো বেশি বৈধতা দেওয়ার জন্য নামমাত্র কিছু দলের অস্তিত্ব ছিল। নির্বাচনী আইনগুলো এমনভাবে পরিচালিত হয়েছিল যাতে পি.আর.আই সর্বদাই নিশ্চিতরূপে বিজয়ী হয়। ক্ষমতাশীল দল সর্বদাই নির্বাচনে কারচুপি করত। এই শাসনকে নিখুঁত এক নায়কতন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। অবশেষে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলটি হেরে যায়। মেক্সিকো আর একদলীয় আধিপত্যের দেশ রইল না। কিন্তু পি.আর.আই-এর আধিপত্যের সময়কালে গৃহীত শাসন প্রণালীগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেছিল। নাগরিকরা এখনো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনী প্রকৃতির উপর পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে পারেনি।

বাবাসাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) : বর্ণ বিরোধী আন্দোলনের এবং দলিতদের ন্যায়বিচারের সংগ্রামের নেতা; বিদ্বান এবং বুদ্ধিজিবী; ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা; পরবর্তীতে সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন, রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদের সদস্য; গণপরিষদের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান; স্বাধীনতার পরে নেহরুর প্রথম মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী, ১৯৫১ সালে হিন্দু কোর্ড বিল নিয়ে মত বিরোধের কারণে পদত্যাগ করেছিলেন; হাজার হাজার অনুগামী সহ ১৯৫৬ সালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

রফি আহম্মেদ কিদওয়াই (১৮৯৮-১৯৫৮) : উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস নেতা; ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালে উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী; স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভার যোগাযোগ মন্ত্রী; খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী (১৯৫২-১৯৫৪)।

কংগ্রেস দলের এই অসাধারণ সাফল্যের শিকড়গুলো লুকিয়ে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক পরম্পরার উপর। কংগ্রেসকে জাতীয় আন্দোলনের উত্তরাধিকারী হিসেবে দেখা হয়েছিল। সেই সংগ্রামের শীর্ষে থাকা অনেক নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কংগ্রেস আগে থেকেই অনেক সুসংহত দল ছিল এবং অন্য দলগুলো কোনো কৌশল নিয়ে নেবার আগেই কংগ্রেস দল তার প্রচারাভিযান শুরু করেছিল। আসলে অন্যান্য অনেক দলই স্বাধীনতার সময় বা তার পরে গঠিত হয়েছিল। কংগ্রেস দলের বিশেষ সুবিধা ছিল 'প্রথম এবং একামাত্র' হওয়ার। স্বাধীনতার সময় দলটি কেবল দেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়েই ছড়িয়ে পরেনি, স্থানীয় পর্যায়েও তার সংগঠন বিস্তৃত ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল কংগ্রেস যেহেতু সাম্প্রতিককালে জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তাই এর প্রকৃতি ছিল সর্বাত্মক। এই সমস্ত কারণগুলো কংগ্রেস দলের আধিপত্য বিস্তারে অবদান রাখে।

সামাজিক ও মতাদর্শগত জোট হিসেবে কংগ্রেস (Congress as social and ideological coalition)

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের উত্থানের ইতিহাস তোমরা ইতিমধ্যে অধ্যয়ন করেছো। সেই সময় এটি নব-শিক্ষিত, পেশাদার ও বাণিজ্যিক শ্রেণির হিতের জন্য চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এটি গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। এর ফলে কংগ্রেস একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তার আধিপত্যের ভিত্তিস্থাপন করে। কংগ্রেসের শুরু হয়েছিল ইংরেজি বলা, উচ্চবর্ণ, উচ্চ মধ্যবিত্ত শহুরে অভিজাত শ্রেণি দ্বারা প্রভাবিত একটি দল হিসেবে। কিন্তু কংগ্রেসের সম্পৃক্ততা বিভিন্ন অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনেও বিস্তৃতি লাভ করে। কংগ্রেস মতাদর্শগত দিক থেকে পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীকে একত্রিত করে। কৃষক এবং শিল্পপতি, নগরবাসী ও গ্রামবাসী, শ্রমিক ও মালিক, নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণির এবং বর্ণের সকলেই কংগ্রেসে জায়গা পেয়েছিল। ধীরে ধীরে এর নেতৃত্ব উচ্চবর্ণ এবং শ্রেণির পেশাজীবিদের ছাড়াও গ্রামীণ অভিমুখী কৃষিভিত্তিক নেতাদের কাছে প্রসারিত হয়েছিল। স্বাধীনতার সময়কালে কংগ্রেস শ্রেণি, বর্ণ, ধর্ম ও ভাষা কিংবা বিভিন্ন স্বার্থের ক্ষেত্রে ভারতীয় বৈচিত্র্যতায় ব্যাপকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে রং ধনুর মতো সামাজিক জোটে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এই গোষ্ঠীর অনেকেই কংগ্রেসের মধ্যে তাদের পরিচয়কে একীভূত করেছিল। আবার অনেক সময় বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি তার নিজস্ব বিশ্বাস নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই অর্থে কংগ্রেসও ছিল একটি বিচারধারা গত জোট। এতে বিপ্লবী ও শান্তিবাদী, রক্ষণশীল ও পরিবর্তকামী, চরমপন্থী ও নরমপন্থী, ডান, বাম সকলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কংগ্রেস এমন একটি 'মঞ্চ' ছিল যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী এবং রাজনৈতিক দল একসাথে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। স্বাধীনতার পূর্বের দিনগুলিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দল ও সংগঠন নিজস্ব সংবিধান ও স্বাতন্ত্র্যতা নিয়ে যুক্ত হতে পারত।

পূর্বে একই দলের মধ্যে জোট ছিল, এখন বিভিন্ন দলের মধ্যে জোট চলছে। এর মানে কি এই যে ১৯৫২ সাল থেকেই দেশে জোট সরকার চলছে?

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

১৯২০-এর দশকের প্রথম দিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্যবাদী (কমিউনিস্ট) দলসমূহের উদ্ভব হয়। তারা রুশের বলশেভিক বিপ্লব থেকে প্রেরণা নিয়ে দেশের সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৯৩৫ সাল থেকে সাম্যবাদীরা (কমিউনিস্টরা) মূলত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই কাজ করেছিলেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে কমিউনিস্টরা যখন নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন থেকেই তারা কংগ্রেস থেকে বিভক্ত হয়ে পরে। অন্যান্য অ-কংগ্রেসি দলগুলোর বিপরীতে সি.পি.আই. (CPI) এর কাছে স্বাধীনতার সময় সুচারু দলীয় কার্যপ্রণালী এবং সক্রিয় কর্মীদল ছিল। তবে স্বাধীনতার পর দলের মধ্যে বিভিন্ন মতের উত্থান হয়েছিল। দলকে যে মূল প্রশ্নটি সমস্যায় ফেলেছিল তা হল ভারতীয় স্বাধীনতার প্রকৃতি। ভারত আসলেই স্বাধীন হয়েছিল না কি স্বাধীনতা ছিল নিরর্থক?

স্বাধীনতার পরেই দলটি মনে করেছিল যে ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর সত্যিকারের স্বাধীনতা ছিল না এবং ফলে তারা তেলেঙ্গানায় সহিংস বিদ্রোহকে উৎসাহিত করেছিল। কমিউনিস্টরা তাদের অবস্থানের পক্ষে জনসমর্থন জোগাতে ব্যর্থ হয় এবং সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক দমিত হয়েছিল। এটি তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট দল সহিংস বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সিপিআই (CPI) ১৬টি আসনে জয়লাভ করে এবং বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পার্টির সমর্থন অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং কেরালায় বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল।

এ.কে গোপালন, এস.এ. ডাঙ্গো, ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ, পি.সি. যোশী, অজয় ঘোষ এবং পি. সুন্দররাইয়া সিপিআই-এর উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন। ১৯৬৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনের মধ্যে বিচারধারাগত দ্বন্দ্বের ফলে দলটি বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত পন্থী দলটি সিপিআই হিসেবে থেকে যায় এবং বিরোধীরা সিপিআই(এম) গঠন করে। উভয়পক্ষ এখনো সক্রিয় রয়েছে।

এ.কে. গোপালন (১৯০৪-১৯৭৭): কেরালার কমিউনিস্ট নেতা, প্রথম দিকে কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন; ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান; ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের পর সিপিআই(এম)-এ যোগ দিয়ে দলকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করেন; সাংসদ হিসেবে সম্মানিত; ১৯৫২ সাল থেকে সংসদের সদস্য।

চলো ছায়াছবিটি দেখি

সিংহাসন

অরুণ সাধুর দুটি উপন্যাস, সিংহাসন এবং মুম্বাই দিনাঙ্ক অবলম্বনে নির্মিত এই মারাঠি ছবিতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদের লড়াইয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটি সাংবাদিক দিগু টিপনিসের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। উনি ছিলেন ঘটনার নিরব 'সূত্রধর'। এই ছবিতে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে তীব্র ক্ষমতার লড়াই এবং বিরোধীদলের গৌণ ভূমিকার চিত্রটি তুলে ধরার চেস্টা করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী বিশ্বাস রাও দম্ভাদে ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রীকে আসনচ্যুত করার সর্বাত্মক প্রচেস্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উভয় প্রার্থী ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ডি'কাস্টার সমর্থন পাওয়ার চেস্টা করেছিল। দলীয় লড়াই এর সময় অন্যান্য রাজনীতিবিদ্‌রাও উভয়পক্ষের সাথে দর কষাকষি করায় সময় সর্বাধিক সুবিধা লাভের চেস্টা করেছিল। মোম্বাই এর পাচার বাণিজ্য এবং গ্রামীণ মহারাষ্ট্রে ভয়ানক সামাজিক বাস্তবতা এই ছবির পটভূমিকা তৈরি করে।

বছর : ১৯৮১
পরিচালক : জব্বার প্যাটেল
চিত্রনাট্য : বিজয় টেন্ডুলকর
অভিনয়ে : নিলু ফুলে, অরুণ সারনায়েক, ড. শ্রীরাম লাগু, সতীশ দুবাসি, দত্ত ভাট, মধুকর টুরাডমাল, মাধব ওয়াটডে, মোহন আগাসে।

এর মধ্যে কিছু দল যেমন কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল পরবর্তীতে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিরোধী দল হয়ে উঠে। পদ্ধতিগত কার্যক্রম বা নীতিগত বিষয়ে মতভেদগুলিকে কংগ্রেস দল সমাধান না করেও ঐক্যমতের ভিত্তিতে দল পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিল।

সহনশীলতা ও বিভাজনের ব্যবস্থাপনা (Tolerance and management of factions)

কংগ্রেসের এই জোট চরিত্র এই দলকে অস্বাভাবিক শক্তি দিয়েছে। প্রথমত, এটি এমন একটি জোট যে যোগদানকারী প্রত্যেককে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এই কারণেই কংগ্রেস দলকে কোনো চূড়ান্ত অবস্থান নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল এবং সব বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়েছিল। বোঝাপড়া এবং অন্তর্ভুক্তি একটি জোটের বৈশিষ্ট্য। এই কৌশল বিরোধীদের অসুবিধায় ফেলে দিয়েছিল, বিরোধীরা যা কিছু বলতে চেয়েছিল তা সবকিছুই কংগ্রেসের কর্মসূচি এবং আদর্শে স্থান পেত। দ্বিতীয়ত, যে দলের জোটের প্রকৃতি রয়েছে সেখানে অভ্যন্তরীণ পার্থক্যগুলির প্রতি বৃহত্তর সহনশীলতাও রয়েছে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী ও নেতাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সমন্বিত করারও ব্যবস্থা রয়েছে। কংগ্রেস এই দুটো বিষয়কেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই অনুসরণ করত এবং এটি স্বাধীনতার পরেও চালিয়ে যায়। এই কারণেই কোনো দল কংগ্রেসের অবস্থান এবং তার অংশীদারিত্বের সাথে সন্তুষ্ট না হলেও কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই থাকত এবং দলত্যাগ করে 'বিরোধী' হওয়ার পরিবর্তে অন্য দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতো।

দলের অভ্যন্তরে থাকা এই দলগুলিকে **'দলাদলি'** বলা হয়। কংগ্রেস দলের জোটগত প্রকৃতি এইসব দলগুলিকে সহ্য করতো এবং কখনো কখনো উৎসাহ দিত। এর মধ্যে কয়েকটি দলের আদর্শগত ভিত্তি ছিল। তবে প্রায়শই এই দলগুলি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে লিপ্ত ছিল। দুর্বলতার পরিবর্তে এই ধরনের দলাদলি দুর্বলার পরিবর্তে বরং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। যেহেতু কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরেই একে অপরের বিরুদ্ধে দলাদলি করার সুযোগ ছিল যেহেতু বিভিন্ন স্বার্থ ও মতাদর্শের অনুসারী নেতাগণ নতুন দল গঠনের পরিবর্তে কংগ্রেস বলয়ে থেকে যাওয়াই বেশি পছন্দ করবেন।

ভারতীয় জনসংঘ

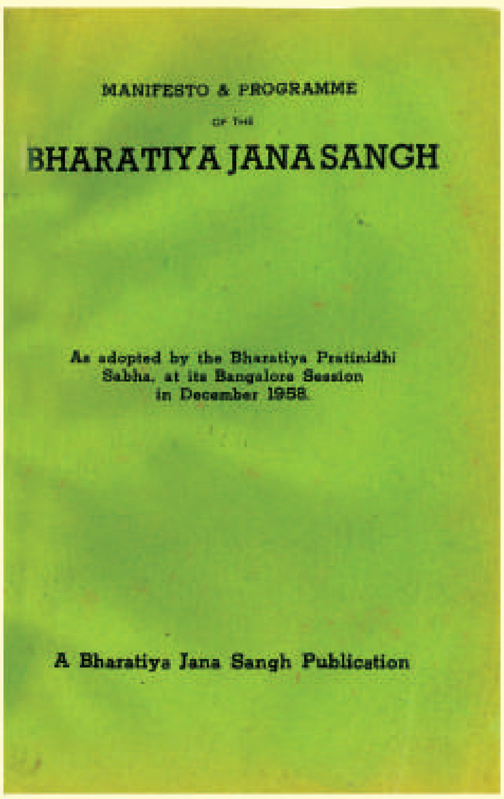
MANIFESTO & PROGRAMME

OF THE

BHARATIYA JANA SANGH

As adopted by the Bharatiya Pratinidhi Sabha, at its Bangalore Session in December 1958.

A Bharatiya Jana Sangh Publication

১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসংঘের গঠন হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। যদিও এই দলের শিকড় স্বাধীনতার আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং হিন্দু মহাসভায় খুঁজে পাওয়া যায়।

জনসংঘ বিচারধারাগত ও কর্মসূচিগত দিক থেকে অন্যান্য দল থেকে ভিন্ন ছিল। জনসংঘ এক দেশ, এক সংস্কৃতি এবং এক জাতির ধারণার উপর জোর দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, দেশ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আধুনিক, প্রগতিশীল ও শক্তিশালী হতে পারে। জনসংঘ ভারত ও পাকিস্তান পুনর্মিলনের মাধ্যমে অখণ্ড ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্থান দেওয়ার আন্দোলনে এই দলটি সর্বপ্রথম ছিল এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের ছাড় দেওয়ারও বিরোধী ছিল। ১৯৬৪ সালে চিন তার পারমানবিক পরীক্ষা চালানোর পরে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্র বিকাশের পক্ষে এই দলটি সবসময় সমর্থন জানিয়ে আসছিল।

১৯৫০-এর দশকে জনসংঘ নির্বাচনী রাজনীতির প্রাঙ্গণে ততটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি এবং এই দলটি ১৯৫২ সালের লোকসভা নির্বাচনে মাত্র তিনটি আসন এবং ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় চারটি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রারম্ভিক বছরগুলোতে এই দলের সমর্থন মূলত হিন্দিভাষী রাজ্য যেমন- রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের শহরাঞ্চল থেকে আসে। জনসংঘের নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং বলরাজ মাধোক অন্যতম ছিলেন। ভারতীয় জনতা দলের শেকড় ভারতীয় জনসংঘে রয়েছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায় (১৯১৬-১৯৬৮) : ১৯৪২ সাল থেকে সর্বসময়ের জন্য আরএসএস কর্মী; ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য; সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসংঘের সভাপতি; একাত্ম মানবতাবাদের ধারণার প্রণেতা।

আমি ভেবেছিলাম দলবিরোধী একটি রোগ যা নিরাময় করা প্রয়োজন। দলবিরোধী যদি স্বাভাবিক ও ভাল হয় তাহলে এটাকে যুক্তিযুক্ত বলা যায়।

কংগ্রেস শাসিত বেশিরভাগ রাজ্যের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল অসংখ্য **উপদল** নিয়ে। এই দলগুলো বিভিন্ন মতাদর্শগত অবস্থান নিয়ে এবং কংগ্রেসকে একটি বৃহৎ মধ্যপন্থী দল হিসেবে উপস্থিত করেছিল। অন্যান্য দলগুলি প্রাথমিকভাবে এই উপদলগুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল এবং এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে “প্রান্তিক অবস্থান” থেকে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করত। এই সকল দলগুলোকে কর্তৃত্বের প্রকৃত ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তারা ক্ষমতাসীন দলের বিকল্প ছিল না। তারা প্রতিনিয়ত সমালোচনা ও চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করত। উপদলীয় ব্যবস্থাটি ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করত। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা তাই কংগ্রেসের মধ্যে থেকে শুরু হয়েছিল। সেই অর্থে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় প্রথম দশকে কংগ্রেসই ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল হিসিবে ভূমিকা পালন করত।

বিরোধী দলের উত্থান (Emergence of opposition parties)

Credit : Sankar

“টাগ অফ ওয়ার” (২৯ আগস্ট ১৯৫৪) এই কার্টুনে সরকার এবং বিরোধীদলের তুলনামূলক ক্ষমতাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই কার্টুনে দেখানো হচ্ছে যে নেহরু এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সহযোগীরা বৃক্ষে বসে আছেন এবং বৃক্ষের নীচে বিরোধী নেতৃবৃন্দ এ.কে. গোপালন, আচার্য কৃপালানী, এন.সি. চ্যাটার্জি, শ্রীকান্ত নায়ার এবং সর্দার হুকুম সিং প্রমুখ বৃক্ষটিকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, এই সময়কালে ভারতে বিরোধী দল ছিল না একথা বলা ঠিক নয়। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আলোচনার সময় আমরা কংগ্রেস দল ছাড়াও অনেক দলের নাম উল্লেখ করেছি। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক অন্যান্য দেশের তুলনায় সেই সময় ভারতে বহুসংখ্যক এবং সক্রিয় প্রাণবন্ত বিরোধী দল ছিল। এর মধ্যে কয়েকটি ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কয়েকটি দল ষাট এবং সত্তরের দশকে ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আজকের প্রায় অধিকাংশ অ-কংগ্রেসি দলের শেকড় ১৯৫০-এর বিরোধী দলগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

এই সময়ে সমস্ত বিরোধী দলগুলো লোকসভা এবং বিধানসভাগুলোতে নামমাত্র প্রতিনিধিত্ব অর্জনে সফল হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাদের উপস্থিতি, ভারতের শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই দলগুলো কংগ্রেস দলের নীতি ও কার্যকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করত। এটি ক্ষমতাশীল দলকে নিয়ন্ত্রণ রেখেছিল এবং প্রায়শই কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যকে পরিবর্তন করতে সচেষ্ট থাকত। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিকল্পকে বাঁচিয়ে রেখে এই দলগুলো শাসন ব্যবস্থায় চলমান অবস্থার শাসন ব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষকে গণতন্ত্র বিরোধী

স্বতন্ত্র দল (Swatantra Party)

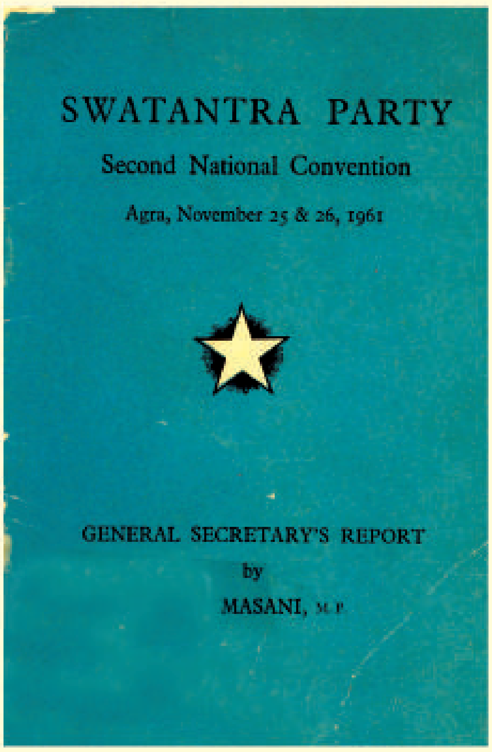
SWATANTRA PARTY
Second National Convention
Agra, November 25 & 26, 1961
GENERAL SECRETARY'S REPORT
by
MASANI, M.P.

কংগ্রেসের নাগপুরের অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভূমির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ রাজ্য সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্যের বাণিজ্য ব্যবস্থার অধিগ্রহণ এবং সমবায় চাষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়ে ১৯৫৯ সালের আগস্টে স্বতন্ত্র দল গঠন করা হয়েছিল। দলের নেতৃত্বে ছিলেন সি রাজাগোপালাচারী, কে.এম. মুন্সি, এন.জি. রাঙ্গা এবং মিনু মাসানির মতো পুরানো কংগ্রেস সদস্যগণ। এই দলটি আর্থিক বিষয়ের উপর নিজেদের অবস্থান অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র করে রেখেছিল।

স্বতন্ত্র দল চেয়েছিল সরকার যেন অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে গৌণ ভূমিকা পালন করুক। তাদের বিশ্বাস ছিল যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি আসতে পারে। স্বতন্ত্র দল বিকাশমূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা, জাতীয়করণ এবং সরকারি পরিসেবা ইত্যাদির সমালোচনায় মুখর ছিলেন। এর পরিবর্তে দলটি বেসরকারি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের পক্ষপাতি ছিল। স্বতন্ত্র দল কৃষিক্ষেত্রে ভূমি সিলিং, সমবায় চাষ এবং খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেছিল। দলটি প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার বিরোধী ছিল এবং পাশাপাশি লাইসেন্সিং বা অনুমতিপত্র ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়ার দাবি করেছিল। এই দলটি জোট নিরপেক্ষতার নীতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার নীতির সমালোচনা করেছিল এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পক্ষপাতি ছিল। স্বতন্ত্র দল অনেক আঞ্চলিক দল ও বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সাথে একীভূত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তি অর্জন করে। এই দলটি জমিদার ও রাজন্যবর্গকে আকর্ষিত করেছিল। কারণ ভূমি সংস্কার আইনের হুমকির সম্মুখীন হয়ে তারা তাদের জমি ও প্রতিপত্তি বজায় রাখতে চেয়েছিল। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণি যারা জাতীয়করণ ও লাইসেন্সিং বা অনুমতিপত্র নীতির বিরোধী ছিলেন তারাও দলটির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। তবে সংকীর্ণ সামাজিক ভিত্তি এবং সক্রিয় দলীয় সদস্যের অভাবের কারণে শক্তিশালী সাংগঠনিক রূপ নিতে দলটি ব্যর্থ হয়।

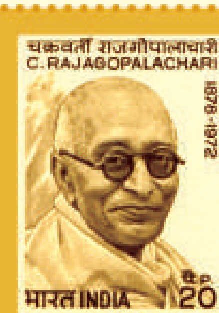

সি. রাজাগোপালাচারী (১৮৭৮-১৯৭২) : কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা এবং সাহিত্যিক; মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী; গণপরিষদের সদস্য; ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে প্রথম ভারতীয় (১৯৪৮-১৯৫০); কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রী; পরবর্তীতে মাদ্রাজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী; ভারতরত্ন পুরস্কারের প্রথম প্রাপক; স্বতন্ত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৫৯)।

".........সরকার বা কংগ্রেসে আমার উপস্থিতির চেয়ে ট্রেন্ডনের নির্বাচনকে (কংগ্রেস সদস্যদের দ্বারা) বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে .... কংগ্রেস এবং সরকার উভয়ক্ষেত্রেই আমি/আমার উপযোগিতা বিলিয়ে দিয়েছি।"

জওহরলাল নেহরু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে টেন্ডন-এর নির্বাচনের পরে রাজাজির কাছে একটি চিঠিতে লেখা তাঁর বক্তব্য।

হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। এই দলগুলো এমন নেতৃবৃন্দ প্রস্তুত করেছিল যারা আমাদের দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

শুরুর বছরগুলোতে কংগ্রেস এবং বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল। স্বাধীনতা ঘোষণার এবং প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে যে অন্তবর্তীকালীন সরকার দেশ শাসন করেছিল, তাতে ড. আম্বেদকর ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো বিরোধী নেতারাও মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জওহরলাল নেহরু প্রায়শই সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা উল্লেখ করতেন এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো সমাজতান্ত্রিক নেতাদের তাঁর সরকারে যোগ দেওয়ার সাথে এই প্রকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা দলীয় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে হ্রাস পেতে থাকে।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির এই প্রথম পর্বটি ছিল অত্যন্ত স্বতন্ত্র। জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র ছিল সার্বজনীন এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কংগ্রেস দল। এর ফলে কংগ্রেস দল বিভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী এবং তাদের স্বার্থকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল যা কংগ্রেস দলকে বিস্তৃত সামাজিক ভিত্তিমূলক এবং বিচারধারাগত দিক থেকে একটি বৃহত্তর জোট হিসেবে গড়ে তুলে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আর এজন্যই

১৯৪৮ সালে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর গভর্নর জেনারেলের পদে শপথ গ্রহণের পর নেহরুর মন্ত্রিসভা। বা দিক থেকে ডান দিকে বসে থাকা : রফি আহমেদ খিদওয়াই, বলদেব সিং, মৌলানা আজাদ, প্রধানমন্ত্রী জওহর নেহরু, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজকুমারী অমৃত কৌর, জন মাথাই এবং জগজীবনরাম। বাদিক থেকে ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকা : শ্রী গডগিল, শ্রী নিয়োগী, ড. আম্বেদকর, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোলাপাস্বামী আয়েঙ্গার এবং শ্রী জয়রামদাস দৌলতরায়।

বিহারের একটি গ্রামে দলীয় প্রতিযোগিতা

(Party competition in a Bihar village)

যখন দুটি মহিষের লড়াই হয়, তখন তাদের নীচের ঘাসগুলো পিষে যায়। কংগ্রেস এবং সমাজতান্ত্রিক দল একে অপরের সাথে লড়াই করছিল। দু'দলই নতুন সদস্য চাইছিল। দরিদ্র লোকেরা এই দু'দলের জাতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল!

"না, দরিদ্র মানুষকে পিষ্ট করা হবে না, আসলে তারা উপকৃত হবে", কারোর উত্তর এরকম ছিল। এক দলের দ্বারা কোন কাজ সম্পন্ন হয় না, দু'দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জনসাধারণ উপকৃত হয় ....."!

সমাজতান্ত্রিক দলের সভায় খবর সাঁওতালদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হাসপাতাল খোলার সংবাদটি তাদের উপর খুব একটা প্রভাব ফেলেনি— তারা কখনো মারামারি ও ঝগড়া এবং গ্রামবাসীদের বন্ধুত্বপূর্ণ সমাবেশ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এই সভাটি ছিল জমির কৃষকদের জন্য..... "এ জমি কার অন্তর্গত? কৃষকদের! যে বীজ বপন করবে সে ফসল কাটবে! যে কাজ করবে সে খাবে, কি হতে পারেনা! কালিচরণের বক্তৃতা....

কংগ্রেস দলের জেলা কার্যালয়েও অশান্তি হচ্ছিল। তারা দলের সভাপতি নির্বাচন করতে চলেছিল। চারজন প্রার্থী ছিলেন। দু'জন ছিলেন প্রকৃত প্রার্থী এবং দু'জন সাজানো প্রার্থী। এটি রাজপুত্র এবং ভূমিহারাদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা ছিল। উভয় বর্ণের ধনী ব্যবসায়ী এবং জমিদারগণ তাদের মোটর গাড়িতে করে জেলায় ঘুরে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন পরস্পরের মধ্যে দোষারোপ দেওয়ার পালা চলছিল। কাটিহার সুতি মিলের মালিক শেঠ ভূমিহার দলের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন এবং ফারবিগাং জুট মিলের মালিক রাজপুতদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন..... তাদের চারপাশে যে টাকার ছড়াছড়ি হচ্ছে তা তোমাদের দেখা উচিত।

ফনিশ্বর নাথ রেণুর উপন্যাস "মাইলা আচল" থেকে অনুবাদিত অংশবিশেষ। উপন্যাসটি স্বাধীনতার পরের বছরগুলোতে উত্তর-পূর্ব বিহারের পুর্ণিয়া জেলার পটভূমিতে রচিত হয়েছে।

কংগ্রেস অন্য দল থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। শাসন ক্ষমতা লাভ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি এবং স্বার্থসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা যখন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে শুরু করলো তখন অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্ব বাড়াতে থাকে। এভাবেই লক্ষ করা যায় যে কংগ্রেসের আধিপত্য দেশের রাজনীতিতে শুধুমাত্র প্রথম পর্বেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই বইয়ের পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেশের রাজনীতির অন্যান্য পর্বগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

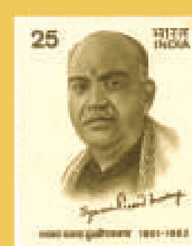

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি (১৯০১-১৯৫৩) : হিন্দু মহাসভার নেতা; ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা; স্বাধীনতার পর নেহরুর প্রথম মন্ত্রিসভার মন্ত্রী; পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে মতভেদের কারণে ১৯৫০ সালে পদত্যাগ; গণপরিষদের সদস্য এবং পরবর্তীতে লোকসভার সদস্য; জম্মু ও কাশ্মীরে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের বিরোধী; কাশ্মীর নীতির উপর জনসংঘের বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সময় গ্রেপ্তার; আটক অবস্থায় মৃত্যু।

অনুশীলনী

1. শূন্যস্থান পূরণের জন্য সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো।

   (a) ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন একসঙ্গে হয়েছিল লোকসভা এবং ......। (ভারতের রাষ্ট্রপতি / রাজ্য বিধানসভা সমূহ / রাজ্যসভা / প্রধানমন্ত্রী

   (b) প্রথম লোকসভা নির্বাচনে যে দল দ্বিতীয় বৃহত্তর আসনে জয়লাভ করেছিল সেটি ছিল ...... (প্রজা সোসালিস্ট পার্টি / ভারতীয় জনসংঘ / ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি / ভারতীয় জনতা পার্টি।

   (c) স্বতন্ত্র দলের আদর্শের অন্যতম মূলনীতি ছিল .....
   (শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ / রাজন্যশাসিত রাজ্যের রক্ষা / রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত অর্থব্যবস্থা / যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাজ্যের স্বায়ত্ত শাসন)

2. 'ক' তালিকাভুক্ত নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 'খ' তালিকাভুক্ত দলগুলোর সাথে মিলাও।

ক-তালিকা	**খ-তালিকা**
(a) এস. এ. ডাঙ্গা	i. ভারতীয় জনসংঘ
(b) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	ii. স্বতন্ত্র দল
(c) মিনু মাসানী	iii. সোসালিস্ট পার্টি
(d) অশোক মেহেতা	iv. কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া

3. একদলীয় আধিপত্য সম্পর্কিত চারটি বক্তব্য নীচে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি বক্তব্যকে সত্য অথবা মিথ্যা হিসেবে চিহ্নিত করো।

   (a) বিকল্প হিসেবে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি একদলীয় আধিপত্যের কারণ।

   (b) দুর্বল জনমতের কারণে একদলীয় আধিপত্য দেখা যায়।

   (c) একদলীয় আধিপত্য দেশের ঔপনিবেশিক অতীতের সঙ্গে যুক্ত।

   (d) একদলীয় আধিপত্য কোন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুপস্থিতিকে প্রতিফলিত করে।

4. প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পরে যদি ভারতীয় জনসংঘ বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সরকার গঠন করত, তবে সরকারের নীতিগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন হতো? উভয় দলের দ্বারা গৃহীত নীতির মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

5. কোন অর্থে কংগ্রেস একটি মতাদর্শগত জোট ছিল? কংগ্রেস দলের বিভিন্ন বিচারধারাগত বিষয়গুলো উল্লেখ করো।

6. 'একদলীয় আধিপত্যবাদী ব্যবস্থার' বিস্তার কি ভারতীয় রাজনীতির গণতান্ত্রিক স্বরূপকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছিল?

7. সোসালিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো। একইভাবে ভারতীয় জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির মধ্যে তিনটি পার্থক্যের উল্লেখ করো।

8. একদলীয় আধিপত্যের শাসনের ভিত্তিতে মেক্সিকো এবং ভারতের মধ্যে প্রধান পার্থক্যকারী বিষয়টি কি ছিল?

অনুশীলনী

9. ভারতের একটি রাজনৈতিক মানচিত্র নাও (রাজ্যের সীমানা সহ) এবং চিহ্নিত করো :

(a) দুটি রাজ্য যেখানে কংগ্রেস ১৯৪২-৬৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলনা।

(b) দুটি রাজ্য যেখানে কংগ্রেস ১৯৫২-৬৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল।

10. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

“কংগ্রেসের সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব প্যাটেল, কংগ্রেসকে অন্যান্য রাজনৈতিক গোষ্ঠী থেকে বিমুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং এটিকে সম্মিলিত এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ রাজনৈতিক দলে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তিনি ..... কংগ্রেসকে তার সর্বাত্মক চরিত্র থেকে দূরে সরিয়ে শৃঙ্খলাবন্ধ কর্মকর্তাদের একটি সংঘবন্ধ দলে পরিণত করার চেষ্টা করেন। ‘বাস্তববাদী হওয়ায় তিনি উপলব্ধির থেকে শৃঙ্খলার উপর বেশি নজর দিয়েছিলেন। গান্ধি “আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার” বিষয়ে খুব আবেগপ্রবণ দৃষ্টিবাদী গ্রহণ করার সময় একক মতাদর্শ এবং কঠোর শৃঙ্খলা নিয়ে কংগ্রেসকে একটি কঠোর রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করার প্যাটেলের ধারণাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। এই ভূমিকাকে কংগ্রেস পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে।”

— রাজনী কোঠারি

(a) লেখক কেন মনে করেন যে কংগ্রেসকে একটি সমন্বিত এবং সুশৃঙ্খল দল হওয়া উচিত নয়?

(b) স্বাধীনতার পর কংগ্রেস দলের সক্রিয় উদারবাদী ও সর্বগ্রাহী ভূমিকার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

(c) লেখক কেন বলেছিলেন যে কংগ্রেসের ভবিষ্যত সম্পর্কে গান্ধিজির দৃষ্টিভঙ্গি আবেগপ্রবণ ছিল?

চলো একসাথে করি

১৯৫২ সাল থেকে তোমাদের রাজ্যের যতগুলো নির্বাচন এবং সরকার গঠন হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করো। তালিকায় নিম্নলিখিত শিরোনামযুক্ত কলাম রাখতে পারো : নির্বাচনের বছর বিজয়ী দলের নাম, ক্ষমতাসীন দল বা দলগুলির নাম, মুখ্যমন্ত্রীর নাম ।

১৯৫০ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত সময়ে সংগঠিত পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতীক হিসাবে এই ডাক টিকিটগুলোকে প্রকাশ করা হয়েছে। বাম থেকে ডানে, উপর থেকে নীচে : দামোদর উপত্যকা, ভাঁকরা বাঁধ, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভস, গৌহাটি শোধনাকার, ট্রাক্টর, সিন্দ্রি, সার, ইলেকট্রিক ট্রেন, গম বিপ্লব, ইরাকুঁদ বাঁধ, হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্‌ট কারখানা।

এই অধ্যায়ে(In this chapter)...

বিগত দুটি অধ্যায়ে আমরা সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং জাতি নির্মাণের সমস্যাগুলো আমাদের দেশের স্থপতিগণ কীভাবে মোকাবিলা করেছেন— সে সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যায়ন করেছি। চলো এখন আমরা তৃতীয় সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করি। এই সমস্যাটি হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন যা সকলের কল্যাণে অপরিহার্য। প্রথম দুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে আমাদের স্থপতিগণ স্বতন্ত্র এবং কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করেছিলেন। এক্ষেত্রে সমস্যাটি যথেষ্ট জটিল এবং স্থায়িত্বশীল, ফলে সফলতা ছিল সীমিত।

এই অধ্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক বিকল্পগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

- উন্নয়ন সম্পর্কিত বিতর্ক ও বিকল্পগুলো কী ছিল?
- স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে আমাদের স্থপতিগণ কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন? এবং কেন?
- উন্নয়নের স্বার্থে গৃহীত কৌশলের সফলতা ও সীমাবদ্ধতা সমূহ কী ছিল?
- পরবর্তী সময়ে উন্নয়নের এই কৌশলগুলো কেন পরিত্যাগ করা হয়েছিল?

পরিকল্পিত উন্নয়নের রাজনীতি(Politics of Planned Development)

অধ্যায় 3

বিশ্বজুড়ে ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলে উড়িষ্যা পুঁজি বিনিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থলে পরিণত হয়, কারণ এখানে দেশের সবচেয়ে বৃহৎ অব্যবহৃত আকরিক লোহার মজুত রয়েছে। রাজ্য সরকার আকরিক লোহার এই ধরনের অভূতপূর্ব চাহিদার সুযোগ নিতে সচেস্ট হয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ইস্পাত প্রস্তুতকারকদের সাথে মৌ (MoU) চুক্তি স্বাক্ষর করে। সরকার বিশ্বাস করে যে এই উদ্যোগের ফলে দেশে প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগ ও প্রচুর পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। রাজ্যের বেশ কিছু অনুন্নত ও উপজাতি বসতিপূর্ণ জেলাগুলোতে আকরিক লৌহ সম্পদের মজুত বিদ্যমান। উপজাতি জনগোষ্ঠী আশঙ্কা প্রকাশ করে যে এই এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপিত হলে তারা বাস্তুচ্যুত হবে এবং এতে তাদের প্রথাগত জীবন জীবিকায় মারাত্মক প্রভাব পরবে। পরিবেশবিদ্‌রাও এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পরে যে খনন এবং শিল্পায়ন এই অঞ্চলের পরিবেশকে দূষিত করে তুলবে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে যে, এই অঞ্চলে শিল্প স্থাপিত না হলে তা আমাদের দেশের বিনিয়োগ ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এই বিষয়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন স্বার্থ সমূহকে তুমি কি চিহ্নিত করতে পারো? সংঘর্ষের মূল বিন্দুগুলো কী? এখানে কি সংঘর্ষের সমষ্টিগত কোন বিন্দু রয়েছে, যার উপরে প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সহমতে উপনীত হতে পারে? এই সমস্যাটি কি এমনভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে যা সকলের স্বার্থকে সন্তুষ্ট করবে? যখনই তুমি এই প্রশ্নগুলো করবে তখন আরো কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। উড়িষ্যায় কি ধরনের উন্নয়ন প্রয়োজন? বস্তুত কাদের প্রয়োজনকে উড়িষ্যার প্রয়োজন বলে গণ্য করা হবে?

উড়িষ্যায় পেস্কো (POSCO) প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে গ্রামীণ জনগণের প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভুবনেশ্বর : জগৎসিংপুর জেলায় প্রস্তাবিত পোস্কো-ইন্ডিয়া (**POSCO-India**) ইস্পাত কারখানার কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণ গত বৃহস্পতিবার কোরিয়ান কোম্পানির কার্যালয়ের বাইরে একটি প্রতিবাদমূলক ধরনার আয়োজন করে। প্রতিবাদী জনগণ উড়িষ্যা সরকার এবং কোম্পানির মধ্যে এক বছর আগে সাক্ষরিত মৌ চুক্তি প্রত্যাহারের দাবি জানাতে থাকে।

ধিঙ্কিয়া, নোয়াগাঁও, গাদাকুজঙ্গা ইত্যাদি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আসা ১০০ জনেরও বেশি নারী পুরুষ কোম্পানির কার্যালয়ের অভ্যন্তরে জোড়পূর্বক প্রবেশের চেষ্টা করে কিন্তু পুলিশি বাঁধার মুখে তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রতিবাদীরা এই বলে লাগাতার শ্লোগান দিতে থাকে যে আমাদের জীবন জীবিকার বিনিময়ে কোম্পানিকে এই এলাকায় কারখানা স্থাপন করতে দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্রীয় যুব সংগঠন এবং নবনির্মাণ সমিতি নামক দুটি সংস্থার দ্বারা এই প্রতিবাদ ধরনার আয়োজন করা হয়েছিল।

The Hindu, 23 June 2006

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা (Political contestation)

কোন একজন বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে সক্ষম হবে না। এই ধরনের সমস্যার সমাধানজনিত একটি সিদ্ধান্ত কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করলেও তা অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যাবে, বর্তমান প্রজন্মের স্বার্থ সুরক্ষা করলেও ভবিষ্যত প্রজন্মকে বঞ্চিত করবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের সিদ্ধান্ত জনগণকেই নিতে হবে কিংবা জনগণের দ্বারাই অনুমোদিত হতে হবে। যদিও এ ক্ষেত্রে খননকার্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, পরিবেশ বিশারদ কিংবা অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে, তবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক নেতাদেরকেই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যাহতি পরে আমাদের দেশকেও এই ধরনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে হয়েছে। এর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই ছিল বাকি সিদ্ধান্তগুলোর তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে এসব সিদ্ধান্তের সবগুলোই সমষ্টিগতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য নেওয়া হয়েছিল। প্রায় সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে

বামপন্থী কিংবা ডানপন্থী কী ?

বেশিরভাগ রাষ্ট্রের রাজনীতিতেই বিদ্যমান বাম কিংবা ডানপন্থী মতাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিংবা গোষ্ঠী সম্পর্কে তোমরা হয়তো জেনে থাকবে। এই শব্দগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীসমূহকে সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক বন্টন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে থাকে। বামপন্থী বলতে সাধারণত তাদেরকে বোঝানো হয় যারা গরিব ও নীপিড়িত জনগণের স্বপক্ষ অবলম্বন করে এবং তাদের উন্নয়নের স্বার্থে প্রণীত সরকারি নীতিমালার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। আবার ডানপন্থী বলতে ওই সকল লোকদের বোঝানো হয় যারা বিশ্বাস করে যে মুক্ত প্রতিযোগিতা ও বাজার অর্থনীতিই কেবলমাত্র উন্নয়ন ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে পারে, সুতরাং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ মোটেই উচিত নয়।

তুমি কি বলতে পারো ১৯৬০ এর দশকে কোন দলগুলো বামপন্থী আর কোনগুলো ডানপন্থী ছিল ? ওই সময়ের কংগ্রেসকে কোন দলে ফেলবে ?

ভারতের উন্নয়ন বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়। আরেকটি ব্যাপারেও সকলে একমত ছিল যে উন্নয়নের বিষয়টি শুধুমাত্র ব্যবসায়ী, শিল্পপতি কিংবা কৃষকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না, বরং সরকারকে এ বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সরকারের কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত সে ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে। সমগ্র দেশের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান কি অপরিহার্য ? কিছু শিল্প এবং ব্যবসা সরকারের কি নিজেই পরিচালনা করা উচিত ? অর্থনৈতিক বিকাশের উপকরণগুলো যদি ভিন্ন হয় তাহলে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোকে কীভাবে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ?

এই ধরনের প্রতিটি প্রশ্নের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু থেকেই সক্রিয় এবং এখনো তা ধারাবাহিক। প্রতিটি সিদ্ধান্তেরও রাজনৈতিক প্রভাব থাকে। এই প্রশ্নগুলো রাজনৈতিক বিবেচনার অধীন এবং এ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে মত বিনিময় এবং সাধারণ জনগণের সম্মতির প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্যই ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ হিসাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অধ্যায়ন করা আমাদের জন্য একান্ত জরুরি।

উন্নয়নের ধারণাসমূহ (Ideas of development)

প্রায়শই এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উন্নয়নের মৌলিক ধারণার সাথে যুক্ত থাকে। উড়িষ্যার উদাহরণ থেকে এটা পরিষ্কার যে সকল পক্ষই আসলে উন্নয়ন চায় না এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের কাছে 'উন্নয়নের' অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন– ইস্পাত কারখানা স্থাপনে আগ্রহী শিল্পপতি, ইস্পাতের শহুরে গ্রাহক এবং ওই এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনগণ ইত্যাদি। সুতরাং উন্নয়ন সংক্রান্ত যে-কোনো আলোচনাই পরস্পর বিরোধী, সংঘর্ষপূর্ণ এবং বিতর্কিত হতে পারে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দশকে উন্নয়ন সম্পর্কিত এই প্রশ্নটি নিয়ে বহু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং পরবর্তীতে এবং এখনো উন্নয়নের সাধারণ আদর্শ হিসাবে 'পশ্চিমা' রূপরেখাকে বেছে নেওয়া হয়। তখন উন্নয়নের অর্থ ছিল আরো 'আধুনিক' হওয়া এবং আধুনিক হওয়ার অর্থ ছিল পশ্চিমা শিল্পোন্নত দেশগুলোর স্তরে নিজেদেরকে উন্নত করা। এভাবেই সাধারণ জনগণ এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা চিন্তাভাবনা করতো। এটা বিশ্বাস করা হতো যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই পশ্চিমাদের অনুকরণে আধুনিকীকরণের পথে হাঁটবে। এই অনুকরণের ফলে প্রথাগত সামাজিক কাঠামো ভেঙে পরে, পাশাপাশি পুঁজিবাদ এবং উদারনীতিবাদের আগমন ঘটে। তখন আধুনিকীকরণ বিষয়টি অর্থনৈতিক বিকাশ, বস্তুবাদী প্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সাথে যুক্ত ছিল। উন্নয়নের এই ধরনের ধারণার ফলেই পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোকে অনুন্নত, উন্নয়নশীল এবং উন্নত এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে কিংবা তার সামান্য পূর্বেও ভারতে দুই ধরনের আধুনিক উন্নয়ন মডেল বিদ্যমান ছিল। এর একটি হলো উদার পুঁজিবাদী মডেল যা ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুসৃত হতো। দ্বিতীয়টি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক মডেল। তোমরা ইতোমধ্যেই এই দ্বিবিধ মতাদর্শ সম্পর্কে অধ্যায়ন করেছ এবং দুই মহাশক্তিধর দেশের মধ্যে সেই সময়ে চলমান ‘ঠান্ডা যুদ্ধ’ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছো। তখন ভারতে এমন বহু ব্যক্তিরা ছিলেন যারা সোভিয়েত উন্নয়ন মডেলের প্রতি গভীরভাবে আসক্ত। এদের মধ্যে শুধুমাত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বরং সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্যরা এবং কংগ্রেসের মধ্যে নেহরুর মতো নেতারাও ছিলেন। তবে পুঁজিবাদী আমেরিকান উন্নয়ন মডেলের অনুসারীদের সংখ্যা যথেষ্ট কম ছিল।

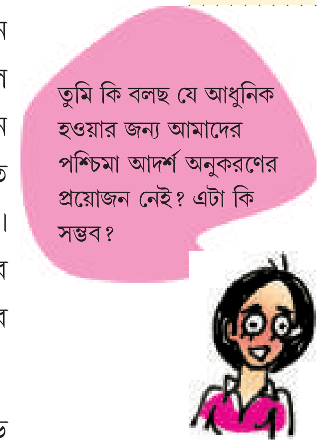

উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় একটি বৃহৎ মতৈক্য গড়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা একটি ব্যাপারে যথেষ্ট স্পষ্ট ছিলেন যে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালা উপনিবেশবাদী সরকারের বাণিজ্য ভিত্তিক সংকীর্ণ নীতি আদর্শের তুলনায় স্বতন্ত্র হবে। অধিকন্তু, এটাও স্পষ্ট ছিল যে নতুন স্বাধীন সরকারের প্রধান দায়িত্ব ও প্রাথমিক অগ্রাধিকার হবে দারিদ্র দূরীকরণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টন ব্যবস্থাকে সুসংহত করা, এনিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্কও ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তখন কারো কারোর অগ্রাধিকার ছিল শিল্পায়ন, কারো ছিল কৃষি উন্নয়ন এবং কারোর ছিল গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণ ইত্যাদি।

পরিকল্পনা (Planning)

বিভিন্ন মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি বিন্দুতে সকলেই সহমত পোষণ করে থাকেন যে উন্নয়নের দায়িত্ব শুধুমাত্র বেসরকারি হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বরং উন্নয়ন পবিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম। এই কথা সত্য যে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া হিসাবে পরিকল্পনার ধারণা ১৯৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকে বিশ্বব্যাপী যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিশ্বব্যাপী এই সহমতের পশ্চাতে

Credit: Hindustan Times

পরিকল্পনা কমিশনের ও কর্মকর্তাদের সামনে ভাষণরত নেহরু

পরিকল্পনা কমিশন বাস্তবের ভিত্তিতে এই উদ্দেশ্যগুলো অনুসরণ করছে কি না, আমি এ ব্যাপারে চিন্তিত।

দ্রুত অগ্রগামী ▶▶
নীতি আয়োগ

ভারত সরকার পরিকল্পনা কমিশনকে নীতি আয়োগ (National Institution for Transforming India) নামক নতুন একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিবর্তন করেছে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কার্যকর রয়েছে। নীতি আয়োগের উদ্দেশ্য ও গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে প্রদত্ত ওয়েব সাইটটি খুলে দেখতে পারো। http://niti.gov.in

পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission)

বিগত বছরে অধ্যায়নে ভারতীয় সংবিধানের কার্যপ্রণালী নামক পাঠ্য বইতে উল্লেখিত পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কোনো আলোচনার কথা কি তোমরা মনে আছে? আসলে এরূপ কোনো আলোচনা সেখানে ছিল না। কারণ সংবিধান দ্বারা গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন নামে কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার একটি সাধারণ সংকল্প প্রস্তাবের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে। কমিশনের দ্বারা প্রস্তাবিত সুপারিশমালা যখন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট দ্বারা অনুমোদিত হয় তখন সেগুলো কার্যকর হয়ে থাকে। যে সংকল্প প্রস্তাবের সাহায্যে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় সেখানে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিধি এইভাবে দেওয়া হয়েছে :

"সংবিধান ভারতীয় জনগণকে কিছু মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রের জন্য কিছু নির্দেশাত্মক নীতিমালার কথা ঘোষণা করেছে। এই নীতি মালাগুলোর মৌলিক ভাবনা হলো এই যে রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক কল্যাণে সচেস্ট হবে এবং এর জন্য এমন এক সুষম সমাজ নির্মাণ করবে যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় বিরাজমান থাকবে। ..... এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রকে যে বিষয়গুলো নিয়ে ক্রমাগত নির্দেশনা দিতে থাকবে সেগুলো হলো,

(a) নারী পুরুষ ভেদে নাগরিকের পর্যাপ্ত জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সম অধিকার থাকবে;

(b) সামাজিক সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে বণ্টিত হবে যাতে সকলের কল্যাণ নিশ্চিত হয়; এবং

(c) অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহ কোনো ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে না।

কারণগুলো অন্যতম ছিল ইউরোপে মহাসঙ্কটকালীন (Great Depression) সময়ের অভিজ্ঞতা, জাপান এবং জার্মানির আন্তঃযুদ্ধ পুনর্গঠন, ১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকে সকল প্রকার বিপত্তি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক বিকাশ ইত্যাদি। !

সুতরাং পরিকল্পনা কমিশন হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। বরং তার পেছনে রয়েছে মজার ইতিহাস। আমরা সাধারণ অনুধাবন করে থাকি যে শিল্পপতি কিংবা বড়ো বড়ো উদ্যোগপতিদের মতো বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগকারীরা পরিকল্পনার ধারণা পছন্দ করেন না, কারণ তারা মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পছন্দ করেন। যেখানে পুঁজির প্রবাহমানতায় সরকারের কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ থাকে না। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। ১৯৪৪ সালে কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতিরা একত্রিত হয়ে দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালুর জন্য একটি যৌথ প্রস্তাবের খসড়া উপস্থাপন করে। এটাকে বলা হয় বোম্বে পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার দাবি ছিল রাষ্ট্র যাতে শিল্প এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বৃহত্তর উদ্যোগ গ্রহণ করে। সুতরাং স্বাধীনতার পরে ডান-বাম সকলের কাছেই উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি অপরিহার্য বিকল্প হয়ে উঠে। এর ফলে স্বাধীনতার প্রাপ্তির অব্যাহতি পরেই পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এই কমিশনের চেয়ারম্যান। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠে।

শুরুর দিকে উদ্যোগসমূহ (The Early Initiatives)

সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে ভারত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদর্শ গ্রহণ করে। এই ধারণাটি খুব সহজ। ভারত সরকারের প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনায় পরবর্তী পাঁচ বছরের সকল প্রকার আয় ও ব্যায়ের হিসাব করা থাকে। এই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বাজেটকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন অপরিকল্পনা খাত (non-plan) যেখানে নিয়মমাফিক খাতে বছরভিত্তিক খরচের হিসাব থাকে।

The Hindustan Times

FIVE-YEAR PLAN PRESENTED TO PARLIAMENT

Rs 2,069 CRORES OUTLAY FOR VARIOUS PROJECTS

Blue-print For Increasing National Wealth

Discussion On Plan To Begin On Monday

DEVELOPMENT SCHEMES FOR DELHI

অন্যটি হলো (plan) খাত। সেখানে পরিকল্পনার দ্বারা নির্ধারিত খাতগুলোতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পাঁচ বছর ব্যাপী খরচ করা হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো এই যে এর মাধ্যমে সরকার উন্নয়নের বৃহত্তম লক্ষ্যকে সামনে রেখে অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করতে পারে।

"কখনো বলবে - না - মরে যাই..."

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পরবর্তীতে প্রকৃত পরিকল্পনা নথির খসড়া ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ করা হলে সমগ্র দেশে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এই খসড়া নিয়ে শিক্ষাবিদ্, সাংবাদিক, সরকারি এবং বেসরকারি কর্মচারী, শিল্পপতি, কৃষক, রাজনীতিবিদ্সহ সমাজের সকলস্তরের মানুষ দেশব্যাপী আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্ক শুরু করে। পরিকল্পনা নিয়ে এই ধরনের উদ্দীপনা ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপট চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং এর ধারাবাহিকতা ১৯৬১ সালের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত কোন না কোনভাবে টিকে থাকে। নিয়ম অনুযায়ী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৬৬ সালে শুরু হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। একি সময়ে পরিকল্পনা নিয়ে উত্থিত উদ্দীপনা যথেষ্ট কমে আসে এবং অধিকন্তু ভারত ভয়ানক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। সরকার ওই মুহূর্তে প্লেন হলিডে (plan holiday) ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদিও এসব পরিকল্পনার পদ্ধতি ও অগ্রাধিকার নিয়ে নানাহ সমালোচনা শুরু হয়; তারপরেও বলা যায় যে ওই সময়েই ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

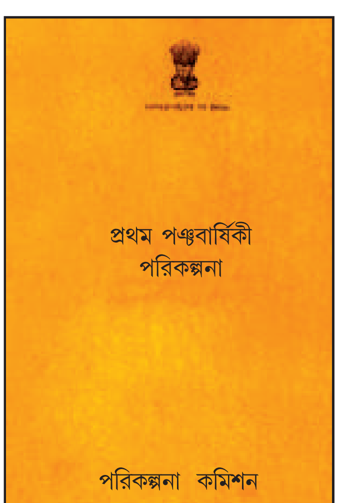

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নথিপত্র

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The First Five Year Plan)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫১-১৯৫৬) মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্রতার শৃঙ্খল থেকে দেশের অর্থনীতিকে মুক্ত করা। এই পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত তরুণ অর্থনীতিবিদ্ কে.এন.রাজ বলেন যে, প্রথম দু-দশকে ভারতকে 'মন্থর অথচ দ্রুত গতিতে' এগিয়ে যেতে হবে। কারণ উন্নয়নের গতিতে অতি ক্ষিপ্রতা গণতন্ত্রকে বিপদে ফেলতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি, বাঁধ নির্মাণ এবং সেচ ইত্যাদি খাতকে অগ্রাধিকার প্রাদন করা হয়েছিল। দেশ বিভাগের কারণে কৃষিক্ষেত্র ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ

হয়। ফলে এই ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেওয়া খুব জরুরি ছিল। ভাকড়া নাঙ্গাল বাঁধসহ বিভিন্ন বৃহৎ প্রকল্পগুলোতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন গবেষণার দ্বারা চিহ্নিত করতে পেরেছিল যে দেশের অসম ভূমি বন্টন ব্যবস্থাই কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা। সুতরাং এই মৌলিক বাঁধা দূর করে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে পরিকল্পনা কমিশন ভূমি সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেয়।

পরিকল্পনাকারীদের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং এই লক্ষ্য তখনি অর্জন করা সম্ভব হবে যখন নাগরিকরা ব্যয়ের তুলনায় বেশি সঞ্চয় করবে। যেহেতু ১৯৫০ এর দশকে খরচের মৌলিক স্তর ছিল অনেক কম সুতরাং, এই পরিমাণকে আরও কম করা সম্ভব ছিল না। তাই পরিকল্পনাকারীরা সঞ্চয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এটাও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য কাজ ছিল কারণ সেই সময়ে দেশের মোট পুঁজির পরিমাণ নিয়োগযোগ্য বা চাকুরিযোগ্য জনসংখ্যার তুলনায় কম ছিল। তারপরেও পরিকল্পনার প্রথমধাপ থেকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত সময়কালে জনগণের সঞ্চয় বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে প্রথম পরিকল্পনার শুবুর দিকে সঞ্চয়ের এই বৃদ্ধি প্রত্যাশার তুলনায় কমই ছিল। আবার পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৬০ এর দশকের শুবু থেকে ১৯৭০ দশকের শুবু পর্যন্ত দেশব্যাপী সঞ্চয়ের হার লাগাতার নিচে নেমে গিয়েছিল।

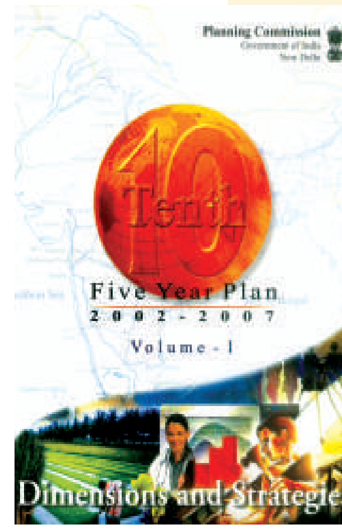

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নথিপত্র

দ্রুত শিল্পায়ন (Rapid Industrialisation)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শিল্পায়নের দিকে জোড় দেয়। পি. সি. মহালানবিশের নেতৃত্বে অর্থনীতিবিদ্‌দের একটি দল এই পরিকল্পনাটির খসড়া প্রণয়ন করে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ধীরগতিতে চলার নীতি অনুসরণ করলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি দ্রুত কাঠামোগত রূপান্তরের দিকে মনযোগী হয়, পাশাপাশি সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করার পূর্বে কংগ্রেস পার্টি মাদ্রাস শহরের অদূরে অবস্থিত আবাদি অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করে। প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে ভারতের লক্ষ্য হল "সামাজতান্ত্রিক রূপরেখার সমাজ" গঠন করা। সরকার অভ্যন্তরীণ শিল্প ও উৎপাদনের সুরক্ষার বৈদেশিক আমদানির উপর যথেষ্ট পরিমাণে শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের এই ধরনের সংরক্ষণ নীতির ফলে সরকারি এবং বেসরকারি শিল্পের দ্রুত বিকাশ হতে থাকে। এই সময়ে সঞ্চয় এবং পুঁজি বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুৎ, রেলওয়ে, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পায়নের এহেন বিকাশ ভারতের উন্নয়নের মাইল ফলক হিসাবে পরিগণিত হয়।

এক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও ছিল। এই সময় ভারত প্রযুক্তির দিক থেকে পিছিয়ে ছিল,ফলে বিশ্বের বাজার থেকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি আদানির ক্ষেত্রে ভারতকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যায় করতে হয়েছিল। তাছাড়াও যেহেতু কৃষির তুলনায় শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ বেশি পরিমাণে হতে থাকে তখন দেশে খাদ্য সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে কৃষি এবং শিল্পখাতে ভারসাম্য তৈরি করা পরিকল্পনাকারীদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় খুব বেশি একটা পৃথক ছিল না। সমালোচকদের মতে এই সময়ের পরিকল্পনা কৌশল অনেকটাই ইচ্ছাকৃতভাবে "শহরের দিকে পক্ষপাতপূর্ণ" ছিল। অন্যদের মতে কৃষির উপরে ভুল করে শিল্পের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। আবার অনেকে এটাও মনে করেন যে ভারী শিল্পের তুলনায় কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া উচিত।

পি.সি. মহলানবিশ
(১৮৯৩-১৯৭২)
তিনি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক এবং পরিসংখ্যাবিদ্; ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট (১৯৩১) এর প্রতিষ্ঠাতা; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার স্থপতি; দ্রুত শিল্পায়ন ও পরিকল্পনা রূপায়নে সরকারি উদ্যোগের সমর্থক।

প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনার বণ্টন ব্যবস্থা (শতকরা হার)

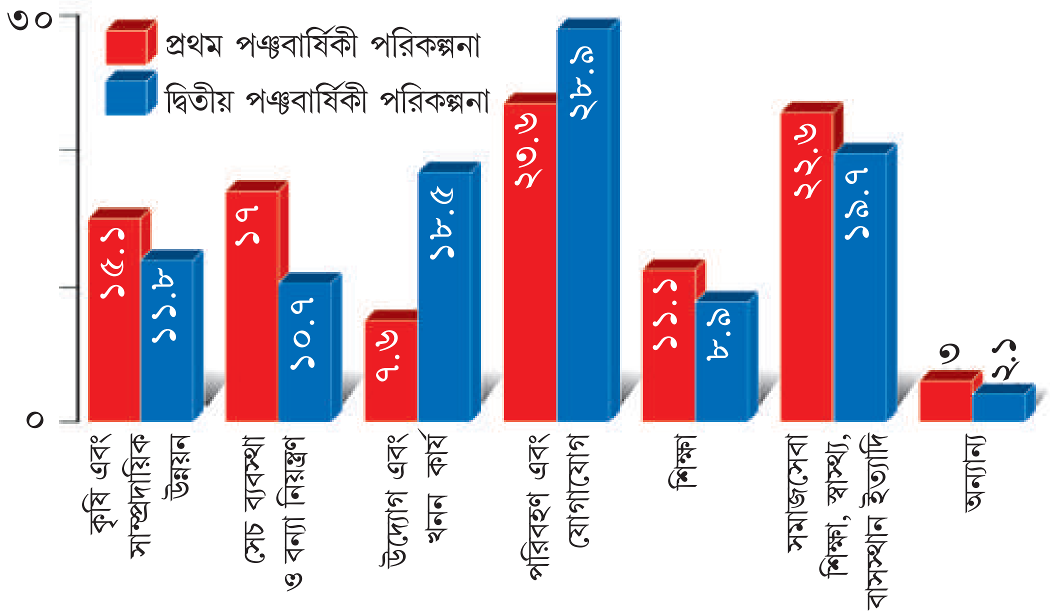

উন্নয়ন মুখ্য ক্ষেত্রসমূহ

বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা (Decentralised planning)

উন্নয়নের সকল পরিকল্পনাই কেন্দ্রীভূত হবে–এমনটা প্রয়োজন নেই, আবার এমনও নয় যে পরিকল্পনা মানে বড় শিল্প কিংবা বিশাল উদ্যোগিক বিষয়ে পরিকল্পনা। কেরালা রাজ্য "কেরালা মডেল" নামে উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি অভিনব প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। এ ধরনের পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি সংস্কার, খাদ্য সামগ্রীর কার্যকর বণ্টন, দারিদ্র দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। মাথাপিছু কম আয় এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল শিল্পায়ন সত্বেও কেরলে প্রায় ১০০ শতাংশ সাক্ষরতা, জীবনের প্রত্যাশা, শিশু এবং নারী মৃত্যুর কম হার, কম জন্মহার, চিকিৎসা পরিসেবা প্রাপ্তিতে উচ্চহার ইত্যাদি সফলতা অর্জন করতে সামর্থ হয়েছে। ১৯৮৭-১৯৯১ সাল পর্যন্ত কেলারা সরকার একটি নতুন গণতান্ত্রিক উদ্যোগ শুরু করে। এর মূল কাজ হল উন্নয়নমূলক প্রচারাভিযান ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণকে এবং স্বেচ্ছাসেবী নাগরিক সংগঠন সমূহকে সরাসরি যুক্ত করা হয়। তাছাড়া সেখানকার সরকার জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রণীত উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করবার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বুনিয়াদি বিতর্ক (Key Controversies)

পরিকল্পিত উন্নয়নের শুরুর দিকে অনুসৃত কৌশলগুলো নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে। চলো এমন দুটি প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করি যা এখনো প্রাসঙ্গিক।

কৃষি বনাম শিল্প (Agriculture versus industry)

আমরা ইতোমধ্যেই একটি বড় বিতর্কের ইঙ্গিত দিয়েছি যে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে কোন্‌টি ভারতের মতো পিছিয়ে থাকা অর্থনীতির জন্য অধিক প্রয়োজন? অনেকেই মনে করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল ছিল না। বরং দ্রুত শিল্পায়নের দিকে অধিক জোর দেওয়া হয়েছিল। ফলে দেশের কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাহত হয়। গান্ধিবাদী অর্থনীতিবিদ্ জে.সি. কুমারাপ্পা একটি বিকল্প উন্নয়ন নক্সা পেশ করেন যেখানে গ্রামীণ শিল্পায়নে বিশেষ জোড় দেওয়া হয়। চৌধুরী চরণ সিং, যিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয় লোকদল গঠন

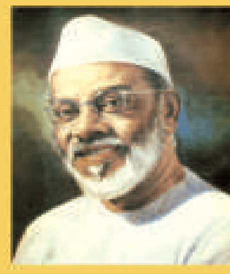

জে.সি. কুমারাপ্পা [J.C. Kumarappa] (১৮৯২-১৯৬০) এই মহান মানুষটির আসল নাম ছিল জে.সি. কর্নেলিয়াস। তিনি ছিলেন একজন অর্থনীতিবিদ এবং চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যায়ন করেন; গান্ধিজীর অনুসারী হয়ে অর্থনৈতিক নীতিমালায় গান্ধিজীর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। 'ইকোনমি অফ পারমানেন্স (Economy of Permanence) নামক বইয়ের লেখক ছিলেন তিনি। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

করেন, অত্যন্ত জোড়ালোভাবে কৃষিক্ষেত্রকে ভারতীয় পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বর্তমান পরিকল্পনা প্রক্রিয়া কৃষক এবং প্রান্তিক জনগণের প্রত্যাশায় আঘাত করে শহুরে এবং শিল্পায়নের অগ্রগতিকে উৎসাহ প্রদানে লিপ্ত হয়েছে।

অন্যান্য অনেকে মনে করেন যে, শিল্প উৎপাদনে চূড়ান্ত বৃদ্ধি ছাড়া দারিদ্রতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাদের যুক্তি হলো ভারতীয় পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই কৃষিভিত্তিক কৌশল অবলম্বন করে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়াস নিয়েছে। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জমি ও সম্পদ বণ্টন করা হয়েছে। পরিকল্পনার আওতায় কমিউনিটি উন্নয়ন নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং সেচ প্রকল্পে বিশাল পরিমাণ অর্থসম্পদ ব্যয় করা হয়েছে। তবে এত কিছুর পরেও কৃষি ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা যায়নি। এই ব্যর্থতার জন্য গৃহীত নীতিমালা দায়ী নয় বরং পরিকল্পনা কৌশলের দুর্বল বাস্তবায়নই এর জন্য দায়ী। কারণ ভূস্বামী বা জমির মালিকরা

Let's Watch a Film

পথের পাঁচালী

এই চলচ্চিত্রটি পশ্চিমবঙ্গের একটি দরিদ্র গ্রাম ও তার টিকে থাকার সংগ্রামের কাহিনি বর্ণনা করে। হরিহর এবং সর্বজয়ার কন্যা দুর্গা তার ছোট ভাই অপুকে নিয়ে কঠিন দারিদ্রতাও জীবন সংগ্রামের বিস্তৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। এই চলচ্চিত্রটি দুর্গা এবং অপুর মায়ের সংসার পরিচালনায় অফুরন্ত প্রচেষ্টার কাহিনিকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে।

পথের পাঁচালী (ছোটো পথের গান) একটি দরিদ্র পরিবারের আশা-নিরাশার কাহিনি কিশোর-কিশোরীদের গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে। গল্পের পরিশেষ, বর্ষার সময়ে দুর্গা অসুস্থ হয়ে মারা যায়। তার বাবা তখন বাড়ি থেকে অনেক দূরে। ফিরে আসার সময় হরিহর পরিবারের জন্য অনেক উপটৌকোন নিয়ে আসে, যার মধ্যে দুর্গার জন্য একটি শাড়িও ছিল.....

এই চলচ্চিত্রটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন পুরস্কারে ঘোষিত হয়। এগুলোর মধ্যে ১৯৫৫ সালের রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক ছিল অন্যতম।

সাল : ১৯৫৫
পরিচালক : সত্যজিৎ রায়
গল্পকার : বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য : সত্যজিৎ রায়
অভিনয়ে : কানু ব্যানার্জি, করুণা ব্যানার্জি, সুবীর ব্যানার্জি, উমা দাশগুপ্ত দুর্গা, চুনিবালা দেবী।

অনিয়ন্ত্রিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করত। তাছাড়া তারা আরও যুক্তি দিয়ে বলার চেষ্টা করে যে সরকার যদি কৃষিখাতে আরও বেশি বরাদ্দ রাখত তাহলেও গ্রামীণ দারিদ্রতার এ বিশাল সমস্যা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হত না।

সরকারি বনাম ক্ষেত্র (Public versus private sector)

ভারত উন্নয়নের সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত দুটি পদ্ধতির কোনটিকেই এককভাবে গ্রহণ করেনি। যেমন ভারত উন্নয়নের পুঁজিবাদী রূপরেখাকে গ্রহণ করেনি কারণ এই ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ভারত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও এককভাবে গ্রহণ করেনি। কারণ এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা ধ্বংস করা হয় এবং উৎপাদনের উপকরণ ও ফলাফল রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে ভারত উভয় ব্যবস্থার মিশ্রণেই দেশের উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলেই ভারতের অর্থনীতিকে "মিশ্র অর্থনীতি" বলা হয়। কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশিরভাগই বেসরকারির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ভারতের অর্থনীতিতে রাষ্ট্র ভারী ও বৃহৎ শিল্পগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, শিল্প কারখানার পরিকাঠামো সৃষ্টি করে, বৃহত্তর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং কৃষিক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক হস্তক্ষেপ প্রদান করে।

এধরনের মিশ্র অর্থনীতির আদর্শ ডান বাম উভয় পক্ষ থেকেই সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। সমালোচকদের যুক্তি হলো এই যে পরিকল্পনাবিদ্‌গণ বিকাশের ধারাকে গতিময় করার লক্ষ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করেনি। বিশাল সরকারি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী নেতারা এমন

Credit : Shankar, 6 may, 1956

সরকারি ক্ষেত্রকে যে সকল মন্ত্রীরা ঘিরে রেখেছেন— লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, অজিত প্রসাদ জৈন, কৈলাশ নাথ কাটজু, জগজীবন রাম, টি.টি. কৃষ্ণমাচারি, স্বর্ণ সিং, গুলজারিলাল নন্দা এবং বি.ভি. কেশকর।

সব স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের যুক্ত করেছেন যারা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লাইসেন্স সহ যাবতীয় অনুমতি সংক্রান্ত জটিল পদ্ধতি প্রণয়নের মাধ্যমে বেসরকারি ক্ষেত্রের সামনে নানাহ বাঁধা বিপত্তি সৃষ্টি করেছেন। অধিকন্তু, রাষ্ট্রীয় নীতির দ্বারা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের কারণে বেসরকারি উদ্যোগ দ্বারা উৎপাদিত পণ্য দ্রব্যের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়নি। যদিও এই বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন করা এবং পণ্যের মূল্য সস্তা রাখা, কিন্তু এর ফলে বাজারে প্রতিযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়নি। অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে বাজার ব্যবস্থায় অদক্ষতা এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে পারে।

অন্যদিকে কিছু কিছু সমালোচক মনে করেন যে সরকারি ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র তেমন কিছুই করেনি। তাদের মতে শিল্প ও স্বাস্থ্য পরিসেবা খাতে সরকার প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেনি। সরকার ওই ক্ষেত্রগুলোতেই প্রবেশের চেষ্টা করে যেখানে প্রবেশের জন্য বেসরকারি ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং, রাষ্ট্রপক্ষ এখানে বেসরকারি ক্ষেত্রকে মুনাফা অর্জনে সহায়তা করেছে। প্রকৃত দরিদ্রদের সাহায্য না করে রাষ্ট্র নতুন ধরনের 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি'-র জন্ম দিয়েছিল, যারা উচ্চহারে বেতন বা মজুরি পাওয়ার সুবিধা ভোগ করলেও নিজেদের দায়বদ্ধতা অনুভব করত না। ফলে ওই সময়ে দারিদ্রতা প্রত্যাশিত রূপে হ্রাস পায়নি; তবে একই সময়ে দারিদ্রতার অনুপাত কিছুটা হ্রাস পেলেও দরিদ্র জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বৃহৎ সফলতাসমূহ (Major Outcomes)

স্বাধীন ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়, যা এই বইয়ের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে তৃতীয় উদ্দেশ্যটি সফলভাবে অর্জন করা ছিল সবচেয়ে কষ্টসাধ্য। দেশের সর্বত্র ভূমি সংস্কারের কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা তখন মুষ্টিমেয় জমিদার শ্রেণির হাতে ন্যস্ত ছিল। এই ব্যবস্থা বড়ো বড়ো শিল্পপতিদেরকে মুনাফা অর্জনে ধারাবহিকভাবে সহায়তা করেছে। ফলে দারিদ্রতা প্রত্যাশা মতো হ্রাস পায়নি। পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রাথমিক উদ্যোগসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যাশা পূরণ ও সকল নাগরিকের কল্যাণের নিমিত্তে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রথমদিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে অদক্ষতা নতুন রাজনৈতিক সমস্যার জন্ম দেয়। বৈষম্যমূলক উন্নয়ন ব্যবস্থার কারণে মুষ্টিমেয় যেসকল ব্যক্তি খুব লাভবান হয়েছিল তারা একই সময়ে রাজনীতিতেও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে। ফলে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন আরও বেশি জটিল এবং কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে।

ভিত্তি (Foundations)

প্রাথমিক পর্বের পরিকল্পনা উন্নয়নের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটি স্বীকার করে নিতে হয় যে এই সময়ে আসলে ভারতের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এই সময়কালে ভারতের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো শুরু করা হয়েছিল। এই উন্নয়নের প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে সেচ ব্যবস্থার স্বার্থে গৃহীত ভাকরা-নাঙ্গাল ও হীরাকুঁদ বাঁধ নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন। একই সময়ে সরকারি প্রচেষ্টা ও নিয়ন্ত্রণের ফলে যে সকল ভারী শিল্প গড়ে উঠে সেগুলো হলো ইস্পাত কারখানা, তেল শোধনাগার, উৎপাদন ইউনিট স্থাপন এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন ইত্যাদি। পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। সাম্প্রতিককালে বৃহৎ প্রকল্পগুলোর বহুমুখী সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তবে এটা বলা যায় যে পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠা অর্থনৈতিক বিকাশ এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ও উন্নয়ন হয়তো কখনোই সম্ভব হতো না, যদি এ ধরনের পরিকল্পিত উন্নয়নের ভিত্তি সমূহ প্রথমদিকে স্থাপিত না হতো।

গ্রামীণ পর্যায়ে সরকারি প্রচারাভিযান

"গ্রামীণ জীবনের সমস্যা ও সমাধানে মৌলিক চিত্র দেওয়াল লিখন ও দেওয়াল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই সঠিকভাবে ফুটে উঠেছিল, যেমন একটি সমস্যা ছিল এই যে ভারত একটি কৃষি নির্ভর রাষ্ট্র কিন্তু কৃষকরা নিছক খেয়ালিপনার কারণে অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করতে চায়নি। এই সমস্যাটির সমাধান হয়েছিল কৃষকদেরকে ভালো করে বোঝানো এবং আকর্ষণীয় চিত্র ও ছবির প্রদর্শনীর মাধ্যমে। ভাষণ এবং ছবির মাধ্যমে কৃষকদেরকে বোঝানো হয়েছিল যে অতিরিক্ত ফসল নিজেদের জন্য না হলেও রাষ্ট্রের জন্য যেন ফলানো হয়। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রের জন্য অধিক ফলনে কৃষকদের উৎসাহিত করার নিমিত্তে বিভিন্ন স্থানে পোস্টার বা প্রচারপত্র লাগানো হয়। বিভিন্ন আবেগমূলক বক্তৃতা ও প্রচারপত্রের যৌথ কারণে কৃষকরা দারুনভাবে প্রভাবিত হয়। এমনকি সাধারণ কৃষকরা পর্যন্ত এই প্রচারাভিযানের ভবিষ্যত কার্যকারিতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উৎসাহিত ও আবেগতাড়িত হয়ে পরে।

এরমধ্যে একটি বিজ্ঞাপন শিবপালগঞ্জ এলাকায় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এই বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একজন কৃষক মাথায় পাগড়ি, কানে দুল ও মোটা জ্যাকেট পরিধান করে কাঁচি দিয়ে গমের ফসল কাটতে ব্যস্ত। কৃষকের পেছনে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। হাস্যজ্জ্বোল মুখ দেখে মনে হয় সে খুব সুখী; তার ব্যবহার অনেকটাই কৃষি দপ্তরের আধিকারীকের মতো।

এই ছবিটির উপরে এবং নীচে হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা ছিল 'Grow More Grain' (আরো বেশি ফসল ফলাও)। কানের দুল ও মোটা জ্যাকেট পরিহিত যে কৃষক ইংরেজিতে পারদর্শী ছিল তাকে ইংরেজি শ্লোগান এবং হিন্দিতে পারদর্শী কৃষককে হিন্দি শ্লোগানের প্রচারক বলে মনে হয়েছিল। যারা এ দুটি ভাষার কোনোটিই জানত না তারা ব্যক্তির ছবি এবং হাস্যজ্জ্বোল নারীর ছবি দেখে বিজ্ঞাপনের আবেদন অনুভব করত। এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারের প্রত্যাশা ছিল এই যে যখনই কোন কৃষক এই বিজ্ঞাপনটি দেখবে তখনই তারা উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞাপনে অঙ্কিত কৃষকের মতোই অধিক ফলনে আগ্রহী হবে।"

অনুদিত এই অংশটি শ্রীলাল শুক্লার লেখা 'রাগ দরবারি" থেকে সংগৃহীত। ১৯৬০ এর দশকে উত্তরপ্রদেশের শিবপালগঞ্জ এলাকায় এই ব্যাঙ্গাধর্মী বিজ্ঞাপনটি প্রদর্শিত ছিল।

ভূমি সংস্কার (Land reforms)

এই সময়কালে কৃষিক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল ভূমি সংস্কার করা। এই ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা ছিল উপনিবেশবাদী জমিদার প্রথার বিলুপ্তি সাধন। এই সাহসী পদক্ষেপের কারণে এমন এক ধরনের শ্রেণি শৃঙ্খল থেকে কৃষিজমি দখল মুক্ত হয়– যারা কৃষি ব্যবস্থার প্রতি কখনোই আগ্রহী ছিলনা। এই পদক্ষেপের ফলে রাজনীতিতে জমিদারদের প্রভাব কমে আসে। জমির একীকরণের প্রচেষ্টাও এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছিল। জমির একীকরণ মানে হলো ছোটো ছোটো টুকরো জমিকে এক সাথে এনে সমন্বিত করে চাষ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও স্থায়িত্বশীল রূপ দেওয়া। কিন্তু ভূমি সংস্কারের অন্য দুটি উপকরণের ক্ষেত্রে তেমন কোনো সফলতা অর্জন করা যায়নি। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রণীত আইন একজন ব্যক্তি কত পরিমাণ চাষযোগ্য জমির মালিক হতে পারবে তারজন্য একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং বেশি পরিমাণ জমির মালিকরা এই ধরনের আইন পরিহার করে চলতো। অনুরূপভাবে যারা অন্যের জমিতে ভাড়াটে হিসাবে কাজ করত তাদেরকেও ইচ্ছামতো ছাঁটাই করা না যায়। তবে এই ধরনের সুরক্ষা আইন কদাচিৎভাবে কার্যকর হয়েছিল।

এই ধরনের প্রয়োজনীয় ও অর্থবহ কৃষিভিত্তিক নীতিমালা সঠিক দিশায় বাস্তবায়ন করা খুব সহজ কাজ ছিল না। গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীন জনগণ যদি এই ব্যাপারে সচেতন হতো তাহলে হয়তো ভূমি সংস্কার আইন আরও বেশি সফলতার সহিত কার্যকর করা যেতো। কিন্তু জমিদাররা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং রাজনৈতিকভাবে প্রতাপশালী। সুতরাং, ভূমি সংস্কারে সম্পর্কিত বহু প্রস্তাব হয় আইনে পরিণত

The Hindustan Times

Trying months ahead despite rain: Minister

Next crop may be normal

Opposition warned not to exploit situation

Johnson 'ordered' freeze

Australia sounded on wheat

Farm policies

Industries given new concessions

JP call for relief workers, food

Thirteen die of hunger in Bihar

Tribal areas worst hit: adivasis live on roots

খাদ্য সংকট. (Food Crisis)

১৯৬০ দশকে কৃষির অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে শুরু করে। ১৯৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকে খাদ্য শস্যের উৎপাদনের বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সামান্য উপরে ছিল। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচণ্ড খরা দেখা দেয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা জানতে পারব যে এই সময়ে দেশ দু-দুটি যুদ্ধ ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের সম্মুখীন হয়। এইসব কিছুর ফলে দেশে প্রচণ্ড খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়।

বিহার রাজ্যে খাদ্য সংকট মারাত্মকভাবে অনুভূত হয় এবং রাজ্যে দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা শুরু হয়। বিহারের সব জেলাতেই খাদ্য সংকট মারাত্মক রূপ ধারণ করে এবং নয়টি জেলা এমন ছিল যেখানে সাধারণ চাহিদার তুলনায় অর্ধেকেরও কম শস্য উৎপাদিত হয়েছিল। এই নয়টির মধ্যে পাঁচটি জেলা এমন ছিল যেখানে পূর্বের তুলনায় এক তৃতীয়াংশেরও কম শস্য উৎপাদিত হয়েছিল। প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য না পাওয়ার ফলে চতুর্দিকে অপুষ্টি ছড়িয়ে পরে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিদিন মাথাপিছু প্রাপ্ত ক্যালরি ২২০০ থেকে ১২০০ ক্যালোরিতে নেমে আসে (একজন ব্যক্তির প্রতিদিনের গড় চাহিদা হলো ২৪৫০ ক্যালোরি)। ১৯৬৭ সালে বিহারের মৃত্যুর হার ছিল ৩৪ শতাংশ যা পরবর্তী যে-কোনো বছরের তুলনায় বেশি ছিল। একই সালে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিহারে খাদ্যশস্যের বাজার মূল্য প্রায় আকাশ স্পর্শ করেছিল। পাঞ্জাবের তুলনায় বিহারে গম এবং চালের মূল্য দ্বিগুনের চেয়ে বেশি ছিল। অন্যদিকে সরকার নিয়মের "আঞ্চলিকীকরণ করে আন্তঃরাজ্য শস্য বাণিজ্য বন্ধ রেখেছিল। যার ফলে বিহারে খাদ্য শস্যের মজুত নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। এরূপ দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে সমাজের দরিদ্রতম ও প্রান্তীক জনগোষ্ঠী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরে।

এই খাদ্য সংকট দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্ম দেয়। সরকার গম আমদানি করতে ও বিদেশি অনুদান বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে পাঠানো অনুদান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং পরিকল্পনাকারীরা যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় তা হল খাদ্যশস্য উৎপাদনে যে-কোনো ভাবেই হোক স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

হয়নি অথবা আইনে পরিণত হলেও তা শুধু কাগজেই থেকে গেছে। এতে প্রমাণ হয় যে তখনকার নীতিসমূহ ছিল সমকালীন সমাজের পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। এতে এটাও প্রমাণ হয় যে উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমাজের প্রভাবশালী গোষ্ঠীই নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

সবুজ বিপ্লব (The Green Revolution)

খাদ্য সংকটকালীন সময়ে দেশ বহিরাগত চাপের কারণে শোচনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। পাশাপাশি খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল হয়ে পরে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ভারতের নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ভারতকে তার অর্থনৈতিক নীতিমালা পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ দেয়। ফলে সরকার কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে নতুন কৌশল অবলম্বন করে যাতে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করা যায়। পূর্বের নীতিমালা অনুসারে অনুন্নত অঞ্চলও সেখানকার কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা হতো কিন্তু নতুন নীতিমালা অনুযায়ী উন্নত সেচ ব্যবস্থা সম্পন্ন এলাকা ও সেখানকার দক্ষ কৃষকদের অধিক হারে সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর পেছনে যুক্তি ছিল এই যে ইতোমধ্যেই যেসব উন্নত অঞ্চল ও সেখানকার দক্ষ কৃষক উৎপাদনে যথেষ্টভাবে সামর্থ, তাদেরকে সহায়তা করা হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদনের গতি প্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং সরকার উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক এবং সেচ প্রযুক্তি ইত্যাদিতে ভতুর্কি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকার কৃষকদের এই বলেও নিশ্চিত করে যে তাদের উৎপাদিত পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা হবে। এই পরিস্থিতি ছিল 'সবুজ বিপ্লবের' সূচনা পর্ব।

আমরা এটাকে কেন গম বিপ্লব বলছি না? এবং কেন সবকিছুকে 'বিপ্লব' বলতে হবে?

ধনী কৃষক শ্রেণি ও বড়ো বড়ো জমিদারগণ সবুজ বিপ্লবের এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি লাভবান হন। সবুজ বিপ্লব মোটামোটিভাবে কৃষি বিকাশে (বিশেষ করে গম উৎপাদনে) উৎসাহ প্রদান করে এবং খাদ্য মজুতে দেশ সামান্য স্বনির্ভরতাও অর্জন করে, তবে এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিতে মেরুকরণ শুরু হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ কৃষি ব্যবস্থায় সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে, কিন্তু দেশের বাকী অংশ পিছিয়ে থাকে। সবুজ বিপ্লবের অন্য দুটি প্রভাবও ছিল, তার মধ্যে একটি হলো এই যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমিদার ও প্রান্তীক কৃষকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বামপন্থী সংগঠনগুলোকে সক্রিয় হতে সাহায্য করে। এই সংগঠনগুলো দরিদ্র ও কৃষক শ্রেণির জনগোষ্ঠীদেরকে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করতে থাকে। দ্বিতীয়ত, সবুজ বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত

চলো গবেষণা করি

শ্রীকান্তের এখনো মনে আছে যে কীভাবে তার বড়ো ভাই ন্যায্য মূল্যের দোকানে (Ration Shop) প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর মাসিক সরবরাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কী পরিমাণ সংগ্রাম করেছিল। চাল, তেল এবং কেরোসিনের জন্য শ্রীকান্তের পরিবার সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য মূল্যের দোকানের উপর নির্ভরশীল ছিল। অনেক সময় রেশন সামগ্রীর জন্য তার ভাইকে দীর্ঘ লাইনে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে দাঁড়াতে হতো। কিন্তু পরিশেষে, সে জানতে পারতে যে রেশন সামগ্রী শেষ হয়ে গেছে এবং তাকে পরে অন্য এমন কোনোদিন আসতে হবে যখন নতুন সামগ্রী দোকানে আসবে। তোমার পরিবারের বড়োদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো যে রেশন কার্ড বলতে কী বোঝায় কিংবা ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে পরিবারের কেউ কোনো প্রকারের সামগ্রী ক্রয় করেছে কী না। তোমার বাড়ি অথবা বিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত ন্যায্য মূল্যের দোকানে একদিন ভ্রমণ কর। সেখান গিয়ে যাচাই করার চেষ্টা করো যে ন্যায্য মূল্যের দোকানে বিক্রি হওয়া গম/চাল, রান্নার তেল এবং চিনির মূল্য সাধারণ বাজারের তুলনায় কতটুকু পৃথক বা ভিন্ন।

শ্বেত বিপ্লব

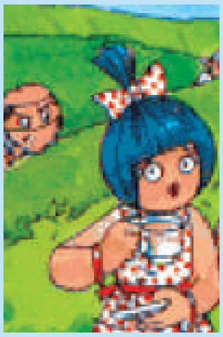

তোমরা নিশ্চই আটারলি, বাটারলি, ডেলিসাস, (ulterly butterly delicious) এই জাতীয় শব্দ ঝংকার এবং বাটার সমৃদ্ধ টোস্ট হাতে অত্যন্ত স্নেহ বৎসল একটি ছোট্ট মেয়ের ছবির সাথে পরিচিত। হ্যাঁ এটা হলো আমুলের একটি বিজ্ঞাপনের ছবি! তোমরা কি জানো আমূল দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের পেছনে রয়েছে ভারত সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদনের সফল ইতিহাস। ভার্গিস কুরিয়েন, যার ডাক নাম 'ভারতের দুগ্ধ মানব' (Milkman of India) গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক এন্ড মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড (Gujrat Co-operative Milk and Marketing Federation Ltd.) এই প্রতিষ্ঠানটিই আমুলের (Amul) শুভ সূচনা করে।

গুজরাটের আনন্দ শহরে শুরু হওয়া আমুল দুগ্ধ সমবায় আন্দোলনের সাথে ওই রাজ্যের প্রায় আড়াই মিলিয়ন দুধ উৎপাদক যুক্ত হন। দারিদ্র দূরীকরণ ও গ্রামীণ উন্নয়নের একটি অনন্য ও উপযুক্ত মডেল হিসেবে আমুল সর্বত্র বিশাল পরিচিতি লাভ করে। দেশব্যাপী আমুল পণ্যের প্রসারতার কারণে একে শ্বেত বা সাদা বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৯৭০ সালে শুরু হওয়া গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচিকে বলা হতো অপারেশন ফ্লাড (Operation Flood)। এই অপারেশনের মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিক সকল দুধ উৎপাদকদের একত্রে সংগঠিত করে সমগ্র দেশব্যাপী দুগ্ধ বলয় (Milk grid) তৈরি করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা, মধ্যস্থতাকারীদের সরিয়ে উৎপাদন ও ভোক্তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা এবং সারা বছর ধরে উৎপাদকদের নিয়মিত আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা। তবে অপারেশন ফ্লাড দুগ্ধ সম্পর্কিত কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ শুধু ছিল না। দারিদ্র দূরীকরণ, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং প্রান্তীক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করাও এর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেশব্যাপী এই সমবায়ের সদস্য সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে যার মধ্যে বহু নারী সদস্যও রয়েছে। তাছাড়া শুধুমাত্র নারীদের দ্বারা তৈরি দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কৃষক শ্রেণি নামে নতুন একটি শ্রেণিরও সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণির সদস্য কৃষকগণ মাঝারি পরিমাপের জমির মালিক ছিলেন। বিপ্লবের ফলে এই শ্রেণি দারুণভাবে উপকৃত হয় এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হয়ে উঠে।

পরবর্তী ঘটনাপঞ্জি (Later developments)

১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে ভারতের উন্নয়নের ইতিহাসে নতুন মোড় আসে। পঞ্চম অধ্যায়ে তোমরা জানতে পারবে যে কীভাবে নেহরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস নানাহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধি তখন জনপ্রিয় নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। ভারতীয় অর্থনীতির দিক নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে আরো বেশি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তিনি সচেস্ট হন। ১৯৬৭ সাল থেকে বেসরকারি শিল্পের উপর নানাহ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। চৌদ্দটি ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয়। সরকার বেশ কতগুলো গরিবমুখী কর্মসূচি ঘোষণা করে। সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা ও আদর্শের ভিত্তিতে এই পরিবর্তনগুলো করা হয়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি এই ধরনের প্রবণতা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উত্তেজনাকর বিতর্কের সৃষ্টি করে।

তারপরেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত এ ধরনের অর্থনীতি আজীবনের জন্য স্থায়ী হয়নি। পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও এর বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে হ্রাস পায়। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত

ভারতের অর্থনীতি অত্যন্ত মন্থর গতিতে অর্থাৎ বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ৩ থেকে ৩.৫ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে গঠিত সরকার উদ্যোগ ক্ষেত্রগুলোতে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর প্রথমদিকে যে বিশ্বাস ও জনমত তৈরি হয়েছিল তাতে প্রচণ্ড ভাটা পরে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি জন সমর্থন সরে যাওয়ার কারণে নীতি প্রণয়নকারীরা ১৯৮০-র দশক থেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকা ধীরে ধীরে হ্রাস করতে শুরু করে। এই পাঠ্যপুস্তকের শেষের দিকে এ সম্পর্কিত কিছু ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো।

Credit: Shankar, "The Leap Upward", 27 August 1961

অনুশীলনী

1. বোম্বে পরিকল্পনা সম্পর্কিত নীচের কোন্ মন্তব্যটি সঠিক নয়?
   (a) এটা ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির নীল নক্সা।
   (b) এটা শিল্পের সরকারি মালিকানাকে সমর্থন করেছিল।
   (c) এটা কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী শিল্পপতিদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।
   (d) এটি পরিকল্পনার ধারণাকে জোড়ালোভাবে সমর্থন করেছিল।

2. নীচের কোন মতাদর্শটি ভারতের উন্নয়ন নীতিমালার প্রাথমিক পর্বের অংশ ছিল না?
   (a) পরিকল্পনা
   (b) উদারীকরণ
   (c) সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগ
   (d) স্বনির্ভরতা

3. ভারতের পরিকল্পনার ধারণা নেওয়া হয়েছে
   (a) বোম্বে পরিকল্পনা থেকে
   (b) সোভিয়েত শিবিরের অন্তর্গত রাষ্ট্র সমূহের অভিজ্ঞতা থেকে
   (c) গান্ধিজীর সামাজিক আদর্শ থেকে
   (d) কৃষক সংগঠনগুলোর দাবি থেকে

   i. শুধুমাত্র খ এবং ঘ
   ii. শুধুমাত্র ঘ এবং গ
   iii. শুধুমাত্র ক এবং খ
   iv. উপরের সবগুলো

অনুশীলনী

4. নীচে প্রদত্ত বিষয়গুলো মিলিয়ে দেখাও।

(a) চরণ সিং	i. শিল্পায়ন
(b) পি.সি. মহলানবীশ	ii. আঞ্চলিকীকরণ
(c) বিহারের দুর্ভিক্ষ	iii. কৃষক
(d) ভার্গিস কুরিয়েন	iv. দুগ্ধ সমবায়

5. স্বাধীনতার প্রাক্কালে উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে কী কী পার্থক্য ছিল? এর থেকে উত্থিত বিতর্কের সমাধান কি হয়েছে।

6. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বা প্রত্যাশা কি ছিল? কিভাবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রথমটি থেকে স্বতন্ত্র ছিল?

7. সবুজ বিপ্লব কী? সবুজ বিপ্লবের দুটি করে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল বর্ণনা করো?

8. দ্বিতী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে শিল্প ও কৃষির মধ্যে যে বিতর্ক সংগঠিত হয়েছিল তার প্রধান প্রধান যুক্তিসমূহ কী ছিল?

9. "ভারতীয় নীতি প্রণয়নকারীরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকাকে যে অগ্রাধিকার দিয়েছিল তা ছিল ভুল। শুরু থেকেই যদি বেসরকারি ক্ষেত্রগুলোকে অবাধে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে ভারতের উন্নতি আরো দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হতো।" এই মন্তব্যটির পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো।

10. নীচের রচনাংশটি পড়ো এবং প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

"স্বাধীনতা প্রাপ্তির শুরুর বছরগুলোতে কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরে দু-ধরনের বিপরীতমুখী প্রবণতা বিরাজমান ছিল। একদিকে জাতীয়তাবাদী দলের কার্যকরী সদস্যারা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে অর্থনীতির প্রধান উদ্যোগিক ক্ষেত্রগুলোতে সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেস্ট ছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, এতে মুষ্টিমেয় লোকের হাত থেকে সম্পদের মুক্তি হবে এবং উৎপাদনের প্রগতি আসবে। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত সরকার অর্থনীতির উদারনীতি নীতিমালা গ্রহণ করে এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিতে থাকে। তাদের বিশ্বাস ছিল উৎপাদনে গতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে এটাই ছিল উত্তম বিকল্প"—

—ফ্রানসিন ফ্রাঙ্কেল

(a) লেখক এখানে কোন ধরনের স্ববিরোধী বা বিপরীতমুখীতার কথা বলেছেন? এই ধরনের স্ববিরোধিতার রাজনৈতিক ফলাফল কি হতে পারে?

(b) যদি লেখক সঠিক হন, তাহলে কংগ্রেস কেন এ ধরনের নীতি গ্রহণ করেছিল? এটাই কি বিরোধী রাজনৈতিক দেশের চরিত্র?

(c) এটা কি প্রমাণিত হয় যে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব পরস্পর বিরোধী ছিলেন?

১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে নিউ ইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সমূহের শীর্ষ বৈঠকে উপস্থিত ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সাথে রয়েছেন ঘানার নক্রুমা, ইজিপ্টের নাসের, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্নো এবং যুগোস্লোভিয়ার মার্শাল টিটো এই পাঁচজন রাষ্ট্রনেতা হলেন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (NAM) শীর্ষ নেতৃত্ব।

এই অধ্যায়ে (In this chapter)…

এই বইটিতে এ পর্যন্ত আমরা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ঘটনাপঞ্জি ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বহিরাগত বা বৈদেশিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও আমাদের নেতৃবৃন্দ জোট নিরপেক্ষনীতি অবলম্বনের মাধ্যমে বৈদেশিক সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। এরই মধ্যে আমাদের দেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে, যার ফলে ১৯৬২, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এইসব যুদ্ধ এবং আমাদের সাধারণ বৈদেশিক সম্পর্ক দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করে।

এই অধ্যায়ে আমরা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্কের সাথে সংশিষ্ট কিছু ঘটনাবলি নিয়ে অধ্যায়ন করব। এই অধ্যায়ন বা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো :

- আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট যা আমাদের বৈদেশিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে;
- দেশের বিদেশনীতিতে অনুসৃত কার্যকরী নীতিমালাসমূহ;
- ভারতের সাথে চিন ও পাকিস্তানের সম্পর্কের বিভিন্ন ঘটনাবলি;
- ভারতের পরমাণু নীতির বিকাশ।

ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক (India's external relations)

অধ্যায় 4

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট (International Context)

একটি সমস্যাদীর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিশ্ব তখন একদিকে ভয়ানক যুদ্ধের সম্মুখীন এবং অন্যদিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও সদ্য স্বাধীন দেশগুলো পুনর্গঠনজনিত সংকটের মুখোমুখি। একই সময়ে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরিতে বিশ্ব তখন সচেষ্ট, উপনিবেশবাদের পতনের ফলে অনেকগুলো নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে এবং এসকল সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহ তাদের দেশের জনকল্যাণমূলক সরকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানাহ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যস্ত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যাহতি পরে ভারতের বিদেশনীতির উপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলোর প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয়। এই বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর পাশাপাশি ভারত নিজেও তখন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। দেশ ছাড়ার পূর্বে ব্রিটিশ সরকারও বিভিন্ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা ভারতের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেয়। যেমন দেশবিভাগজনিত এবং দারিদ্রতা দূরীকরণ সম্পর্কিত সমস্যা ইত্যাদি। এগুলো ছিল সার্বিকভাবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট যার মধ্যে একটি স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র হিসেবে ভারত বিশ্বমঞ্চে অংশগ্রহণ করা শুরু করে।

চারিদিকে যুদ্ধময় পরিস্থিতিতে নতুন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের ফলে ভারত এমনভাবে তার বিদেশিনীতি প্রণয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বিশ্বজুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের জন্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যটি রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যেভাবে একজন ব্যক্তি কিংবা একটি পরিবারের আচরণকে প্রভাবিত করে তেমনিভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও একটি রাষ্ট্রের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করে। প্রয়োজনীয় সম্পদ ও শক্তির অভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের সমস্যা সমূহকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করতে পারেনা। সুতরাং, আন্তর্জাতিকস্তরে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় তাদের লক্ষ্য ও প্রত্যাশা থাকে অনেকটা সীমিত। এ সকল দেশ তাদের প্রতিবেশী অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নের কথা বেশি বলে। অধিকন্তু, অর্থনীতি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতার কারণে তাদের বিদেশনীতি প্রায়শই উন্নত দেশগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যাহতি পরে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ ওই সকল উন্নত দেশের বিদেশনীতির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে যাদের কাছ থেকে তারা নানাহ প্রকার সহায়তা পেতো। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্ব দুটি শিবিরে স্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়ে পরে। এরমধ্যে একটি শিবির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমা দোসরদের দ্বারা প্রভাবিত হতো অন্যটি হতো তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা। তোমরা এ সম্পর্কে সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি নামক বইটিতে বিস্তরিত অধ্যয়ন করেছ। বইটিতে তোমরা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও অনেক কিছু অধ্যয়ন করেছ। তাছাড়া একই বইতে তোমরা এটাও পড়েছ যে ঠান্ডা যুদ্ধের পরিসমাপ্তি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছিল। কিন্তু ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে এবং নিজের বিদেশনীতি প্রণয়ন করা শুরু করে

> "স্বাধীনতা কীভাবে গঠিত হয়? মূলত স্বাধীনতা বৈদেশিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত হয়। এটাই স্বাধীনতার আসল পরীক্ষা। বাকি সবই হলো স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন। যখনি বৈদেশিক সম্পর্কের চাবিকাঠি অন্যের হাতে চলে যায়, যতদূর চলে যায় এবং যে বিষয়গুলো এই সম্পর্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে তখন ওই বিষয় ও সীমা পর্যন্ত আমরা পরাধীন থাকি।"
>
> ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে গণপরিষদের একটি বিতর্কে জওহরলাল নেহরু।

সাংবিধানিক নীতিমালা (The constitutinal principles)

ভারতীয় সংবিধানের ৫১ নং ধারায় আন্তর্জাতিক "শান্তি ও নিরাপত্তা সমুন্নত রাখার" ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক কিছু নীতিমালার সংস্থান রয়েছে। "নীতিমালা অনুসারে ভারত যে সকল বিষয়ে সচেষ্ট হবে—

ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সমুন্নত রাখা।

খ) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা।

গ) সংগঠিত জনগণকে একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি সমূহের দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা; এবং

ঘ) মধ্যস্থতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ নিরসনে উৎসাহিত করা।"

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী দু'দেশকে ভারত এসকল সাংবিধানিক নীতিমালা কার্যকরভাবে কতটুকু অনুসরণ করতে পেরেছে? এই অধ্যায়টি অধ্যায়নের পরে তুমি পুনরায় এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে পারো।

তখন ঠান্ডা যুদ্ধের সবেমাত্র সূত্রপাত হয় এবং বিশ্ব দুই বিপরীতমুখী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পরে। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে ভারত কি এই দুটি শিবিরের কোনো একটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল? আন্তর্জাতিক সংকট থেকে দূরত্ব বজায় রেখে ভারত কি তার স্বাধীন বিদেশনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল?

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতিমালা (The policy of non-alignment)

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ভিন্ন বা স্বতন্ত্র কোনো প্রক্রিয়া ছিল না। এটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামগুলোরই অংশ ছিল। এই আন্দোলন এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামকেও প্রভাবিত করেছিল। স্বাধীনতা পূর্বে ভারতের জাতীয়বাদী নেতৃত্ব এবং অন্যান্য উপনিবেশিক অঞ্চলের নেতৃত্বরা পরস্পরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়েছিল কারণ তাদের সামগ্রিক সংগ্রাম ছিল উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর দ্বারা সৃষ্ট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (INA) ছিল এসব পারস্পরিক যোগসূত্রতার পূর্ণ প্রকাশ যা স্বাধীনতা সংগ্রামকালে ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল।

যে-কোনো দেশের বিদেশনীতিতেই অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটে। সুতরাং যেসকল আদর্শ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুসৃত হয়েছিল সেগুলোই ভারতের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করেছে। আমরা জানি যে,ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমকালীন সময়ে ঠান্ডা যুদ্ধ যুগের সূত্রপাত হয়। এই পাঠ্য বইটির প্রথম অধ্যায়ে সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে ইতোমধ্যেই তোমরা জানতে পেরেছ যে ওই সময়কালে সমগ্র বিশ্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া নামক দুই মহাশক্তিরধর দেশের নেতৃত্বে পরিচালিত দুই বিপরীতমুখী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষের দ্বারা জর্জরিত ছিল। একই

সময়ের মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা, পরমাণু অস্ত্রের উৎপাদন, সমাজতান্ত্রিক চিন এর আবির্ভাব, উপনিবেশবাদী ব্যবস্থার সমাপ্তি ইত্যাদি ঘটনাও ঘটেছে। সুতরাং ভারতীয় নেতৃত্বকে এসব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই তার জাতীয় স্বার্থের স্বপক্ষে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হয়েছিল।

নেহরুর ভূমিকা (Nehur's Role)

জাতীয় নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলাল নেহরুর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজেই নিজ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং, ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নেহরু ভারতীয় বিদেশনীতির প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপরিসীম ভূমিকা পালন করেন। নেহরুর বিদেশ নীতির তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল— যেমন কষ্টার্জিত সার্বভৌমিকতা সংরক্ষণ করা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ খুঁজে বের করা। নেহরু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। যদিও ওই সময়ে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সামাজিক গোষ্ঠীসমূহ বিশ্বাস করতেন যে ভারতের উচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত শিবিরে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কারণ এর শিবির ছিল গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারি। ড: আম্বেদকরও এই ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিরোধী তখনকার রাজনৈতিক দলসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন করার নীতিতে বিশ্বাস করতেন। এই ভাবধারার অনুসারী দলগুলোর মধ্যে ছিল ভারতীয় জনসংঘ এবং পরবর্তীতে স্বতন্ত্র পার্টি। কিন্তু বিদেশনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নেহরু নিজের আদর্শ থেকে খুব বেশি একটা বিচ্যুত হননি।

দুই শিবির থেকে দূরত্ব (Distance from two camps)

একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বের স্বপ্ন নিয়ে যে সব প্রক্রিয়া সামনে রেখে স্বাধীন ভারতের বিদেশনীতি রচিত হয় তা ছিল জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রচার, ঠান্ডা যুদ্ধ প্রসূত সংকট হ্রাস এবং রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা পরিচালিত শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে মানব সম্পদের যোগান। তোমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারো যে কেন ভারত ঠান্ডা যুদ্ধকালীন সময়ে চলমান দুই শিবিরের কোনটিতেই যোগদান করেনি। আসলে ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা একে অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক জোট থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিল। এই বইটিতে উল্লেখিত সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি বিষয়ে অধ্যয়নকালে তোমরা জানতে পেরেছো যে ঠান্ডা যুদ্ধকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি (NATO) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ওয়ার্শো চুক্তি অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু ভারত সে সময়ে বিদেশনীতির আদর্শ দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে এবং তার প্রচারে সচেষ্ট হয়। এটা ছিল ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি কষ্টসাধ্য নীতি এবং এ ধরনের ভারসাম্যের স্থিতিশীলতা সবসময় বজায় রাখা যায়নি। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল সংক্রান্ত বিষয়ে ব্রিটেন যখন ইজিপ্ট আক্রমণ করে ভারত তখন এটাকে নব্য উপনিবেশবাদী আগ্রাসন হিসেবে আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রদান করে। কিন্তু একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন হাঙ্গোরি আক্রমণ করে ভারত তখন এর প্রতি সরকারিভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করেনি। এসব নানাহ রকমের পরিস্থিতি সত্ত্বেও ভারত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকটে সরাসরি কোনো স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করে নি। এর ফলে ভারত বিপরীতমুখী দুটি শিবির থেকেই প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে থাকত।

ভারত যখন অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে জোট নিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কে প্রচারে ব্যস্ত সে সময় পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত সামরিক জোটে যোগদান করে। অন্যদিকে আমেরিকাও ভারতের উদ্যোগে প্রচারিত স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। যার ফলে ১৯৫০-এর দশকে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে খুব একটা সুসম্পর্ক ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের ক্রমবর্ধমান

"আমাদের সাধারণ নীতি হলো ক্ষমতার রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখা এবং বিবাদমান দুই শিবিরের কোনোটিতেই যোগদান না করা। বর্তমানে বিবাদমান দুই শিবিরের একটি হল রাশিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত এবং অন্যটি হলো আমেরিকা ও ব্রিটেন দ্বারা পরিচালিত। আমাদের কাজ হলো উভয়ের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখা কিন্তু কোনোটিতেই প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করা। আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়ই পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে সন্দেহ প্রবণ এবং বাকি দেশগুলোকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে যার ফলে আমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য বজার রাখা অত্যন্ত কঠিন। কারণ তারা আমাদেরকেও সন্দেহের চোখে দেখে এই ভেবে যে আমরা বিপরীত কোনো শিবিরের সাথে যুক্ত কি না। এই সন্দেহ থেকে বাঁচা অত্যন্ত দুরূহ।"

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে কে পি এস মেননের কাছে লেখা জওহরলাল নেহরুর চিঠি।

যখন আমরা বর্তমানের তুলনায় ছিলাম নব্য স্বাধীন, দরিদ্র এবং শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন তখন কি পৃথিবীতে আমরা আরো অধিক শক্তিশালী কিংবা স্বীকৃত ছিলাম না? এটা কি অবাক হওয়ার মত নয়?

“অর্থ, সম্পদ এবং জনসম্পদ--- ক্ষমতার তিনটি মৌলিক স্তম্ভ ছাড়াই কোনো একটি দেশ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এই সভা জগতে নৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই দেশের আওয়াজ শক্তিশালী দেশগুলোতেও শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করা হয়।”

১৯৫০ সালে এডভিনা মাউন্ট ব্যাটেনকে লেখা সি রাজা গোপলাচারির একটি পত্র।

সখ্যতার কারণেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষোভ প্রকাশ করত।

বিগত অধ্যায়ে তোমরা ভারত দ্বারা গৃহীত পরিকল্পিত উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে আনতে পেরেছো। ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়ন নীতি আমদানির স্বদেশি বিকল্পকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। স্বদেশী উৎপাদনের ভিত্তি স্থাপনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধিও সীমিত থাকে। এ ধরনের উন্নয়ন কৌশল বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রকেও সীমাবদ্ধ করে তুলে।

আফ্রো এশিয়ার ঐক্য (Afro-Asian unity)

এতদ্‌সত্ত্বেও ভৌগোলিক আয়তন, অবস্থান এবং সম্ভাব্য শক্তির কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে বিশেষ করে এশিয়ার রাজনীতিতে নেহরু ভারতের ভূমিকাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলে। নেহরুর সময়কালে এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সাথে ভারতের যোগাযোগ অনেক উচ্চতায় পৌঁছে যায়। ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে নেহরু ছিলেন এশিয়ান ঐক্য ও সংহতির অন্যতম রূপকার। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাত্র পাঁচ মাস পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে নেহরুর নেতৃত্বে ভারত এশিয়ান রিলেশনস কনফারেন্স আহ্বান করেন। ১৯৪৯ সালে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠিত করার মাধ্যমে ভারত ডার্চ উপনিবেশবাদী শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে। উপনিবেশবাদী শাসন ব্যবস্থা সমাপ্তির যে-কোনো প্রক্রিয়ার প্রতি ভারত সক্রিয় ভূমিকা পালন করত এবং জাতিবাদ বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় সে সময়ে চলমান বর্ণবাদ প্রথার বিরুদ্ধেও ভারত সোচ্চার ছিল। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা বান্দুং সম্মেলন হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। এই সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। বান্দুং সম্মেলন থেকেই মূলত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের জন্ম হয়। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেলগ্রেড শহরে নির্জোট আন্দোলনের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নেহরু ছিলেন এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের অন্যতম।

চিনের সাথে শান্তি ও সংঘর্ষ (Peace and Conflict with China)

স্বাধীনতা অর্জনের পরে পাকিস্তানের সাথে খুব একটা সম্পর্ক না থাকলেও দারুণ এক বন্ধুত্বের আবহে চিনের সাথে ভারতের সম্পর্ক শুরু হয়। ১৯৪৫ সালে চিন বিপ্লবের পর যে সকল রাষ্ট্র সর্বপ্রথম সেখানকার প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে তাদের মধ্যে ভারত ছিল অন্যতম। পশ্চিমা প্রভাব থেকে বেড়িয়ে এসে নেহরু এই প্রতিবেশী দেশটির প্রতি গভীর অনুভূতি ব্যক্ত করে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা পেতে নতুন সরকারকে সাহায্য করে। নেহরুর সম্মুখে যে সমস্যাগুলো তখন প্রকট হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে ছিল চিন সম্পর্কে বল্লভভাই প্যাটেলের আশঙ্কা, যিনি মনে করতেন অদূর ভবিষ্যতে চিন-ভারত আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু নেহরু তার পরেও বিশ্বাস করতেন, এটা “প্রায় অসম্ভব” যে চিন ভারত আক্রমণ করবে। বহু সময় পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর পরিবর্তে আধা সামরিক বাহিনী চিনের সীমান্ত পাহারা দিত।

চিন এবং ভারত যৌথভাবে পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা করে, যা মূলত ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার পাঁচ প্রকার নীতি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু এবং চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ১৯৫৪ সালের ২৯শে এপ্রিল এই যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন, যা ছিল এই দুটি দেশের সুসম্পর্ককে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও দিক নির্দেশনা। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী একে অপরের দেশে রাষ্ট্রীয় সফরে গেলে বৃহত্তর অংশের জনগণ তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়।

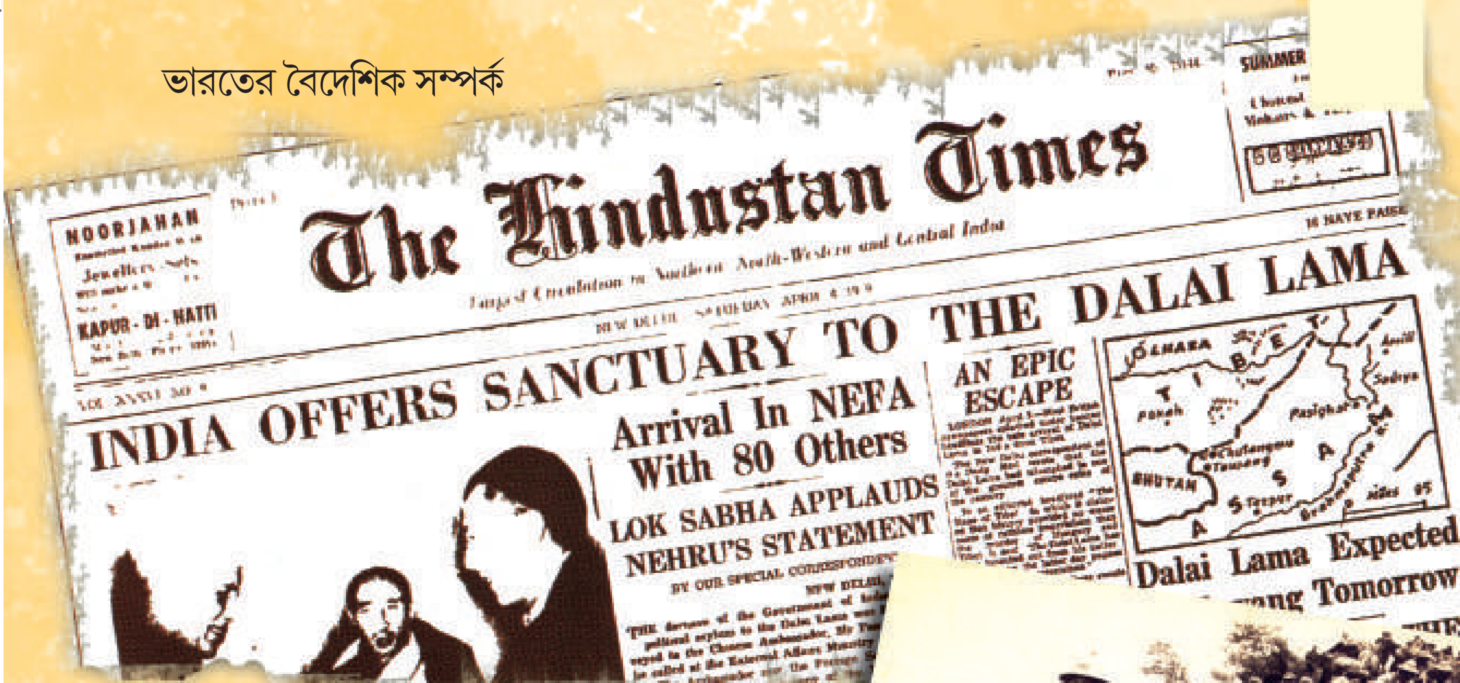
The Hindustan Times

INDIA OFFERS SANCTUARY TO THE DALAI LAMA

Arrival In NEFA With 80 Others

LOK SABHA APPLAUDS NEHRU'S STATEMENT

BY OUR SPECIAL CORRESPONDENT

AN EPIC ESCAPE

Dalai Lama Expected

দলাই লামা তার অনুগামীদের নিয়ে ভারতে প্রবেশ করছে।

Credit : Homal Vyarawalla

তিব্বত (TIBET)

তিব্বত হলো মধ্য এশিয়া অঞ্চলের একটি মালভূমি। ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চলটি ভারত ও চিনের মধ্যে চলমান উত্তেজনার অন্যতম কারণ। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে চিন এই অঞ্চলের উপর তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের দাবি করে আসছে। একই সময়ে তিব্বত একটি স্বাধীন দেশ হিসাবেও স্বীকৃত থাকে। কিন্তু ১৯৫০ সালে চিন তিব্বতের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বিশাল সংখ্যক তিব্বতী জনগণ চিনের এই ধরনের পদক্ষেপের বিরোধিতা করে। ভারত চিনকে তিব্বতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে। ১৯৫৪ সালে ভারত এবং চিনের মধ্যে স্বাক্ষরিত পঞ্চশীল চুক্তির একটি ধারায় বলা হয়েছে যে দুটি দেশই একে অপরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমিকতার প্রতি সম্মান জানাবে। চুক্তির এই ধারার মাধ্যমে ভারত মূলত তিব্বতের উপর চিনের নিয়ন্ত্রণকে এক প্রকার মেনে নিয়েছে। তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দলাই লামা ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রীয় সফরের সময় চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এর সাথে ভারতে এসেছিলেন। তিনিই তখন নেহরুকে তিব্বতের অভ্যন্তরীণ শোচনীয় পরিস্থিতির ব্যাপারে অবগত করেন। একই সাথে চিন ও ভারতকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিল যে তিব্বতের জনগণকে বৃহত্তর স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হবে যা অন্য কোনো অঞ্চল ভোগ করে না। ১৯৫৮ সালে চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিব্বতে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। চিন কাঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করে। অবস্থা আরো শোচনীয় হবে এই ভেবে দালাই লামা ১৯৫৯ সালে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন এবং সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান করে। চিন সরকার ভারতের এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বিগত পঞ্চাশ বছর যাবত বহু সংখ্যক তিব্বতী নাগরিক ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় প্রার্থনা করে। ভারতে বিশেষ করে দিল্লিতে প্রচুর পরিমাণে তিব্বতী শরণার্থী বসবাস করে। হিমাচলের ধর্মশালায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় তিব্বতী শরণার্থীরা বসবাস করে। দালাই লামাও ধর্মশালায় প্রায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯৫০ এবং ৬০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক দল এবং জনসংঘসহ বিভিন্ন ভারতীয় রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ তিব্বতের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন।

চিন তিব্বতকে স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করলেও নিজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে কিন্তু তিব্বতীরা সবসময় এই দাবির বিরোধিতা করে। তিব্বতীরা এই অঞ্চলে চিনা জনগণের ক্রমাগত আবাসন প্রক্রিয়ারও বিরোধিতা করে। তিব্বতীরা বিশ্বাস করেনা যে চিন এই অঞ্চলকে প্রয়োজনীয় স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার প্রদান করেছে বরং তারা মনে করে যে চিন তিব্বতের প্রথাগত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে চলেছে।

দ্রষ্টব্য : উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত এই মানচিত্রটিকে কখনোই ভারতের প্রমাণযোগ্য বা বৈধ বাহ্যিক সীমারেখা হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

১৯৬০ সালে ভারত এবং চিনের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। নেহরু এবং মাও সেতুং এর মধ্যেকার আলোচনাও ভেস্তে যায়।

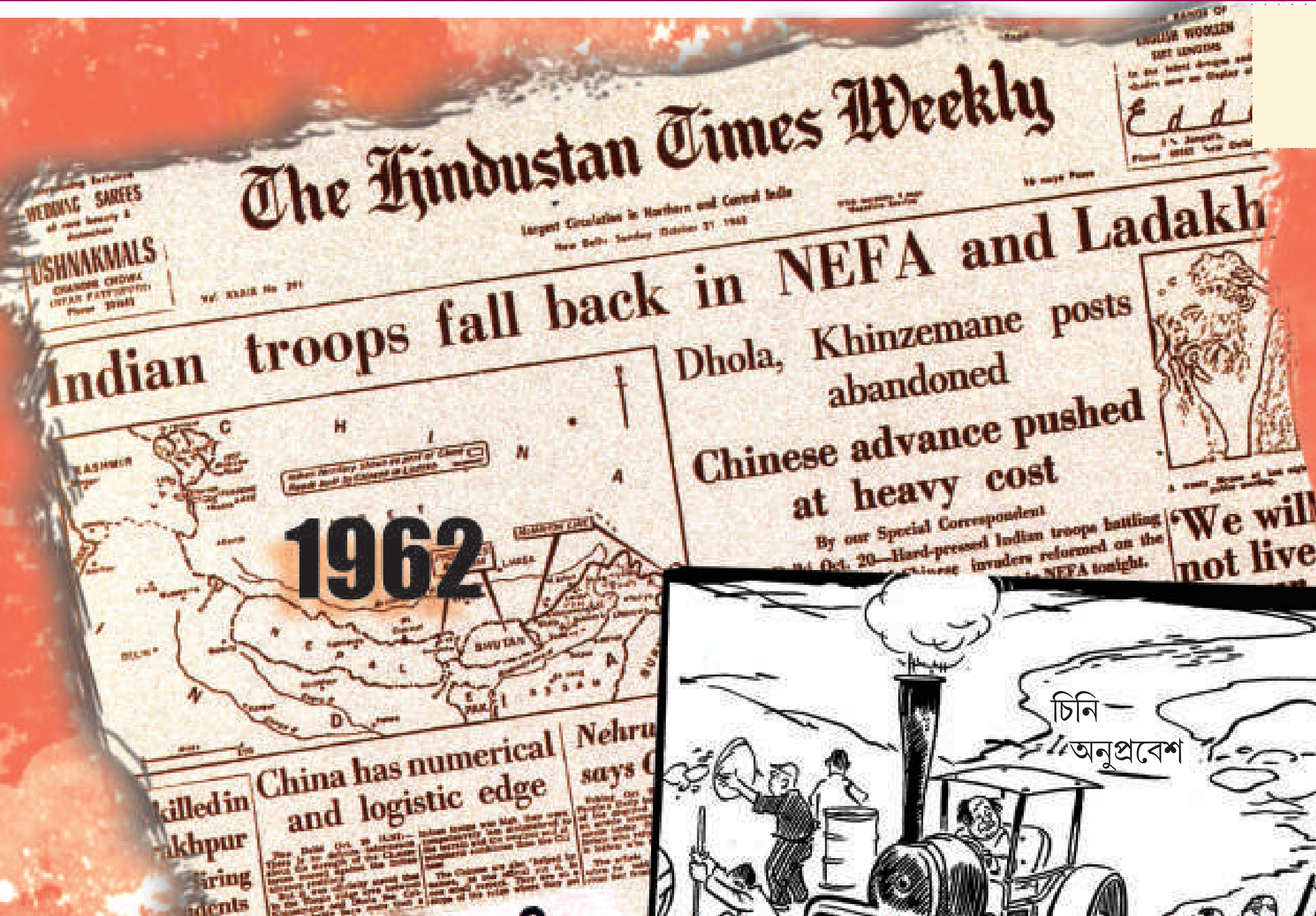

নির্মাণাধীন চিনের রোলার

ভি.কে. কৃষ্ণ মেনন (১৮৯৭- ১৯৭৪) : কূটনীতিবিদ্ এবং মন্ত্রী; ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টিতে সক্রিয়; যুক্তরাজ্যে ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে নিযুক্ত; রাজ্যসভার সদস্য এবং পরবর্তীতে লোকসভার সদস্য; ১৯৫৬ সালে ইউনিয়ন ক্যাবিনেটের সদস্য; ১৯৫৭ সাল থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী; নেহরুর খুব কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত; ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের পর পদত্যাগ করেন।

১৯৬২ সালে চিনের আগ্রাসন (The Chinese invasion, 1962)

> খোলাখুলিভাবে ..... আমার ধারণা হলো (চৌ-এন-লাই সম্পর্কে) অত্যন্ত ইতিবাচক ..... আমার বিশ্বাস চিনের প্রধানমন্ত্রী একজন বিশ্বাসযোগ্য ভালো মানুষ
>
> ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লেখা মি রাজাগোপালাচারির একটি পত্র।

দুটি ঘটনা এই সম্পর্কে চিড় ধরিয়ে দেয়। ১৯৫০ সালে তিব্বত অঞ্চলকে যুক্ত করার মাধ্যমে চিন দুই দেশের মধ্যে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক বাফার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়। প্রথমদিকে ভারত সরকার এই পদক্ষেপের সরাসরি বিরোধিতা করেনি। কিন্তু যখনি তিব্বতের অভ্যন্তরীণ জনগণ ও তাদের প্রথাগত সংস্কৃতির উপর নিপীড়নের ব্যাপারে অবগত হয় তখন থেকেই চিনের প্রতি ভারতের মনোভাব বিরূপ হতে থাকে। তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা ১৯৫৯ সালে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। চিন অভিযোগ করতে শুরু করে যে ভারত সরকার নিজ দেশের অভ্যন্তর থেকে চিন বিরোধী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান করছে।

এর সামান্য পূর্বে, ভারত এবং চিনের সীমান্ত বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ভারতের দাবি ছিল এই যে স্বাধীনতার আগেই সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। কিন্তু চিন মনে করে ওই সময়ের সমাধানে এখন কার্যকর করা যাবে না। মূল সমস্যাটি ছিল পশ্চিম এবং পূর্বের দীর্ঘ সীমান্ত রেখার শেষ অংশ নিয়ে। ভারতের অভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডের দুটি অঞ্চলের উপর চিন দাবি আরোপ করে থাকে; একটি হলো জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্গত লাদাখ অঞ্চলের আকসাই চিন এলাকা আর অন্যটি হলো অরুণাচল প্রদেশের অধিকাংশ এলাকা। এই অঞ্চলটি নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি (NEFA) হিসেবে পরিচিত। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সময়ে চিন আকসাই চিন এলাকা দখল করে সেখানে কৌশলগত রাস্তা নির্মাণ করে। দু-দেশের মধ্যে অনেক উচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনা সত্ত্বেও এই ধরনের সীমান্ত সংকটের কোনোরূপ সমাধান করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মাঝে মাঝে দু-দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমান্ত সম্পর্কিত ছোটোখাটো খণ্ডযুদ্ধও সংগঠিত হয়েছে।

সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত কিউবান মিসাইল সংকটের কথা কি তোমার মনে আছে? সেই সময়ে দুই মহাশক্তিধর দেশের দ্বারা সংগঠিত এই সংকটের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি যখন সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ ঠিক তখনি অর্থাৎ ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চিন ভারতের এই দুটি বিতর্কিত অঞ্চলে তীব্র আগ্রাসন শুরু করে। প্রথম আক্রমণটি এক সপ্তাহব্যাপী স্থায়ী ছিল এবং এই সময়ে চিন অরুণাচল প্রদেশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে নেয়। দ্বিতীয় আক্রমণটি সংঘটিত হয় পরবর্তী মাসে। ভারতের সেনাবাহিনী যখন লাদাখের পশ্চিম সীমান্তে আগ্রাসন প্রতিহত করতে ব্যস্ত ঠিক তখনই পূর্বদিকে চিনের সেনাবাহিনী সমতল আসাম পর্যন্ত চলে আসে। শেষ পর্যন্ত এককভাবেই চিন যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে এবং পূর্বের অবস্থানে তার সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

> আমি এটা আমার দাদুর কাছ থেকে শুনেছি। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের পর লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া "অ্যায় মেরে ওয়াতন কে লোগো....." এই গানটি শুনে নেহরু জনসম্মুখে কেঁদেছিলেন।

চিনের সাথে এই যুদ্ধ ঘরে বাইরে ভারতের প্রতিচ্ছবি অনেকটাই ম্লান করে দেয়। এই সংকট থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য ভারত আমেরিকা ও ব্রিটিশ সরকারের কাছে সামরিক সাহায্যের জন্য আবেদন করে। এই সংকটের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চিন যুদ্ধে ভারতের দুর্বলতা জাতীয় লজ্জায় পরিণত হয় এবং একই সময়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা গভীরভাবে জাগ্রত হয়। বেশ কয়েকজন উচ্চপর্যায়ে সামরিক পদাধিকারী হয় পদত্যাগ করেন অথবা স্বেচ্ছায় অবসর নেন। নেহরুর খুব কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভি.কে. মেননও ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করেন। চিনের উদ্দেশ্য বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে না পারার কারণে নেহরু প্রবলভাবে সমালোচিত হন এবং সেই সময়ে তাঁর ভাবমূর্তি যথেষ্টভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। সামরিকভাবে অপ্রস্তুতির কারণেও নেহরু সরকার প্রবল বিরোধিতায় সম্মুখীন হয়। প্রথমবারের মতো সংসদের অভ্যন্তরে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয় এবং এই বিষয়ে প্রবল বিতর্ক সংগঠিত হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে সংগঠিত উপনির্বাচনে কংগ্রেস বেশ কিছু গুরুত্বপর্ণ আসন হারায়। দেশে তখন রাজনৈতিক পালাবদলের হাওয়া বইতে শুরু করে।

দ্রুত ধাবমান

১৯৬২ সাল থেকে চিন-ভারত সম্পর্ক

চিন ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে প্রায় এক দশক লেগে যায়। ১৯৭৬ সালে ভারত এবং চিনের মধ্যে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হয়। উচ্চস্তরীয় নেতাদের মধ্যে অটল বিহারী বাজপেয়ী ছিলেন (তিনি তখন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী) প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৯৭৯ সালে চিন সফর করেন। পরবর্তীতে নেহরুর পরে রাজীব গান্ধি ছিলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি চিন সফরে যান। তখন থেকেই দু-দেশের সম্পর্কের মূল অগ্রাধিকার ছিল বাণিজ্য। সমকালীন বিশ্ব রাজনীতি নামক বইতে তোমরা এ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই অনেক কিছু জানতে পেরেছো।

ভারত-চিন বিবাদ বিরোধী দলগুলোর মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করে। এই সংকট পাশাপাশি চিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শত্রুতার কারণে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (CPI) অভ্যন্তরেও গভীর বিভাজনের সৃষ্টি হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুগামী গোষ্ঠী সিপিআই-তে থেকে যায় এবং কংগ্রেস দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়। অন্য গোষ্ঠী কিছু সময়ের জন্য চিনের সাথে নৈকট্য তৈরি করে কিন্তু কংগ্রেসের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার বিরোধিতা করে। ১৯৬৪ সালে পার্টিতে বিভাজন তৈরি হয় এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর নেতারা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসীয়) বা CPI(M) নামে নতুন দল গঠন করে। যুদ্ধের সময় চিনের প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণে সিপিআই (এম)-এর অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চিনের সাথে যুদ্ধ ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংবেদনশীল পরিস্থিতির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। মূল ভূখণ্ড থেকে ভৌগোলিকভাবে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ও অনুন্নত এই অঞ্চলটি জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে ভারতকে গভীর চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেয়। যার ফলে যুদ্ধের পর এই অঞ্চলের পূর্ণগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। নাগাল্যান্ডকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। মণিপুর এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে থেকে গেলেও তাদেরকে নিজস্ব বিধানসভা গঠনের অধিকার প্রদান করা হয়।

চলো ছায়াছবিটি দেখি

হকিকত

লাদাক অঞ্চলের স্থানীয় কিছু বেদুইন লোক আটকে পড়া ভারতীয় সোনাবাহিনীর ছোট একটি দলকে উদ্ধার করে। শত্রুপক্ষ তাদের চৌকি ঘিরে ফিলেছিল। ক্যাপ্টেন বাহাদুর সিং এবং তার বেদুইন প্রেমিকা কাম্মো মিলে জওয়ানদের চৌকি ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে সাহায্য করে। চিনা সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করতে গিয়ে বাহাদুর সিং ও কাম্মো দুজনেই শহিদ হন এবং অন্যান্য জওয়ানরাও শত্রু দ্বারা পুনঃবেস্টিত হয়ে পরে। এ পরিস্থিতিতে লড়তে লড়তে জওয়ানরা দেশের জন্য তাদের জীবন বিসর্জন দেয়।

১৯৬২ সালে চিন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই ছবিটি নির্মিত হয়। এই ছবিটির মূল কাহিনী একজন সৈনিক ও তার বেদনাদায়ক সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়। জওয়ানদের দুঃখ দুর্দশা চিত্রায়িত করার মাধ্যমে এই ছবিটিতে তাদের সম্মান জানানো হয়। ছবিতে রাজনৈতিক হতাশা ও চিনের বিশ্বাসঘাতকতাকেও বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়। এই ছবিতে প্রমাণ হিসেবে প্রকৃত যুদ্ধের কিছু ফুটেজও ব্যবহার করা হয়। হিন্দি ভাষায় নির্মিত প্রথম দিকের যুদ্ধ চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে এই ছবিটি ছিল অন্যতম।

সাল : ১৯৬৪
পরিচালক : চেতন আনন্দ
অভিনয় : ধর্মেন্দ্র, প্রিয়া রাজবংশ, বলরাজ সাহানি, জয়ন্ত, সুধীর, সঞ্জয় খান, বিজয় আনন্দ।

পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ এবং শান্তি (Wars and Peace with Pakistan)

বিভাজনের পর থেকেই কাশ্মীর বিষয়কে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সাথে ভারতের সংঘর্ষ শুরু হয়। অষ্টম অধ্যায়ে এই বিবাদ সম্পর্কে তোমরা আরও বেশি জানতে পারবে। ১৯৪৭ সালেই ভারত এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মধ্যে ছায়াযুদ্ধ শুরু হয়। যদিও এই ছায়াযুদ্ধ পূর্ণ যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়নি। এক সময়ে কাশ্মীর সমস্যা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জেও উত্থাপিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতের জন্য পাকিস্তান ক্রমশ বাঁধা হয়ে উঠে। পরবর্তীতে চিনের সাথে ভারতের সুসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও পাকিস্তান কাটা হয়ে দাঁড়ায়।

কাশ্মীর সমস্যার কারণে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সরকারিস্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা থেমে থাকেনি। দু-দেশের সরকারই বিভাজনের সময়কালে অপহরিত নারীদেরকে তাদের ঘরে নিরাপদে ফিরে যেতে একসাথে কাজ করে। নদী জল বণ্টন জনিত দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যস্থতায় সমাধান করা হয়। ১৯৬০ সালে নেহরু এবং জেনারেল আয়ুব খান ভারত পাকিস্তান সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষর করেন। দুদেশের সম্পর্কের নানাহ উত্থান পতন সত্ত্বেও এই চুক্তি এখনও সফলভাবে কার্যকর রয়েছে।

১৯৬৫ সালে দুই দেশের মধ্যে অতি আক্রমণাত্মক সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে তোমরা জানতে পারবে যে সেই সময় লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান গুজরাটের ‘রণ-অফ কুছ’ এলাকায় স্বশস্ত্র আক্রমণ চালায়। একই বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলেও পাকিস্তান আরও ভয়ানক আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানি শাসকরা ভেবেছিলেন যে এই আক্রমণে তারা স্থানীয় মানুষের সাহায্য পাবেন। কিন্তু তাদের এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানি আক্রমণের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী ভারতের সেনা বাহিনীকে পাঞ্জাব সীমান্ত বরাবর বড় ধরনের প্রতি আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করে। এই ভয়াবহ যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিজয়ীর বেশে লাহোরের কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপে এই মুখোমুখি শত্রুতার সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের জেনারেল আয়ুব খান সোভিয়েত ইউনিয়নের পর্যবেক্ষণে তাসকন্দ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ভারতের সাথে সংঘর্ষের ফলে সামরিকভাবে পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ ভারতের দুর্বল অর্থনীতিকেও আরো বেশি দুর্বল করে দেয়।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধ (Bangladesh war, 1971)

১৯৭০ সালের শুরুতে পাকিস্তান সর্ববৃহৎ এক অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিভাজিত ফল পরিলক্ষিত হয়। জুলফিকার আলি ভুট্টোর দল পশ্চিম পাকিস্তানে জয় লাভ করে। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ এই ভোটের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক শাসকদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদকে প্রতিফলিত করেছিল। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ বাঙালিদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে মনে করত। শাসককূল তাই জনগণের এই গণতান্ত্রিক রায়কে মানতে রাজি ছিল না। এমনকী আওয়ামি লিগ দ্বারা উত্থাপিত ফেডারেশনের দাবিকেও তারা প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৭১ সালের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি অগ্রাহ্য করে শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর অমানবিক ও সন্ত্রাসী অত্যাচার শুরু করে। এই অন্যায় ও

The Times of India
NO. 246. VOL. CXXVII. * BOMBAY: TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1965
16 PAISE
OUR TROOPS ON OUTSKIRTS OF LAHORE
IAF Planes Blast Military Installations
PAK FORCES ON THE RUN IN CHHAMB AREA
Jaurian In Flames: Success In Uri Sector Too
"The Times of India" News Service
BLACK-OUT IS ORDERED IN GREATER BOMBAY
By A Staff Reporter
Indo-Pak Flights Cancelled
SOLD EVERYWHERE
DEPIL
The Hindustan Times
ALKOT-PASRUR RAILWAY TAKEN
IAF pounds Sargodha, Chak Jhumra airports
1965
जय जवान
JAI JAWAN
भारत INDIA
जय किसान
JAI KISAN
भारत INDIA
The Hindustan Times
TROOPS MARCH INTO PAKISTAN
CONTACT LENS
DRYCLEANED
PAULSONS

অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে সেখানকার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'বাংলাদেশ'-কে স্বাধীন করার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পরে। ১৯৭১ সালে ভারত প্রায় ৮০ লক্ষ বাঙালি শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদান করে যারা পূর্বে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আশ্রয়ের খোঁজে প্রতিবেশী ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সকল প্রকার নৈতিক ও বাহ্যিক সহায়তা প্রদান করেছিল। পাকিস্তান তার অখণ্ডতাকে বিনষ্ট করার জন্য ভারতকে দায়ী করেছিল।

সে সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন সুসম্পর্ক স্থাপন করে যা পরবর্তীতে এশিয়া মহাদেশে এসে যৌথবাহিনী গঠনের সন্নিকটে এসে দাঁড়ায়। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসনের পরামর্শদাতা হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে চিন ও পাকিস্তানের সাথে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। শত্রুপক্ষের এই ধরনের মিত্রতা মোকাবিলার স্বার্থে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ২০ বছর মেয়াদি শান্তি ও বন্ধুত্ব চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুসারে ভারত কোন রাষ্ট্রের দ্বার আক্রান্ত হলে তাৎক্ষণিক ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

কয়েকমাস ব্যাপী কূটনৈতিক টানাপোড়েন ও সামরিক হুমকি-ধমকির পর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত ও পাকিস্তান পূর্ণ সশস্ত্র সামরিক সংগ্রামে জড়িয়ে পরে। পাক সেনাবাহিনী একদিকে জম্মু ও কাশ্মীর সীমান্ত বরাবর হামলা চালাতে থাকে অন্যদিকে বিমান বাহিনী পাঞ্জাব এবং রাজস্থান এলাকায় বোমাবর্ষণ শুরু করে। প্রতিশোধ হিসেবে ভারত বিমান, নৌ ও সোনাবাহিনীর মাধ্যমে পশ্চিম এবং পূর্ব উভয় সীমান্ত বরাবর যৌথ হামলা চালাতে শুরু করে। স্থানীয় জনগণের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তান এলাকায় দ্রুত সফলতা লাভ করে। একসময় ভারতের সেনাবাহিনী মাত্র ১০ দিনের মাথায় রাজধানী ঢাকার তিনদিক ঘিরে ফেলে, পরিণতিতে ৯০ হাজার সেনাবাহিনী সহ পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে। নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরে ভারত একপক্ষীয় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। পরবর্তীতে অর্থাৎ ৩রা জুলাই ১৯৭২ সালে ইন্দিরা গান্ধি এবং জুলফিকার আলি ভুট্টোর দ্বারা স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তির মাধ্যমে উভয়দেশ শান্তি প্রক্রিয়ায় ফিরে আসে।

যুদ্ধে অভাবনীয় সফলতা লাভের পর দেশব্যাপী আনন্দ উৎসব শুরু হয়। ভারতের বেশিরভাগ জনগণ এই বিজয়কে গৌরবের মুহূর্ত এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান সামরিক ক্ষমতার চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে তোমরা জানতে পারবে যে ঐ সময় ইন্দিরা গান্ধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনেও তিনি জয়ী হোন। তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ও জনপ্রিয়তা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর উচ্চশিখরে পৌঁছায়। যুদ্ধের পরে অনেক রাজ্যেই বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বেশিরভাগ রাজ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেস দল বিজয়ী হিসাবে আবির্ভূত হয়।

দ্রুত অগ্রগমণ কার্গিল সংঘর্ষ

১৯৯৯ সালের শুরুর দিকে ভারত অধ্যুষিত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর মাস্কোহ, দ্রাস, কাক্সার এবং বাটালিক অঞ্চলের কিছু পয়েন্ট পাকিস্তানের মদতপুস্ট মুজাহিদিন গোষ্ঠী দখল করে নেয়। এই জবরদখলে পাকিস্তানি সোনাবাহিনীর হাত রয়েছে এটা ভেবে ভারতের সেনাবাহিনী যথোপযুক্ত জবাব দেওয়া শুরু করে। যার ফলে দু'দেশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষ কার্গিল সংকট হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। ১৯৯৯ সালের মে এবং জুলাই মাসব্যাপী এই সংঘর্ষ চলতে থাকে। ১৯৯৯ সালের ২৬শে জুলাই নাগাদ ভারত হারিয়ে যাওয়া বা দখলকৃত বেশিরভাগ সেক্টরই নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। কার্গিল যুদ্ধ গোটা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কারণ এই ঘটনার মাত্র এক বছর পূর্বে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশেই সফল পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। তবে এই যুদ্ধ শুধুমাত্র কার্গিলেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এই যুদ্ধ বিশাল বিতর্কের জন্ম দেয়। কারণ পরবর্তীতে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় যে এই ব্যাপারে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অন্ধকারে রেখেছিলেন। এই যুদ্ধের অব্যাহতি পরে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল পারভেজ মুশারফের নেতৃত্বে পাক সেনাবাহিনী নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে।

1971

THE TIMES OF INDIA

BOMBAY: SATURDAY, DECEMBER 18, 1971

YAHYA YIELDS TO INDIRA, ENDS WAR

Somersault by General as

...S. hails Delhi

...keeps out

Gen. A. A. K. Niazi signing the surrender documents in Dacca on Thursday. Lt-Gen. A... Air Marshal H. C. Dewan, Lt-Gen. Sagat...

Remain alert, warn...

APPENDIX 2

INSTRUMENT OF SURRENDER SIGNED AT DACCA AT 1631 HOURS (IST) ON 16 DEC 1971

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. The forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre
16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and Commander Eastern Command (PAKISTAN)
16 December 1971.

...s: The surrender document

THE HINDUSTAN TIMES

New Delhi Tuesday March 16 1971

MUJIB TAKES OVER 'BANGLA DESH'

New Delhi Sunday March 28 1971

PAK PLANES BOMB BANGLA DESH

Baluchistan, NWFP are also free?

Freedom fighters blow up bridges

Cong (N) majority in UP now

ভারত তার সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও উন্নয়ন পরিকল্পনা উদ্যোগ গ্রহণ করে। যদিও পাশ্ববর্তী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংকটের কারণে এই উদ্যোগ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংঘর্ষের কারণে সীমিত সম্পদকেও প্রতিরক্ষাখাতে বেশি করে ব্যয় করা হয়। ১৯৬২ সালে এই প্রবণতা আরো বেড়ে যায় কারণ ভারতের জন্য সে সময় তার সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালী করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এর অঙ্গ হিসেবে ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তর (Department of Defence Production) এবং ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রতিরক্ষা সরবরাহ দপ্তর (Department of Defence Supplies) নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এইভাবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও (১৯৬১-৬৬) যথেষ্ট প্রভাবিত হয় যা পরবর্তী তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যার ফলে ১৯৬৯ সালে চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু হয়। এই যুদ্ধগুলোর কারণে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভারতের পরমাণু নীতি (India's Nuclear Policy)

ওই সময়ে সংগঠিত আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ১৯৭৪ সালের মে মাসে ভারত কর্তৃক প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুতগতিতে আধুনিক ভারত নির্মাণে প্রধানমন্ত্রী নেহরু সচেষ্ট ছিলেন। শিল্পায়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ছিল পরমাণু কর্মসূচি। ১৯৪০ এর দশকে হোমি জাহাঙ্গির ভাবার নেতৃত্বে প্রথম পরমাণু কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ভারত পরমাণু শক্তির উৎপাদন শুরু করতে চেয়েছিল। নেহরু ব্যক্তিগতভাবে পরমাণু অস্ত্রের বিরোধিতা করতেন। সুতরাং, বৃহৎতরভাবে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে নেহরু মহাশক্তিধর দেশগুলোর কাছে আবেদন করেছিল। কিন্তু তারপরেও পৃথিবীতে পরমাণু অস্ত্রের সম্ভার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে সমাজতান্ত্রিক চিন যখন পরমাণু পরীক্ষা সম্পন্ন করে তখন পাঁচটি পরমাণু শক্তিধর দেশ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং চিন (তখন চিনের পরিবর্তে তাইওয়ান ছিল) রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হন। এই সময় এই পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরিত পরমাণু প্রসারে প্রসাররোধ চুক্তি (NPT) বাকি বিশ্বের উপর আরোপ করতে চেয়েছিল। ভারত এই চুক্তিকে (NPT) বৈষম্যমূলক মনে করে তাতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানায়। ভারত যখন প্রথম পরমাণু পরীক্ষা সংগঠিত করে তখন এটাকে শান্তিপূর্ণ বিস্ফোরণ বা পরীক্ষা হিসেবে প্রচার করে। ভারত যুক্তি দিয়ে বলেছিল যে আমাদের দেশ শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু ব্যবহারে বিশ্বাস করে।

প্রথম পরমাণু পরীক্ষার সময় ভারতের সময় ভরিতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি গোলযোগপূর্ণ ছিল। ১৯৭৩ সালের আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের কারণে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী তেল সঙ্কট ও সমস্যা দেখা দেয়, কারণ সে সময় আরব দেশসমূহ উৎপাদিত তেলের মূল্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ভারতের অর্থনীতিও গভীরভাবে টালমাটাল হয়ে পরে এবং এতে মুদ্রাস্ফীতি শুরু হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তোমরা জানতে পারবে যে এই ধরনের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয় এর মধ্যে সর্বজনীন রেলওয়ে ধর্মঘট ছিল অন্যতম।

বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে খুব বেশি একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ভারতীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে বিষয়গুলোর উপর বৃহত্তর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হলো— জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা, আন্তর্জাতিক সীমারেখার সুরক্ষা এবং জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখা। সুতরাং ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত প্রায় দশ বছর সময়কালে ভারত তিন তিনটি যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিল এবং এর পরবর্তীতেও বিভিন্ন সময়ে ভারতের রাজনীতিতে প্রচুর পালাবদল ঘটেছে। কিন্তু দেখা গেছে যে দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বৈদেশিক নীতি খুব বেশি একটা প্রভাবশালী হয়ে উঠেনি।

দ্রুত অগ্রগমন ভারতের পরমাণু কার্মসূচি

যেহেতু পরমাণু প্রসারবোধ চুক্তি সমূহ পরমাণু অস্ত্রবিহীন রাষ্ট্রগুলোর উপর প্রযোজ্য এবং পরমাণু অস্ত্র শক্তি সম্পন্ন পাঁচটি মহাশক্তিদর দেশের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে বৈধতা প্রদান করার চেষ্টা করে তাই ভারত এই চুক্তিগুলোর বিরোধিতা করে। সুতরাং ভারত ১৯৯৫ সালে অনির্দিষ্টকালের জন্য এনপিটি (NPT)-এর প্রসারকে বিরোধিতা করেছিল। তাছাড়া ভারত ব্যাপক পরীক্ষা নিষেধাজ্ঞা চুক্তি (CTBT)-তেও স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানায়।

১৯৯৮ সালের মে মাসে ভারত বেশ কতগুলো পরমাণু পরীক্ষা সংগঠিত করে। এই পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে সামরিক উদ্দেশ্যে পরমাণু ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত তার সামর্থ ব্যক্ত করেছিল। পাকিস্তানও একই পদ্ধতি অনুসরণ করে যার ফলে এই অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং সামরিক ভারসাম্য সংবেদনশীল হয়ে পরে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই উপমহাদেশে সংগঠিত পরমাণু পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সমালোচনায় মুখর হতে থাকে এবং ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের উপরে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে। পরে অবশ্য এই অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হয়। ভারতীয় পরমাণু কর্মসূচির মূল ধারণা হলো ন্যূনতম ও বিশ্বাসযোগ্য পরমাণু প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যার আদর্শ হলো "প্রথম ব্যবহার না করা" (No first use)। এক্ষেত্রে ভারতের আরেকটি প্রতিশ্রুতি হলো যাচাইযোগ্য এবং বৈষম্যহীন পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়া যাতে পরমাণু অস্ত্রবিহীন বিশ্ব গড়ে তোলা যায়।

বিশ্ব রাজনীতিতে পরিবর্তনশীল জোট

ষষ্ঠ এবং নবম অধ্যায়ে তোমরা জানতে পারবে যে ১৯৭৭ সালের পর থেকে বেশ কয়েকবার অকংগ্রেসি সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। ওই সময়ে বিশ্ব রাজনীতিতেও অনেক নাটকীয় পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছিল। এই অবস্থা ভারতের বৈদেশিক নীতিতে কতটুকু প্রভাব ফেলেছিলো?

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে জনতা দলের সরকার ঘোষণা করেছিল যে ভারত পূর্ণরূপে জোট নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করবে। যার অর্থ হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ঝুঁকে পড়া বিদেশনীতি সংশোধন করা হলো। তারপর থেকে সব সরকারই (কংগ্রেস কিংবা অকংগ্রেস) চিনের সাথে সুসম্পর্ক পুনঃস্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ভারতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত জনপ্রিয়ভাবে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে দুটি বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়। একটি হলো পাকিস্তানের প্রতি ভারতের মুখোমুখি অবস্থান এবং অন্যটি হলো ভারত-মার্কিন সম্পর্ক। ১৯৯০ সালের পরে প্রতিষ্ঠিত সকল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই মার্কিনমুখী বৈদেশিক নীতির কারণে সমালোচিত হতে থাকে।

বৈদেশিক নীতি সবসময়ই জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। ১৯৯০ সালের পরবর্তী সময়ে রাশিয়া ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু হিসেবে থেকে গেলেও বিশ্ব রাজীতিতে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। যার ফলে ভারতের বিদেশনীতি অনেকটাই মার্কিনমুখী হতে শুরু করে। তাছাড়া সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সামরিক ক্ষমতার চেয়েও অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতে থাকে এবং এর প্রভাব ভারতের বিদেশনীতির বিকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পড়তে থাকে। একই সময়ে ভারত-পাক সম্পর্কেও নানাহ ঘটনাপঞ্জি সংগঠিত হয়। কাশ্মীর তখনও দুদেশের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছিলো এবং এই সময়ে দু-দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে নানাহ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, নাগরিকদের যৌথ ভ্রমণ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ইত্যাদিকে দু-দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজার রাখার ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তোমরা কি জানো দুদেশের মধ্যে একটি ট্রেন এবং একটি বাস পরিসেবা প্রতিনিয়ত কার্যকর রয়েছে? এগুলো সাম্প্রতিক সময়ের সফলতা। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও ১৯৯৯ সালের যুদ্ধকে পরিহার করা যায়নি। শান্তি প্রচেষ্টা বারবার বিস্মিত হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে এখনো আলাপ-আলোচনা চলছে।

অনুশীলনী

1. নীচের বক্তব্যগুলোর পাশে ‘ভুল’ অথবা ‘শুদ্ধ’ লিখ।

(a) জোট নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ের কাছ থেকেই ভারত সহায়তা পেয়েছিল।

(b) শুরু থেকেই প্রতিবেশি রাষ্ট্র সমূহের সাথে ভারতের সম্পর্ক বিব্রতকর ছিল।

(c) ঠান্ডা যুদ্ধ ভারত-পাক সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

(d) ১৯৭১ সালে স্বাক্ষরিত শান্তি ও বন্ধুত্ব চুক্তি (Treaty of Peace and friendship) ছিল ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সুসম্পর্কের প্রতিফলন।

2. মিলিয়ে দেখো :

(a) ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে ভারতের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ছিল।	i. তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা যিনি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।
(b) পঞ্চশীল	ii. ভৌগোলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমিকতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমুন্নত রাখা।
(c) বান্দুং সম্মেলন	iii. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পাঁচ প্রকারের শান্তি নীতি।
(d) দালাই লামা	iv. জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

3. নেহরু কেন মনে করতেন যে বৈদেশিক সম্পর্ক হলো স্বাধীতার অন্যতম সূচক? এই বক্তব্যটির স্বপক্ষে উদাহরণসহ দুটি যুক্তি উপস্থাপন করো।

4. “চলমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতা এই দুই-এর সংমিশ্রণের ফলাফল হলো বৈদেশিক সম্পর্ক।” ১৯৬০-এর দশকে পরিচালিত ভারতীয় বিদেশিনীতির একটি উদাহরণ সহকারে তোমার উত্তরকে সমৃদ্ধ করো।

5. তুমি যদি একজন সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী হও তাহলে ভারতের বিদেশনীতির এমন দুটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করো যা তুমি ধারাবাহিকভাবে চালু রাখতে চাও এবং এমন দুটি বৈশিষ্ট্যকেও খুঁজে বের করো যা তুমি পরিবর্তন করতে চাও। তোমার অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শ করো।

6. নিম্নে প্রদত্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা লেখো :

(a) ভারতের পরমাণু নীতি।

(b) বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে ঐক্যমত।

7. ভারতের বিদেশনীতি শান্তি ও সহযোগিতার নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দশ বছর সময়কালে ভারত তিন-তিনটি যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিল। তুমি কি মনে করো এক্ষেত্রে ভারতের বিদেশনীতি ব্যর্থ হয়েছে? অথবা তুমি কি বলতে চাও যে এগুলো ছিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিরই পরিণাম? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করো।

8. ভারতের বিদেশনীতি কি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করে? ১৯৭১ সালে সংগঠিত বাংলাদেশ যুদ্ধের উদাহরণ নিয়ে তুমি তোমার যুক্তি উপস্থাপন করতে পারো।

অনুশীলনী

9. কীভাবে একটি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সে দেশের বিদেশ নীতিতে প্রভাব বিস্তার করে? ভারতের বিদেশনীতির উদাহরণ টেনে তোমার উত্তর বিশ্লেষণ করো।

10. নিম্নের বক্তব্যটি পড়ো এবং প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। "বৃহত্তরভাবে, জোট নিরপেক্ষতার অর্থ হলো কোনো প্রকার সামরিক জোটের সাথে যুক্ত না হওয়া..... এর অর্থ হলো কোন বিষয়কে যতদূর সম্ভব সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই না করা যদিও কখনো কখনো এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, তখন তা যাচাই করতে হবে স্বাধীনভাবে, তবে এক্ষেত্রেও সকলরাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।"

— **জওহরলাল নেহরু**

(a) নেহরু কেন সামরিক জোট থেকে দূরে থাকবে চেয়েছিলেন?

(b) তুমি কি মনে করো ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সংঘটিত বন্ধুত্ব চুক্তি জোট নিরপেক্ষতার আদর্শকে ক্ষতিগ্রত করেছে? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করো।

(c) যদি সামরিক শিবিরের উপস্থিতি না থাকতো তাহলে তোমার মতে জোট নিরপেক্ষ নীতি কি তখন প্রাসঙ্গিক থাকতো?

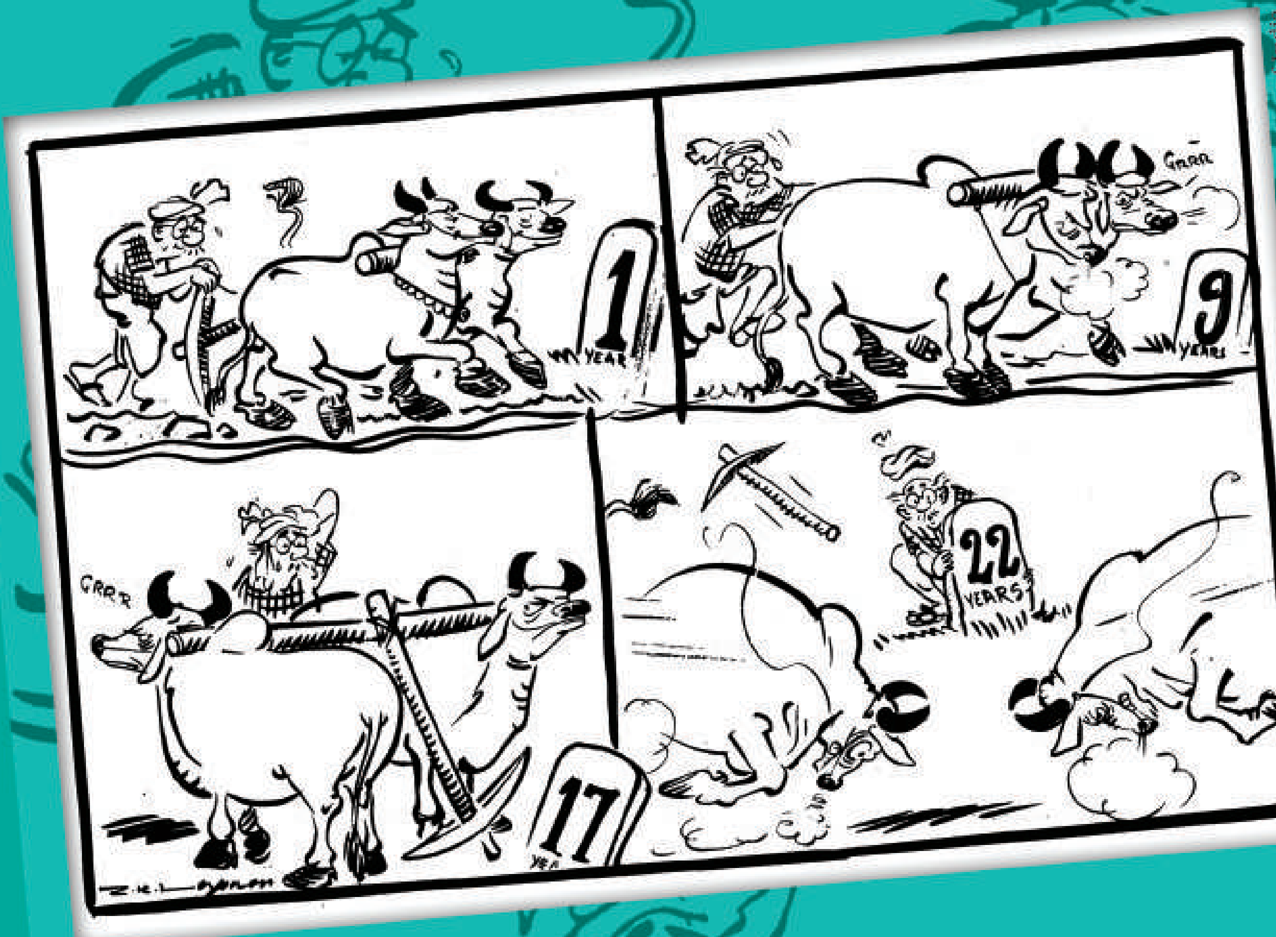

Credit: R. K. Laxman in The Times of India

শুরুতে কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক ছিল জোড়া বলদ। এই বিখ্যাত ব্যাঙ্গাচিত্রে স্বাধীনতার পর ২২ তম বছরে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তণ এবং মুখোমুখি সংঘর্ষগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে (In this chapter)…

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা কংগ্রেসি ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু অধ্যায়ন করেছি। ১৯৬০-এর দশকে এই ব্যবস্থা প্রথমবারের মতো সমস্যার মুখোমুখি হয়। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা গভীর থেকে গভীরতর হওয়ার কারণে কংগ্রেসের পক্ষে তার প্রতিপত্তি ধরে রাখতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। কংগ্রেস তখন আগের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী এবং ঐক্যবন্ধ বিরোধী দলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বহুমুখী মতবিরোধকে সমন্বয় করতে না পারার কারণে কংগ্রেস অভ্যন্তরীণভাবেও সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে থাকে। এই অধ্যায়ে আমরা ওই সকল ঘটনাপঞ্জি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়নি। কারণ যাতে আমরা—

- জানতে পারি কীভাবে নেহরুর পরে রাজনৈতিক পালাবদল শুরু হলো;
- বর্ণনা করতে পারি কীভাবে বিরোধী ঐক্য এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিভাজন কংগ্রেসি প্রতিপত্তির সামনে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়;
- ব্যাখ্যা করতে পারি কীভাবে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে নতুন কংগ্রেস-এই সমস্যাগুলো সফলভাবে মোকাবিলা করেছিল; এবং
- বিশ্লেষণ করতে পারি কীভাবে নতুন নীতিমালা এবং মতাদর্শ কংগ্রেসীয় ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করেছিল।

অধ্যায় 5

কংগ্রেসি ব্যবস্থার সমস্যা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Challenges to and Restoration of the Congress System)

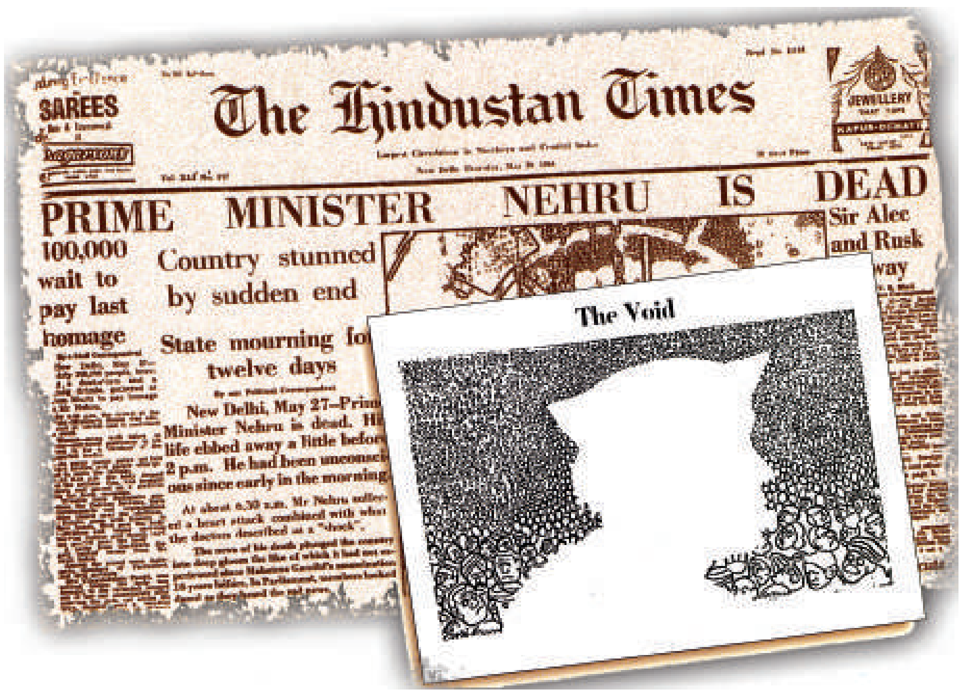

রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা(Challenge of Political Succession)

১৯৬৪ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মৃত্যু বরণ করেন। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। এই পরিস্থিতি নানাহ জল্পনার জন্ম দিয়েছিল। যেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই জল্পনা শুরু হয় তা ছিল : নেহরুর পর কে? কিন্তু ভারতের মতো একটি নতুন স্বাধীন দেশে যে প্রশ্নটি আরো গভীরভাবে উঠে আসে তা হল : নেহরুর পরে, কী হবে?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এমন একটি সন্দেহ থেকে উদ্ভুত হয় যে অনেক বহিরাগতরাই ভাবতে থাকে নেহরুর পরে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে থাকবে কি না। এমন আশঙ্কাও করা হয়েছিল যে অন্যান্য নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর মতো ভারতও হয়তো নতুন গণতান্ত্রিক উত্তরাধিকার তৈরিতে সক্ষম হবে না। অন্য একটি আশঙ্কা এমনও ছিল যে যোগ্য গণতান্ত্রিক উত্তরসূরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা হয়তো দেশকে সামরিক শাসনের দিকে নিয়ে যাবে। তাছাড়াও, যে সন্দেহটি তখন বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল তা ছিল নতুন নেতৃত্ব বহুমুখী সংকট মোকাবিলা ও তার প্রত্যাশিত সমাধানে সফল হবে কি না। ১৯৬০ এর দশককে ‘ভয়ঙ্কর দশক’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ সে সময়ে দারিদ্রতা, বৈষম্যতা, সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক

বিভাজনের মতো সমস্যাগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিতে পারে অথবা দেশের অখণ্ডতা ধ্বংস করে দিতে পারে।

নেহরু থেকে শাস্ত্রী (From Nehru to Shastri)

খুব সাধারণভাবে যখন নেহরুর রাজনৈতিক উত্তরসূরি নির্বাচিত হয় তখন তা সমালোচকদের ভুল প্রমাণিত করে। নেহরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি কে. কামরাজ দলীয় নেতৃত্ব এবং পার্লামেন্টের কংগ্রেস সদস্যদের সাথে আলোচনা করে অনুধাবন করতে পারলেন যে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পক্ষেই সকলের মতামত রয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে লালবাহাদুর শাস্ত্রী কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয়ে দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হোন। নেহরু সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শাস্ত্রী বহু বছর ধরে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন এবং তখনকার সময় তিনি ছিলেন উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত একজন জনপ্রিয় ও অবিতর্কিত নেতা। শাসনকালের শেষ বছরে নেহরু অনেক ক্ষেত্রেই শাস্ত্রীর পরামর্শের উপর নির্ভর করতেন। সাধারণ সরলতা ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার জন্য তিনি সুবিখ্যাত ছিলেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে একটি ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনার দায়ভার গ্রহণ করে পদত্যাগ করে ছিলেন।

১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত শাস্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই স্বল্পকালীন সময়ে দেশ তখন দুটি বড় ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়। ওই সময়ে ভারত চিনের সাথে যুদ্ধের কারণে উদ্ভূত অর্থনৈতিক জটিলতা, স্বল্প বৃষ্টিপাতের কারণে মৌসুমি উৎপাদনে ব্যাপক হ্রাস, তীব্র খরা, খাদ্য সংকট ইত্যাদি সমস্যার মুখোমুখি। পূর্বের অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে ওই সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সাথেও ভারতের যুদ্ধ হয়েছিল। শাস্ত্রীর বিখ্যাত স্লোগান 'জয় জওয়ান- জয় কিষাণ' ছিল এইসব সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে দেশের প্রতিশ্রুতির একটি শক্তিশালী প্রতীক।

১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শাস্ত্রীর সময়কালে অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্ত হয়ে যায় যখন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত শহর এবং বর্তমান সময়ের উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসকন্দে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সেই সময়ে তিনি ওখানে চলমান যুদ্ধ সমাপ্তির প্রেক্ষাপটে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আয়ুব খানের সাথে আলোচনা ও চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য গিয়েছিলেন।

শাস্ত্রী থেকে ইন্দিরা গান্ধি (From Shastri to Indira Gandhi)

নেহরুর মৃত্যুর প্রায় দুই বছরের মধ্যে কংগ্রেস রাজনৈতিক উত্তরসূরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারের মতো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। কারণ শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর মোরারজি দেশাই ও ইন্দিরা গান্ধির মধ্যে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এর পূর্বে মোরারজি দেশাই বোম্বাই রাজ্যের (বর্তমানের মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট) মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। জওহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধিরও পূর্বে কংগ্রেস দলের সভাপতি ও শাস্ত্রীর সময়কালে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্ত তথ্যমন্ত্রী হিসাবে কার্যভার পালন করেছিলেন। এই অবস্থায় দলের বরিষ্ঠ সদস্যগণ ইন্দিরা গান্ধিকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত ছিলনা। সুতরাং দুজনের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা পরবর্তীতে পার্লামেন্টের কংগ্রেস সদস্যদের দ্বারা গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে মতামত দানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। দলীয় সংসদ সদস্যদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে ইন্দিরা গান্ধি মোরারজি দেশাইকে পরাজিত করেন। নেতৃত্বের মধ্যে গভীর প্রতিযোগিতা সত্বেও ক্ষমতার এই শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিপক্কতাকেই প্রমাণ করেছিল।

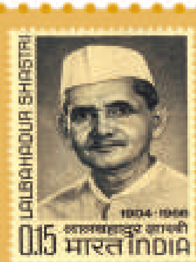

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী (১৯০৪-১৯৬৬): ভারতের প্রধানমন্ত্রী; ১৯৩০ সাল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন; উত্তরপ্রদেশের ক্যাবিনেট মন্ত্রী; কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক; ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী; ১৯৫৬ সালে সংগঠিত রেল দুর্ঘটনার দায়ভার গ্রহণ করে পদত্যাগ করেন; ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পুনরায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী; বিখ্যাত স্লোগান "জয় জওয়ান-জয়-কিষাণ"-এর উদ্ভাবক।

"... যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের তুলনায় অনেক সংশয় ও সন্দেহ থাকা সত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উত্তরসূরীর নির্বাচন স্বাভাবিক ও মর্যাদার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে।"

১৯৬৪ সালের ৩রা জুনে প্রকাশিত গার্ডিয়ান প্রত্রিকার সম্পাদকীয় যেখানে যুক্তরাজ্যে হেরল্ড ম্যাকমিলানের উত্তরসূরী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উদ্ভুত নাটকীয় পরিস্থিতির সাথে ভারতে নেহরূর উত্তরসূরী নির্বাচনী উদ্ভুত সাথে তুলনা করতে গিয়ে একথা বল হয়েছে।

Credit: R. K. Laxman in The Times of India, 18 January 1966

শাসনকার্যে স্থির হতে নতুন প্রধানমন্ত্রী কিছুটা সময় নিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে ইন্দিরা গান্ধি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ইন্দিরা গান্ধি সল্পসময়ের জন্য মন্ত্রী হয়েছিলেন তাই প্রশাসনিক কাজে তিনি ছিলেন অনেকটাই অনভিজ্ঞ। সুতরাং কংগ্রেস দলের প্রধান সদস্যরা এইভেবে হয়তো ইন্দিরা গান্ধিকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন যে তিনি প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হবেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এক বছরের মধ্যেই ইন্দিরা গান্ধি লোকসভা নির্বাচনে দলকে পরিচালনা করেছিলেন। এই সময়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো বেশি শোচনীয় হতে থাকে যা চলমান সমস্যাগুলোকে জটিল থেকে জটিলতর করে দেয়। এই সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে ইন্দিরা গান্ধি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাকে দলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে এবং দক্ষ নেতৃত্ব প্রদর্শন করতে হবে।

ইন্দিরা গান্ধি (১৯১৭-১৯৮৪) : ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সাল এবং ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী; জওহরলাল নেহরুর কন্যা; কংগ্রেসের যুবা কর্মী হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশগ্রহণ; ১৯৫৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি; ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত শাস্ত্রী সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী; ১৯৬৭, ১৯৭১ এবং ১৯৮০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দলকে নেতৃত্ব প্রদান; 'গরিবী হঠাও' স্লোগানের উদ্ভাবক; ১৯৭১ সালে সংগঠিত বাংলাদেশ যুদ্ধে বিজয়ী; ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহার্থ ভাতা (Privy Purse) নীতির বিলুপ্তি সাধন; ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ; প্রথম পরমাণু পরীক্ষা; পরিবেশ সংরক্ষণ; ১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর তারিখে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীদের দ্বারা নিহত।

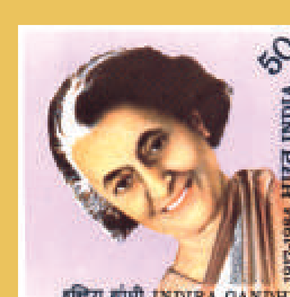

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন ১৯৬৭ (Fourth General Elections, 1967)

ভারতের রাজনীতি ও নির্বাচনের ইতিহাসে ১৯৬৭ সালকে মাইল ফলক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমরা ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছো যে কীভাবে ১৯৫২ সাল থেকে কংগ্রেস ভারতের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল হিসাবে তার প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, কিন্তু ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে এই প্রবণতার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে (Context of the elections)

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের বছরগুলোতে দেশে অনেকগুলো পরিবর্তন হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই দু-দুজন প্রধানমন্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই অনভিজ্ঞ। এর পর্বে মাত্র দুবছরেরও কম সময়ের জন্য তিনি মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা ও এই অধ্যায়ের মধ্যে একটু পূর্বে আলোচিত অংশ থেকে তোমরা জানতে পেরেছো যে এই সময়টা ছিল বিভিন্ন সমস্যায় পরিপূর্ণ।

যেমন মৌসুমি উৎপাদনে ব্যাপক হ্রাস, বহু এলাকায় ব্যপ্ত খরা, কৃষি উৎপাদনে ক্রম হ্রাস, চরম খাদ্য সংকট, বৈদেশিক মুদ্রা মজুতে ঘাটতি, শিল্পোৎপাদন ও পণ্য রপ্তানিতে পতন, পাশাপাশি যুদ্ধের কারণে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সামরিকখাতে স্থানান্তর ইত্যাদি কারণের পরিণতি হিসাবে চরম অর্থনৈতিক সংকট। এই পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধির দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা। অনেকেই মনে করেন এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের চাপের কারণেই করা হয়েছিল। এর পূর্বে পাঁচ টাকার কম দিয়েও এক ইউ. এস. ডলার কেনা যেত, কিন্তু ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাসের কারণে এখন সাত টাকা দিয়ে এক ডলার কিনতে হয়।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যবৃদ্ধির গতি বাড়িয়ে দেয়। প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য সংকট, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং দেশের সামগ্রিক নিম্নমুখী অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘনঘন বন্ধ এবং হরতাল আহ্বান করা হয়। এই পরিস্থিতিতে সরকার সমস্যার প্রতি জনগণের আক্রোশ হিসাবে বিবেচনা না করে বরং আইন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে। এ কারণে গণবিক্ষোভ ও গণঅসন্তোষ আরো তীব্রতর হয়ে উঠে।

কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিক দলগুলো সমাজে বৃহত্তর সমতা প্রতিষ্ঠা করতে আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তী অধ্যায়ে তোমরা জানতে পারবে যে কীভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসীয়-লেনিনীয়) থেকে পৃথক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসীয়) একটা অংশ সশস্ত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে এবং কৃষকদের বিক্ষোভ সমাবেশগুলো সংগঠিত করতে থাকে। এই সময়ে স্বাধীনতার পরে সংগঠিত সবচেয়ে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান কিছু দাঙ্গাও সংগঠিত হয়।

অকংগ্রেসি ব্যবস্থা (Non-Congressism)

এই পরিস্থিতি থেকে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো দূরত্ব বজায় রাখতে পারেনি। বিরোধী দলগুলো সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন গণআন্দোলনের সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিতে থাকে।

রাজস্থানের একটি গ্রামের নির্বাচন

(Election in a Rajasthan Village)

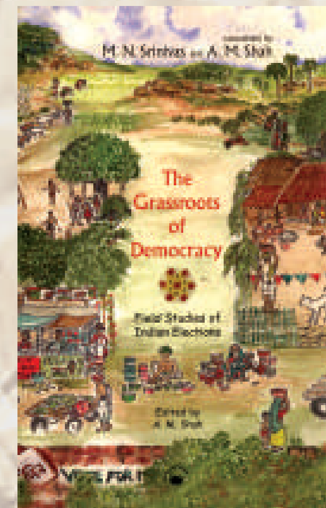

এটি ১৯৬৭ সালে সংগঠিত বিধানসভা নির্বাচনের সাথে জড়িত একটি ঘটনা। চৌমু নির্বাচনী ক্ষেত্রে দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র পার্টি। কিন্তু দেবীসার গ্রাম তার নিজস্ব স্থানীয় রাজনৈতিক সক্রিয়তার কারণে ওই দুই দলের প্রতিযোগিতার মধ্যে জড়িতে পড়ে। প্রথাগতভাবে ওই এলাকার রজৈনীতিতে শের সিং নামে এক ব্যক্তি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আসছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তার ভ্রাতুস্পুত্র ভীম সিং ওই এলাকার জনপ্রিয় নেতা ও বিরোধী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। পরম্পরাগতভাবে দুজনেই ছিলেন রাজপুত। তবে ভীম সিং সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর গ্রামের সর্বজনীন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হওয়ার কারণে অরাজপুত সম্প্রদায়ের কাছেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। সুতরাং স্থানীয় রাজনীতিতে রাজপুত ও অরাজপুত সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোর মাধ্যমে তিনি নতুন সমীকরণ গড়ে তুলেন।

গ্রাম থেকে গ্রামে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে জোট গঠনে তিনি দক্ষ হয়ে উঠেন। জোটবদ্ধ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অন্য গ্রামের গ্রামপ্রধান নির্বাচনে পছন্দমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমর্থন করতেন। এভাবে তিনি একদিন এক প্রতিনিধিদলকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস দলের নেতা মোহনলাল সুখাদীয়ার সাথে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বন্ধুকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু সুখাদীয়া ভীম সিংকে বিকল্প নামের প্রস্তাব করে তাকে তার এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বস্ত হয়ে ভীম সিং অন্যদেরকে বোঝাতে শুরু করেন যে তারা যেন দল কর্তৃক নির্ধারিত প্রার্থীকে সমর্থন প্রদান করেন। কারণ ভীম সিং অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে দলীয় প্রার্থী যদি এই নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে জয়ী হয়ে আসেন তাহলে অবশ্যই তিনি পরবর্তী সরকারের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন এবং এই অবস্থায় ভীম সিং প্রথমবারের মতো কোনো মন্ত্রীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে সমর্থ হবেন!

স্বতন্ত্র পার্টি কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করা ছাড়া শের সিং-এর অন্যকোনো বিকল্প ছিলনা। তিনি জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন যে যেহেতু প্রার্থী একজন জাগিরদার সেহেতু তিনি গ্রামের স্কুল নির্মাণে সাহায্য করতে সক্ষম হবেন এবং স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজের অর্থ সম্পদ খরচ করতেও সচেস্ট হবেন। এভাবেই বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেবীসার গ্রামে কাকা এবং ভাতিজার মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

আনন্দ চক্রবর্তীর লেখা 'রাজস্থানের চৌমু বিধানসভা ক্ষেত্রের একটি গ্রাম' থেকে সংগৃহীত।

"... যেহেতু ভারতে, বর্তমান প্রবণতা ধারাবাহিকভাবে চলছে... সুতরাং একটি স্থিতিশীল সামাজিক কাঠামো গণতান্ত্রিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা এবং কর্তৃত্বের একমাত্র বিকল্প সেনাবাহিনী .... একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও বিকাশশীল ভারত নির্মাণের উদ্যেগ ইতোমধ্যেই ব্যর্থ হতে শুরু করেছে।"

নেভিল ম্যাক্সওয়েল 'ইন্ডিয়া'স ডিসইন্টিগ্রেটিং ডেমোক্রেসি (India's Disintegrating Democracy)' নামে একটি প্রবন্ধ ১৯৬৭ সালে লন্ডন টাইমসে প্রকাশিত।

কংগ্রেস বিরোধীরা অনুধাবন করতে শুরু করেন যে নিজেদের মধ্যে ভোট ভাগাভাগির কারণেই কংগ্রেস এখনো পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে আছে। সুতরাং মতাদর্শগত ও কর্মতৎপরতাজনিত বিশাল পার্থক্য থাকা সত্বেও বিরোধী দলসমূহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে জোটবদ্ধ হতে থাকে এবং নির্বাচনের সময় আসন ভাগাভাগিতে সহমতের ভিত্তিতে পরস্পরকে মেনে নিতে শুরু করে। তারা এটা অনুধাবনে সক্ষম হয়েছিল যে ইন্দিরা গান্ধির অনভিজ্ঞতা এবং দলের অভ্যন্তরীণ কলহ কংগ্রেসকে দুর্বল করার জন্য তাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রামমনোহর লোহিয়া প্রদত্ত কৌশলগত তত্ত্বের নাম হলো 'অকংগ্রেসিবাদ' (non-Congressism)। এই তত্ত্বের স্বপক্ষে লোহিয়া একটি যুক্তিও উপস্থাপন করেছিলেন। যেমন– কংগ্রেস শাসন ছিল অগণতান্ত্রিক এবং দরিদ্র ও সাধারণ জনগণের স্বার্থ বিরোধী; সুতরাং, কংগ্রেস বিরোধী সকল দলের জন্য জনমুখী গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এখন অপরিহার্য কর্তব্য।

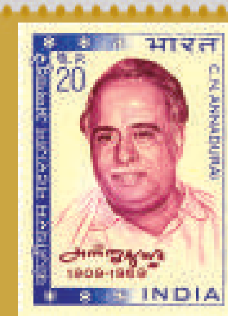

সি. নটরাজন আন্নাদুরাই (১৯০৯-১৯৬৯) : ১৯৬৭ সাল থেকে মাদ্রাজের (তামিলনাড়ু) এর মুখ্যমন্ত্রী; একজন সাংবাদিক, জনপ্রিয় লেখক এবং সুবক্তা; শুরুতেই মাদ্রাজ প্রদেশের জাস্টিস দলের সাথে যুক্ত ছিলেন; পরবর্তীতে (১৯৩৪) দ্রাবিড় কাজাগাম (Dravid Kazagham) দলে যোগদান করে; ১৯৪৯ সালে ডি.এম.কে (DMK) নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন; দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রচারক, তিনি মাদ্রাজে হিন্দি ভাষা আরোপের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন এবং হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে সংগঠিত বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন; রাজ্যের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন।

রামমনোহর লোহিয়া (১৯১০-১৯৬৭) : সমাজতান্ত্রিক নেতা ও চিন্তাবিদ; স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের (Congress Socialist Party) প্রতিষ্ঠাতাদের একজন; দলের মধ্যে বিভাজনের পর সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা এবং পরবর্তীতে সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা; ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত লোকসভার সদস্য; মেনকাইন্ড (Mankind) এবং জন (Jan) এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; ইউরোপের বাইরে উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের একজন মৌলিক প্রতিষ্ঠাতা; রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নেহরুর প্রতি প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক; অকংগ্রেসি ভাবনার পৃষ্ঠপোষক; পিছিয়ে পরা জাতিগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণের পক্ষপাতি এবং ইংরেজি বিরোধী প্রচারক;

নির্বাচনী রায় (Electoral verdict)

বিশাল গণঅসন্তোষ ও রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণে লোকসভার জন্য চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এবং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম নেহরু বিহীন কংগ্রেস নির্বাচনের মুখোমুখী হয়।

জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস দুক্ষেত্রেই ভীষণভাবে ধাক্কা খায়। অনেক সমকালীন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা এই নির্বাচনী ফলাফলকে 'রাজনৈতিক ভূমিকম্প' (political earthquake) হিসাবে আখ্যায়িত করে। কংগ্রেস কোনোরকমে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু ১৯৫২ সালের পর থেকে এটা ছিল কংগ্রেসের সর্বনিম্ন আসনে জয় এবং ভোট প্রাপ্তি। ইন্দিরা গান্ধির ক্যাবিনেটে অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রীদের অর্ধেকই পরাজিত হয়েছিল এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরাজিত মন্ত্রীরা হলেন তামিলনাড়ুর কামরাজ, মহারাষ্ট্রের এম.কে. পাতিল, পশ্চিমবঙ্গের অতুল্য ঘোষ এবং বিহারের কে.বি. সহায়।

বিধানসভার নির্বাচনী পরিণাম ১৯৬৭

কংগ্রেস ১৯৬৭ সালের বিধানসভার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল

কংগ্রেস ১৯৬৭ সালের বিধানসভার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি।

রাজস্থান (কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি কিন্তু অন্যান্য দলের সহায়তায় সরকার গঠন করে)

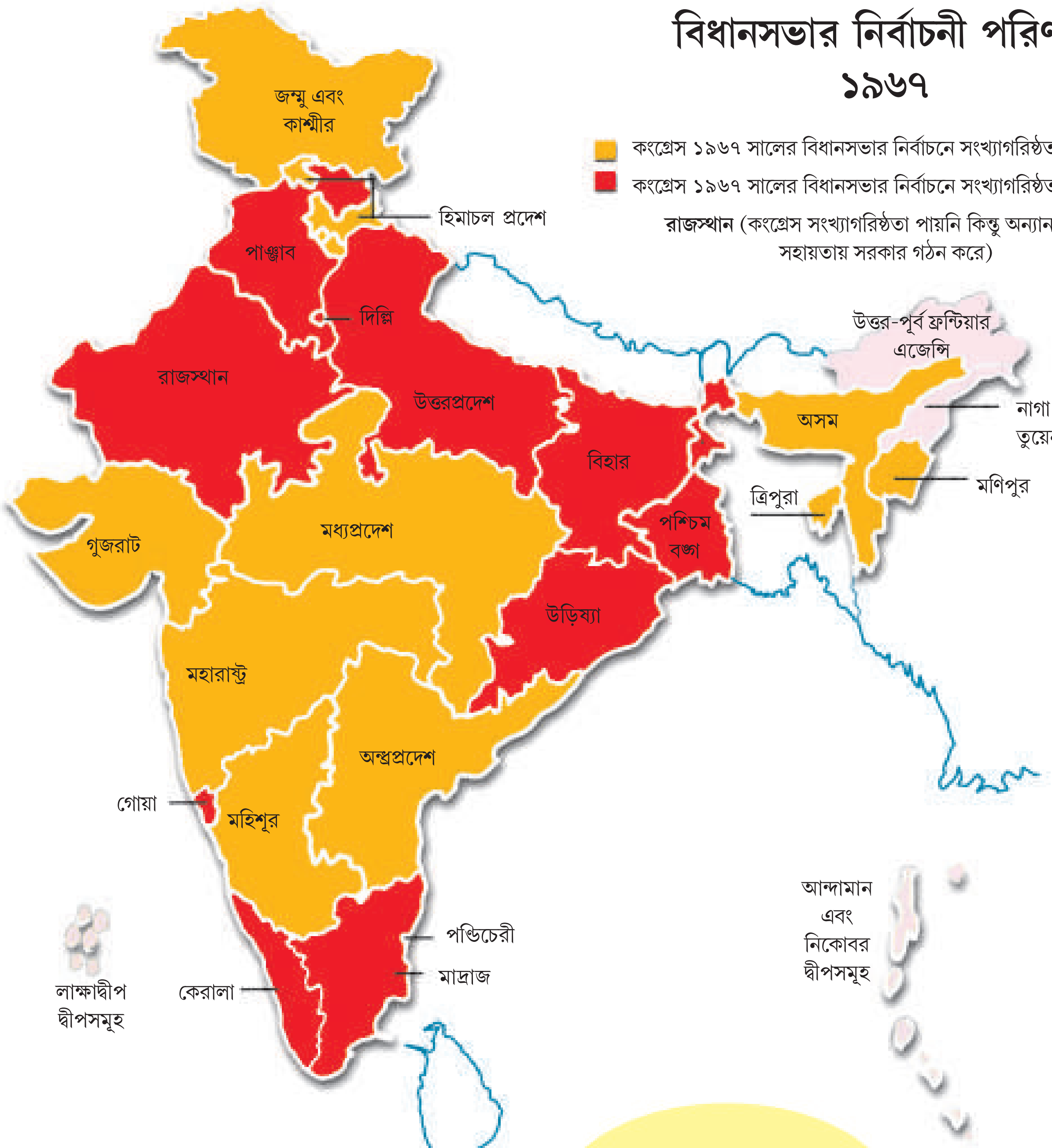

দ্রষ্টব্য : উদাহরণ হিসাবে প্রদত্ত এই মানচিত্রটি ক্ষেত্র বা এলাকার পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটিকে ভারতের প্রমাণিক বাহ্যিক সীমারেখা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত হবে না।

রাজ্যস্তরে সংগঠিত রাজনৈতিক পরিবর্তনের নাটকীয় রূপ তোমাদের কাছে আরো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে। সাত-সাতটি রাজ্যে কংগ্রেস তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। অন্য দুটি রাজ্যে দলবদলজনিত সমস্যার কারণে কংগ্রেস সেখানে সরকার গঠন করতে পারেনি। যেসকল রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়— এমন নয়টি রাজ্য ভারতের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত। যেমন– পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ এবং কেরালা। মাদ্রাজ প্রদেশে (বর্তমান নাম তামিলনাড়ু) দ্রাবিড়া মুন্নেত্রা কাজাগাম (DMK) নামক একটি নতুন দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা দখল করে। হিন্দি ভাষাকে এই রাজ্যের উপর সরকারি ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা যে আন্দোলন শুরু করেছিল ডি.এম.কে তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও এর সার্বিক নেতৃত্ব প্রদান করে। এই আন্দোলনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠা বিশাল জনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ডি.এম.কে ক্ষমতা অর্জন করে। এই প্রথম কোনো অকংগ্রেসি রাজনৈতিক দল রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতা দখল করে। অন্য আটটি রাজ্যে বিভিন্ন অ-কংগ্রেসি রাজনৈতিক দলগুলো একজোট হয়ে সরকার প্রতিষ্ঠা করে। একসময় জনপ্রিয় একটি কথা মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত তা হল একজন মানুষ দিল্লি থেকে হাওড়া পর্যন্ত রেলে ভ্রমণ করলে এমন একটি রাজ্য খুঁজে পেতো না যেখানে কংগ্রেস এককভাবে সরকার পরিচালনা করছে। ক্ষমতায় শুধুমাত্র কংগ্রেসকে দেখতে অভ্যস্ত লোকেদের কাছে এটা ছিল এক আশ্চর্য অনুভূতি। তাই বলে কংগ্রেসের আধিপত্য কি শেষ হয়ে গিয়েছিল?

ঝুলন্ত বিধানসভা এবং জোট সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একান্ত অস্বাভাবিক বিষয়টি কি? আমরা সবসময়ই এই ব্যবস্থাগুলো লক্ষ্য করে থাকি।

কোয়ালিশন বা জোট (Coalitions)

১৯৬৭ সালে নির্বাচনের পর কোয়ালিশন বা জোট ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। ওই নির্বাচনে কোনো দলই যখন এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় তখন বিবিন্ন অ-কংগ্রেসি দল মিলেমিশে যৌথ বিধায়ক দল গঠন করে (হিন্দিতে সংযুক্ত বিধায়ক দল বা SVD) এবং তারা অ-কংগ্রেসীয় সরকারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। এ কারণেই ওইসব সরকারকে এস.ভি.ডি সরকার বলা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দলগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত কোনো সামঞ্জস্য থাকত না। উদাহরণস্বরূপ বিহারে গঠিত জোট সরকারের অংশ ছিল দুটি সমাজতান্ত্রিক দল এসএসপি (SSP) এবং পিএসপি (PSP)। পাশাপাশি এই জোটের অংশ ছিল সিপিআই (CPI) এবং জনসংঘের মতো দল। অনুরূপভাবে পাঞ্জাবে এই ধরনের সরকারকে বলা হতো 'পপুলার ইউনাইটেড ফ্রন্ট' (Popular United Front), যেখানে আকালী দলের অন্তর্ভুক্ত দুই প্রতিপক্ষ গোষ্ঠী সন্ত (Sant) এবং মাস্টার গ্রুপ (Master group), পাশাপাশি সিপিআই (CPI) ও সিপিআই (এম) (CPI(M)), এসএসপি (SSP), দি রিপাবলিকান পার্টি এবং ভারতীয় জনসংঘও এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

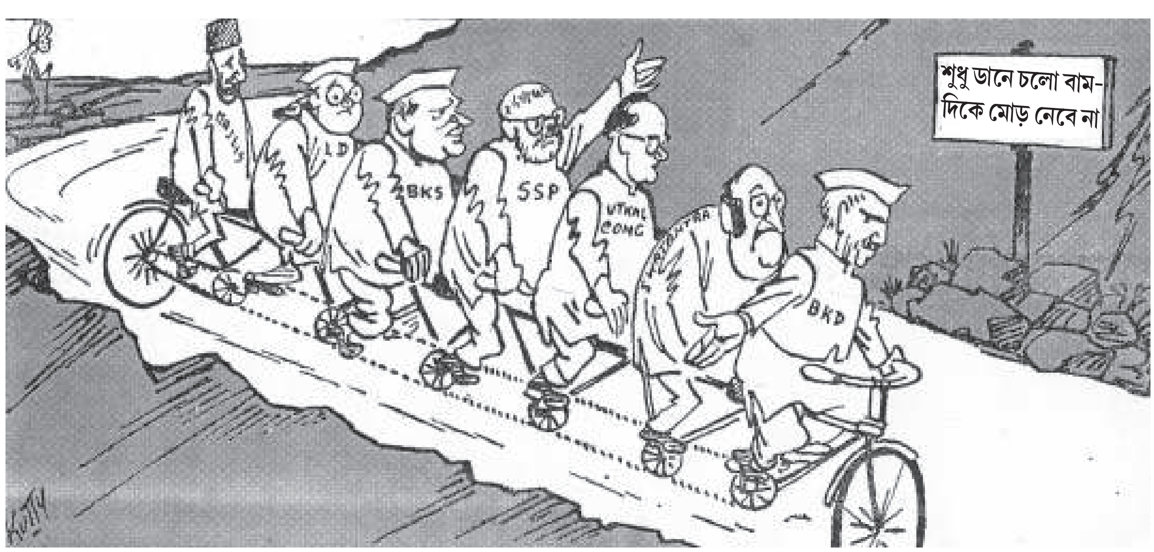

Credit: Kutty

একজন ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী ১৯৭৪ সালে একটি অ-কমিউনিস্ট যুক্তফ্রন্ট গঠনের ক্ষেত্রে চরণ সিং-এর উদ্যোগকে এখানে চিত্রায়িত করেছেন।

দলবদল বা দলত্যাগ (Defection)

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর চলমান রাজনীতির জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল দলত্যাগীদের ভূমিকা, যা কোনো সরকার ভাঙ্গা-গড়ার ক্ষেত্রে উপকরণ হিসাবে কাজ করতো। দলত্যাগী বলতে ওই নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বোঝায় যিনি একটি নির্দিষ্ট দলের পক্ষে নির্ধারিত প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং জয়ী হয়ে নিজ দল ছেড়ে অন্য দলে যোগদান করে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর অসন্তুষ্ট কিছু কংগ্রেস বিধায়ক তিনটি প্রদেশে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রদেশগুলো হলো হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ, ওই সময়ে ঘন ঘন দলবদল এবং পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক আনুগত্যতাকে জনগণ জনপ্রিয়ভাবে 'আয়া রাম, গয়া রাম' নাম দিয়েছিলেন।

'আয়া রাম, গয়া রামের' কাহিনী (The story of 'Any Ram, Gaya Ram')

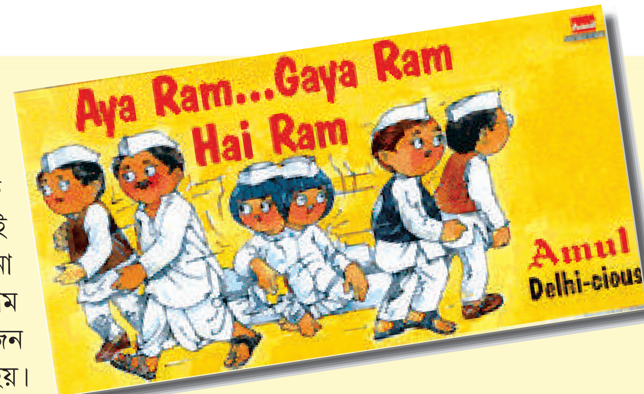

আয়া রাম, গয়া রাম'– এই প্রবাদটি ভারতের রাজনৈতিক অভিধানে এক সময় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই প্রবাদটি বিধায়কদের দ্বারা ঘন ঘন দলবদলের অভ্যাসকে বর্ণনা করে। এই প্রবাদের পারিভাষিক অর্থ হলো রাম এলো এবং রাম গেলো। ১৯৬৭ সালে হরিয়ানার গয়ালাল নামের একজন বিধায়কের দল বদলকে কেন্দ্র করে এই প্রবাদটির উৎপত্তি হয়। কারণ তিনি রাতারাতি তিনবার দলবদল করেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেস থেকে যুক্তফ্রন্টে পরে যুক্তফ্রন্ট থেকে আবার কংগ্রেসে যোগদান করেন। কিন্তু কংগ্রেসে দ্বিতীয়বার যোগদানের নয় ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় যুক্তফ্রন্টে যোগদান করেন এটা বলা হয় যে যখন গয়ালাল যুক্তফ্রন্ট থেকে কংগ্রেসে যোগদান করে তখন সেখানকার কংগ্রেস নেতা রাও বিরেন্দ্র সিং তাকে চণ্ডীগড়ে অবস্থিত সংবাদ মাধ্যমের সামনে নিয়ে আসেন এবং ঘোষণা করেন "গয়া রাম এখন আয়ারাম"।

আয়ারাম গয়ারাম নামক প্রবাদের মধ্যে গয়ালালের দলবদলের কীর্তি অমরত্ব লাভ করে। পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দলবদলের প্রবণতা রোধ করার চেষ্টা করা হয়।

কংগ্রেসে বিভাজন (Split in the Congress)

আমরা দেখেছি যে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস নামমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন থাকলেও অনেক রাজ্যেই পরাজিত হয়। এখানে ফলাফলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেসকে পরাজিত করা সম্ভব। যদিও কংগ্রেসের যোগ্য বিকল্প হিসাবে তখনো কোনো দল আবির্ভূত হতে পারেনি। বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত অ-কংগ্রেসি জোট সরকার বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। তারা সেখানে কিছুদিন সরকার পরিচালনা করার পরেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। এই পরিস্থিতিতে হয় নতুন কোনো জোট সরকার গঠন করে অথবা সেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।

ইন্দিরা বনাম 'সিন্ডিকেট' (Indira Vs. the 'Syndicate')

বিরোধীরা আসলে ইন্দিরা গান্ধির সামনে বড়ো সমস্যা ছিল না। তারজন্য সমস্যা ছিল নিজ দলেরই অভ্যন্তরে দলের মধ্যে গড়ে উঠা 'সিন্ডিকেট' এর অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে তাঁকে মানসিক ও

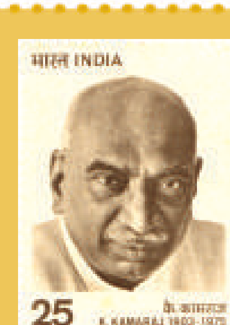

কে.কামরাজ (১৯০৩-১৯৭৫) : স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কংগ্রেসে সভাপতি; মাদ্রাস (বর্তমানে তামিলনাড়ু) প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী; শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত; সমগ্র মাদ্রাস প্রদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন; বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা চালু করেন; ১৯৬৩ সালে যুব কর্মকর্তাদেরকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের সকল প্রবীণ সদস্যকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পদত্যাগ করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন; তাঁর এই প্রস্তাবটি 'কামরাজ পরিকল্পনা' হিসাবে খ্যাতি লাভ করে।

কংগ্রেস ‘সিন্ডিকেট (The Congress ‘Syndicate’)

এখানে সিন্ডিকেট বলতে কংগ্রেসের এমন একটি গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে যারা দলীয় সংগঠনের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং তখনকার কংগ্রেস দলের সভাপতি কে কামরাজ। এই গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা ছিলেন বোম্বের এস.কে. পাতিল (বোম্বে পরবর্তীতে মুম্বাই), মহিশূরের (পরবর্তী কর্নাটক) এস নিজালিংগাপ্পা, অন্ধ্রপ্রদেশের এন. সঞ্জিবা রেড্ডি এবং পশ্চিমবঙ্গের অতুল্য ঘোষ। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং ইন্দিরা গান্ধি উভয়েই পরবর্তীতে নিজেদের অবস্থান এই সিন্ডিকেটের সমর্থনের মাধ্যমে ধরে রেখেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম মন্ত্রিপরিষদে তাঁরাই ছিলেন সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বক্তিবর্গ। যে-কোনো ধরনের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁরাই ছিলেন প্রায় শেষ কথা। বিভাজনের পর সিন্ডিকেটের নেতারা এবং তাদের অনুগত ব্যক্তিরা কংগ্রেস (O)-তে থেকে যান। তবে ইন্দিরা গান্ধির প্রভাবিত কংগ্রেস (R) জনপ্রিয়তার পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়। যার ফলে ১৯৭১-এর পর এই সব প্রভাবশালী সিন্ডিকেট সদস্যরা ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁদের ক্ষমতা ও ভাবমূর্তি প্রায় সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে।

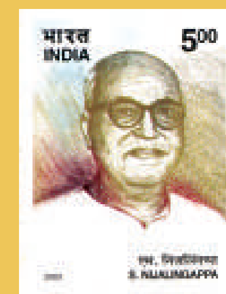

এস. নিজালিংগাপ্পা (১৯০২-২০০০) : কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা; গণপরিষদের সদস্য; লোকসভার সদস্য; মহিশূরের (কর্ণাটক) মুখ্যমন্ত্রী; আধুনিক কর্ণাটকের স্থপতি হিসাবে পরিচিত; ১৯৬৮ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি।

কৌশলগতভাবে লড়তে হয়েছে। সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে নির্বাচিত করে ইন্দিরা গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সিন্ডিকেট গোষ্ঠী ভূমিকা রেখেছিলেন। সিন্ডিকেট নেতারা আশা করেছিলেন যে, ইন্দিরা গান্ধি তাদের পরামর্শনুসারে কাজ করবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ইন্দিরা গান্ধি দল ও সরকারের মধ্যে নিজের একটি স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি ও অবস্থান গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। তিনি ইচ্ছানুসারী দলের বাইরে থেকে পছন্দের ও বিশ্বাসী লোকদের পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তিনি তার বলয় থেকে সিন্ডিকেট গোষ্ঠীকে দূরে সরিয়ে দেন।

করপুরী ঠাকুর (১৯২৪-১৯৮৮) : ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত এবং ১৯৭৭ সালের জুন মাস থেকে ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বিহারের মুখ্যমন্ত্রী; স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজতান্ত্রিক নেতা; শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় নেতা; রামমনোহর লোহিয়ার অবিচল অনুসারী; জয়প্রকাশ নারায়নের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের অংশীদার; বিহারে দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে থাকাকালীন সময়ে পশ্চাতপদ শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার কারণে খ্যাতি লাভ করেন। ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে তীব্র বিরোধী ছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধি দুই ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করেছিলেন। একটি সমস্যা ছিল সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা ও অন্যটি ছিল ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরায় ফিরে আনার জন্য কাজ করা। ফলে তিনি একটি অত্যন্ত সাহসী কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি সাধারণ একটি ক্ষমতার সংগ্রামকে মতাদর্শগত সংগ্রামে পরিণত করেন। সরকারি নীতিমালাকে সমাজতান্ত্রিক রূপ দিতে তিনি অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৬৭ সালে তিনি কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিকে দশ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেন। এই কর্মসূচিগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্যাংক ব্যবস্থার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ বিমা ব্যবস্থার জাতীয়করণ, শহুরে সম্পদ ও আয়ের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ, খাদ্যশস্যে গণবণ্টন, ভূমি সংস্কার, গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই

কর্মসূচিগুলোর প্রতি নানাহ আপত্তি থাকা সত্বেও সিন্ডিকেটের অন্তর্ভুক্ত নেতারা এই পরিকল্পনার অনুমোদন দিতে বাধ্য হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ১৯৬৯ (Presidential Election, 1969)

ইন্দিরা গান্ধি এবং সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর মধ্যেকার মতো পার্থক্যজনিত বিবাদ ১৯৬৯ সালে একেবারে প্রকাশ্যে চলে আসে ভারতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর সে বছর রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হয়ে পড়ে। মিসেস গান্ধির আপত্তি সত্বেও সিন্ডিকেট গোষ্ঠী তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিরোধী তথা সে সময়ের লোকসভার অধ্যক্ষ এন. সঞ্জিবা রেড্ডিকে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসের দলীয় নির্বাচনী প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দিতে সক্ষম হোন। প্রতিশোধ হিসাবে ইন্দিরা গান্ধি তখন সেই সময়ে উপরাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিতে রাজি করাতে সমর্থ হোন। তাছাড়া তিনি অনেক বড় ধরনের এবং জনপ্রিয় কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। যেমন চৌদ্দটি বেসরকারি ব্যাংককে জাতীয়করণ এবং 'ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহ ভাতা'-র (Privy purse) বা প্রাক্তন নৃপতি কিংবা রাজপুত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধাজনিত ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন। ওই সময়ে

ভি. ভি. গিরি (১৮৯৪-১৯৮০) : ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি; অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কংগ্রেস দলের সক্রিয় কর্মী এবং জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা; সিলোনে (শ্রীলঙ্কার) ভারতের হাইকমিশনার হিসাবে নিযুক্ত; কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে শ্রমমন্ত্রী; উত্তর প্রদেশ, কেরালা এবং মহিশূরের (কর্ণাটক) রাজ্যপাল; ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি এবং জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি; উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ; রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির সমর্থন পেয়েছিলেন।

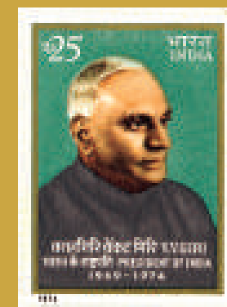

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে ভি.ভি. গিরি (মালা পরিহিত বক্সার) জয়ী হওয়ার পর 'দ্যা লেফ্‌ট হুক' প্রকাশিত হয়। ব্যাঙ্গচিত্রে লিজালিংগপ্পাকে দেখা যাচ্ছে (তাঁর হাঁটুর কাছে)।

> ইতিহাস..... এমন কতগুলো দুঃখজনক ঘটনার দ্বারা পরিপূর্ণ যে, যেখানে জনসমর্থনের প্রবল প্রতিপত্তিতে অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের সফলতার ছত্রছায়ায় পালিত একজন নেতা হীন স্বার্থপরতার মোহে আবদ্ধ হতে থাকে এবং চরিত্রহীন চাটুকারদের পরামর্শ অনুসারে জীবনযাপন করে।....

১১ নভেম্বর ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধিকে দল থেকে বহিষ্কার করে এস নিজালিংগাপ্পার লেখা চিঠি।

মোরারজি দেশাই ভারতের উপ- প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ছিলেন। উল্লেখিত দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে এতটাই বিরোধ দেখা দেয় যে শেষ পর্যন্ত মোরারজি দেশাই সরকার থেকে বেড়িয়ে আসেন।

কংগ্রেস দলে এ ধরনের মত পার্থক্য পূর্বেও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এবার উভয় গোষ্ঠীই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে শক্তি প্রদর্শনে নেমেছিলেন। সেই সময়ের কংগ্রেস দলের সভাপতি এস. নিজালিংগাপ্পা 'হুইপ' জারি করে দলের সকল সংসদ ও বিধানসভার সদস্যদের দলীয় প্রার্থী সঞ্জিবা রেড্ডির পক্ষে ভোট প্রদান করার নির্দেশ দেন। ওই সময় ইন্দিরা গান্ধির সমর্থক গোষ্ঠী এ.আই.সি.সি (AICC)-র বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য বিধি অনুসারে অনুরোধ (requsitioned) করেন (এইজন্য এই গোষ্ঠী রিকুইজিশনিস্ট (requisitionists) হিসাবে পরিচিত) কিন্তু এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়। ভি.ভি. গিরিকে গোপনে সমর্থন করার পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সকলকে বিবেক ভোট (conscience vote) প্রদান করার জন্য আবেদন করেন। এর অর্থ ছিল সাংসদ এবং বিধানসভার সদস্যরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোট প্রদান করতে পারবেন। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থী সঞ্জিবা রেড্ডিকে পরাজিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে ভি.ভি. গিরিই জয়লাভ করেন।

দলীয় প্রার্থীর এহেন পরাজয়ের ফলে কংগ্রেস দলে স্পষ্ট বিভাজন দেখা দেয়। দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধি দাবি করেন যে তাঁর সমর্থিত দলই প্রকৃত কংগ্রেস। ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে সিন্ডিকেট পরিচালিত গোষ্ঠী কংগ্রেস (অরগানাইজেশন) এবং ইন্দিরা গান্ধি পরিচালিত গোষ্ঠী কংগ্রেস (রিকুইজিশনিস্ট) নামে পরিচিত লাভ করে। এই দুটি গোষ্ঠী যথাক্রমে পুরানো কংগ্রেস ও নতুন কংগ্রেস নামেও পরিচিতি লাভ করে। ইন্দিরা গান্ধি এই বিভাজনকে সমাজতন্ত্রবাদী ও সংরক্ষণশীলবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাছাড়া তিনি এই বিভাজনকে দরিদ্রমুখি এবং বিত্তশালীমুখী হিসাবেও আখ্যায়িত করেন।

নৃপতিদের ব্যয় নির্বাহভাতার বিলুপ্তিসাধন (Abolition of Privy Purse)

প্রথম অধ্যায়ে তোমরা রাজন্য শাসিত রাজ্যগুলোর ভারতের সাথে সংযুক্তিকরণের বিষয় অধ্যয়ন করেছ। এই সংযুক্তিকরণ এমন একটি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল যে পূর্বেকার শাসক পরিবারের সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হিসাবে থেকে যাবে, বংশানুক্রমে তারা সরকারি বিশেষ সুবিধা ও অনুদান পেতে থাকবে। এই অনুদান সংযুক্ত রাজ্যের আকার ও রাজস্বের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে। এই অনুদানকে প্রিভি পার্স (Privy Purse) বা নৃপতিদের বিশেষ নির্বাহ ভাতা বলা হয়। সংযুক্তিকরণের সময়কালে এই বিশেষ সুবিধা প্রদান বিষয়ে তেমন কোনো সমালোচনা হয়নি, কারণ সেই সময়ে রাজ্যগুলোর সংযুক্তকরণ ও তাদের সংহতিকরণই ছিল মূল লক্ষ্য।

যদিও এ ধরনের বংশানুক্রমিক ভাতা ভারতীয় সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় কিংবা সমতার আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। এ ব্যাপারে নেহরু অনেক সময়েই তার অসন্তুষ্টির কথা ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর ইন্দিরা গান্ধিও এই বিশেষ সুবিধা বাতিল করার দাবির প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু মোরারজি দেশাই-এর মতে এই দাবি ছিল মানবিকভাবে অন্যান্য কারণ এমনটা করলে তা হবে ওই সকল 'রাজন্য পরিবারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।'

সরকার এই বিশেষ সুবিধার বিলুপ্তিসাধনের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে একটি সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিল। তবে এই বিল রাজ্যসভায় পাস হয়নি। এর ফলে সরকার এই সম্পর্কিত একটি অধ্যাদেশ জারি করলে সুপ্রিম কোর্টে তা খারিজ হয়ে যায়। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় লাভ করার ফলে সংবিধান সংশোধন করে প্রিভি পার্সের সুবিধা বাতিল করার ক্ষেত্রে সকল প্রকারের আইনি বাধা দূর করা হয়।

THE HINDUSTAN TIMES

New Delhi Saturday August 16 1969

Eighteen Paise

PM INSISTS ON FREE VOTE

Congress splits on historic day

No-confidence move against Nijalingappa

Hindustan Times Correspondent

States trend shows no major change

A decision to stand by the mandate and an equally pronounced reiteration of the demand for a free vote in the Presidential poll marked the final phase of the campaign by rival Congress factions in the States. The following developments were reported on Thursday by Hindustan Times Correspondents:

JEWELLERY
PEARLS, EMERALDS
RUBIES NAVRATAN
NEW DESIGNS
GIRDHARILAL

KUTAB MINAR
ARTIST PENCILS

Credit: Vijayan, Shankar's Weekly

20 July 1969

১৯৬৯ সালে উত্থিত কংগ্রেস দলের নেতাদের মধ্যেকার বিবাদের প্রতিচ্ছবি এভাবেই একজন ব্যাঙ্গাচিত্র শিল্পী উপস্থাপন করছেন।

১৯৭১ সালের নির্বাচন এবং কংগ্রেসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (The 1971 Election and Restoration of Congress)

কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরীণ বিভাজন ইন্দিরা গান্ধি পরিচালিত সরকারকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে। কিন্তু তার পরেও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং ডি.এম.কে দলের ইস্যুভিত্তিক সমর্থনের কারণে সরকার তার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। এই সময়ে সরকার সচেতনভাবে তার সমাজতান্ত্রিক চরিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। আবার এই সময়কালেই ইন্দিরা গান্ধি ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত চলমান আইনগুলোকে সঠিকভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিশাল প্রচারাভিযান শুরু করেন। তাছাড়া মালিকানার ক্ষেত্রে জমির ন্যূনতম কিংবা সর্বোচ্চসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে সচেষ্ট হোন। অন্য রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য তিনি সংসদে তার দলের অবস্থান মজবুত করতে উদ্যোগী হন। তাছাড়া তার জনমুখী কর্মসূচিগুলোর পক্ষে জনসমর্থন আদায় করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে লোকসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। এটা ছিল ইন্দিরা গান্ধির একটি বিস্ময়কর ও সাহসী পদক্ষেপ। এইভাবেই ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের লোকসভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা (The Contest)

নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্রেস (R) এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তাছাড়া নতুন হিসাবে কংগ্রেস (R) ছিল একটিমাত্র গোষ্ঠীর সংগঠন। যা প্রথম থেকেই দুর্বল ছিল প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেছিলেন যে মূল সাংগঠনিক শক্তি ছিল কংগ্রেস (O) এর অধীন। ইন্দিরা গান্ধির অবস্থানকে আরও দুর্বল করার জন্য প্রায় সব বড় বড় অ-কমিউনিস্ট ও অ-কংগ্রেসি দলগুলো মিলে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে, যা গ্র্যান্ড এলায়েন্স (Grand Alliance) বা বৃহৎ জোট হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এস এস পি, পি এস পি, ভারতীয় জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি এবং ভারতীয় ক্রান্তি দল এই জোটের ছত্রছায়ায় চলে আসে। অন্যদিকে ক্ষমতাশীল দলের একমাত্র জোটসঙ্গী ছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি।

গরিবী হঠাও স্লোগানের প্রায় চার দশক পরেও আমাদের চতুপার্শে সীমাহীন গরিবী এখনো বিরাজমান; এই স্লোগানটি কি শুধুই নির্বাচনী চমক ছিল?

তার পরেও নতুন কংগ্রেসের এমন কিছু ভিত্তি ছিল যা শক্তিশালী পুরানো কংগ্রেস দলের ছিল না। যেমন- নতুন কংগ্রেসের হাতে ছিল নির্দিষ্ট ইস্যু, এজেন্ডা এবং ইতিবাচক স্লোগান। কিন্তু পুরানো কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত বৃহৎ জোটের হাতে সামঞ্জস্য বা সংগতিপূর্ণ কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না। ইন্দিরা গান্ধি বলেছিলেন যে বিরোধী জোটের একটাই কর্মসূচি তা হলো 'ইন্দিরা হটাও' (Remove Indira)। বিপরীতে তিনি ইতিবাচক কর্মসূচির অংশ হিসাবে যে বিখ্যাত স্লোগান চালু করেন, তা ছিল 'গরিবী হটাও'। নির্বাচনে তার দ্বারা প্রচারিত কর্মসূচিগুলো ছিল সরকারি পরিসেবার ক্ষেত্রে বিকাশ, গ্রামীণ এলাকায় জমির মালিকানা এবং শহুরে সম্পত্তির উপর মালিকানার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ সম্পর্কিত আইন চালু করা, সুযোগ সুবিধা ও আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যতা দূর করা এবং প্রিভি পার্স প্রথার বিলুপ্তিসাধন করা। গরিবী হটাও কর্মসূচির দ্বারা ইন্দিরা গান্ধি সুবিধা বঞ্চিত জনগণ, বিশেষ করে ভূমিহীন শ্রমজীবি মানুষ, দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, মহিলা এবং বেকারদের সমর্থন আদায়ের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গরিবী হটাও স্লোগান এবং উল্লেখিত কর্মসূচিগুলো ছিল সারা দেশে সমর্থনের ভিত্তি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধির রাজনৈতিক কৌশল।

ফলাফল এবং তারপর (The outcome and after)

নির্বাচনের ঘোষণার সিদ্ধান্তের মতো ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলও ছিল বিস্ময়কর ও নাটকীয়। কংগ্রেস (R) এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির জোট এই নির্বাচনে বিগত চারটি সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি ভোটে ও আসনে বিপুলভাবে জয়লাভ করে। এই জোট ৪৮.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে লোকসভার ৩৭৫টি আসনে জয়লাভ করে। ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস (R) প্রায় ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে একাই ৩৫২টি আসন দখল করে। বিপরীত দিকে বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত নেতাদের দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেস (O) ইন্দিরা গান্ধি পরিচালিত কংগ্রেস (R)-এর প্রাপ্ত ভোটের এক চতুর্থাংশেরও কম ভোট পেয়ে মাত্র ১৬টি আসন দখল করে। এর ফলশ্রুতিতে কংগ্রেস (R) 'প্রকৃত' কংগ্রেস রূপান্তরিত হয়ে ভারতের রাজনীতিতে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। গ্র্যান্ড এলায়েন্স বা বিশাল জোট এই নির্বাচনে চরমভাবে ধরাশায়ী হয়। সম্মিলিতভাবে তাদের আসন সংখ্যা ৪০ এরও কম সংখ্যায় এসে দাঁড়ায়।

১৯৭১ সালের নির্বাচনী ফলাফলের 'চমৎকার পরিসমাপ্তিকে' ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী এভাবেই উপস্থাপন করেছেন। মাঠের খেলোয়ারগণ হলেন তৎকালীন বিরোধী নেতাদের প্রতিচ্ছবি।

Credit: R. K. Laxman in the Times of India

১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনের অব্যাহতি পরে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) ভয়ানক রাজনৈতিক ও সামরিক সংকট দেখা দেয়। চতুর্থ অধ্যায়ে তোমরা জানতে পেরেছো যে ১৯৭১-এর নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তানের সংকট থেকে উদ্ভূত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে। এসব ঘটনা ইন্দিরা গান্ধির জনপ্রিয়তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমনকী বিরোধী দলের নেতারা পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধির রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন। এর ফলে ১৯৭২ সালে সংগঠিত সবগুলো বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল এককভাবে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে। সেই সময়ে তিনি শুধুমাত্র গরীব এবং সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের রক্ষক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেননি। বরং শক্তিশালী একজন জাতীয়বাদী নেতা হিসাবেও সর্বত্র সমাদৃত হয়েছিলেন। দলের ভিতরে কিংবা বাইরে কোনো বিরোধী শক্তি তাঁর কাছে তখন প্রায় তুচ্ছতুল্য ছিল।

একদিকে লোকসভা অন্যদিকে বিধানসভা এই দুইস্তরের নির্বাচনে অভাবনীয় সফলতার কারণে সারা দেশে কংগ্রেসের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস তখন প্রায় সব রাজ্যেই ক্ষমতাসীন। দেশের বিভিন্ন সামাজিক বর্গেও তিনি বিশাল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। প্রায় চার বছর পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বও তার দলের আধিপত্যের প্রতি সকল প্রকার চ্যালেঞ্জকেই তিনি দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন।

Credit: Kutty

মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির নতুন পদ্ধতিতে একজন ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পীর উৎসাহব্যঞ্জক টিপ্পনী।

পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration)?

তবে এর মানে কি এই যে কংগ্রেসি ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? আসলে ইন্দিরা গান্ধি যা করেছিলেন তার মাধ্যমে পুরানো বা প্রথাগত কংগ্রেস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ইন্দিরা গান্ধি দলকে নতুনরূপে সংগঠিত করেছিলেন। দল এখন অতীতের মতোই জনপ্রিয়। কিন্তু এই দলের রূপ কিছুটা স্বতন্ত্র। এই দল সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তার সাংগঠনিক কাঠামো ছিল যথেষ্ট দুর্বল। নতুন দলে তেমন কোনো বিভাজন পরিলক্ষিত হয়নি। যার ফলে বিভিন্ন বৈচিত্র্যতা, স্বার্থ কিংবা মতভেদের মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন পড়তো না। নির্বাচনে জেতার পর দলটি তখন বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী যেমন– নারী, দলিত, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘুদের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। আর এগুলোই ছিল নতুন কংগ্রেসের প্রকৃত রূপ। ইন্দিরা গান্ধি প্রথাগত কংগ্রেসি চরিত্রকে পরিবর্তন করেই নতুন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অধিক জনপ্রিয় হওয়া সত্বেও নতুন কংগ্রেস পূর্বের মতো সকল প্রকার সংঘর্ষ ও উত্তেজনা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামর্থ অর্জন করতে পারেনি। এই সময়ে কংগ্রেসের অবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও ইন্দিরা গান্ধির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল অভূতপূর্ব, যেখানে গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিষ্ঠার সেরকম কোনো সুযোগ ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় গণবিদ্রোহ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বঞ্চনা নিয়ে গণআন্দোলন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তী অধ্যায়ে তোমরা জানতে পারবে যে কীভাবে এই অবস্থা রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হতে থাকে। এবং কীভাবে দেশের সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধ ও পরিচর্যা নানাহ আশঙ্কার শিকারে পরিণত হয়।

এটা অনেকটাই একটা টেবিলের উপরিভাগ ও পায়া ভেঙে একেই আবার পুরানো টেবিল বলে আখ্যা দেওয়ার মতো! পুরানো এবং নতুন কংগ্রেসের মধ্যে কী কী সাদৃশ্য ছিল?

চলো ছায়াছবিটা দেখি

জঞ্জির

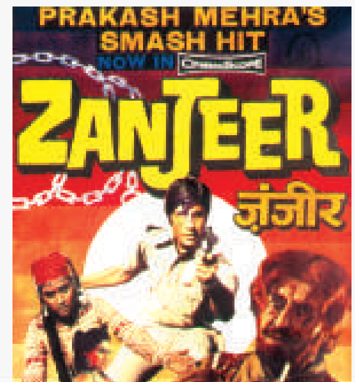

দুর্বৃত্তদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার কারণে বিজয় নামে এক পুলিশ অফিসারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানো হয়। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বিজয় প্রতিশোধ নিতে অঙ্গিকারবদ্ধ হয়। বিভিন্ন বাঁধা বিপত্তি টপকিয়ে বিজয় দুর্বৃত্তদের সম্পূর্ণ পরাভূত করতে সক্ষম হয়। প্রতিশোধ নেওয়ার সময় বিজয়কে বিভিন্ন অসামাজিক ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল। এসময় সে পরিবার ও সমাজে অবস্থিত অন্যান্যদের কাছ থেকেও যথেষ্ট কৌশলগত সহযোগিতা পেয়েছিল।

এই ছবিটি নীতিগত মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং তা থেকে উদ্ভূত গভীর হতাশাকে সুচারুরূপে চিত্রিত করেছিল। তাছাড়া এই ছবিতে একদিকে সামাজিক ব্যবস্থার উদাসীনতা ও অন্যদিকে বিজয়ের আগ্নেয়গিরির সমতুল্য ক্ষোভ এবং প্রতিবাদকেও তুলে ধরা হয়েছে। এই ছবির মাধ্যমে সত্তর এর দশকে নায়কের এমন একটি ভাবমূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল যা পরবর্তীতে ত্যাজদীপ্ত যুবক(angry young man) নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

সাল : ১৯৭৩
পরিচালক : প্রকাশ মেহেরা
চিত্রনাট্য : জাভেদ আক্তার
অভিনয়ে : অমিতাভ বচ্চন, অজিত, জয়া ভাদুরি, প্রাণ

অনুশীলনী

1. নীচের মন্তব্যগুলোর কোনটি/কোনগুলো ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে সঠিক?
   (a) কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করলেও বহু রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যায়?
   (b) কংগ্রেস লোকসভা ও বিধানসভা উভয় নির্বাচনে হেরে যায়।
   (c) লোকসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছিল কিন্তু অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলেমিশে জোট সরকার গঠন করেছিলেন।
   (d) বর্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতা বজায় রেখেছিল?

2. মিলিয়ে দেখাও :

(a) সিন্ডিকেট	i. একজন প্রতিনিধি এমন একটি দলকে ত্যাগ করে যার টিকিটে সে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল।
(c) দলত্যাগ	ii. এমন একটি চিত্তাকর্ষক মন্তব্য বা প্রবাদ যা সহজে জনমতকে আকৃষ্ট করতে পারে।
(b) স্লোগান	iii. বিভিন্ন মতাদর্শের অনুগামী দল জোট বেঁধে কংগ্রেস ও তার নীতির বিরোধিতা করে।
(d) অ-কংগ্রেসীবাদ	iv. কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী।

3. নিম্নে প্রদত্ত স্লোগান বা প্রবাদগুলোর মাধ্যমে তোমরা কোন কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা নেতাদের চিহ্নিত করতে পারো?
   (a) জয় জওয়ান, জয় কিষাণ।
   (c) ইন্দিরা হটাও!
   (b) গরিবী হটাও!

4. ১৯৭১ সালের মহাজোট (Grand Alliance) সম্পর্কিত নীচের কোন মন্তব্যটি সত্য?
   মহাজোট .....
   (a) অ-কমিউনিস্ট ও অ-কংগ্রেসীয় দলগুলোর দ্বারা গঠিত হয়েছিল।
   (c) এর স্পষ্ট রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কর্মসূচি ছিলো?
   (b) সকল অ-কংগ্রেসি দল দ্বারা গঠিত হয়েছিল?

5. কীভাবে একটি রাজনৈতিক দল তার অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে? এখানে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এগুলো নিয়ে ভালো করে চিন্তা করো। এদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো তালিকাভুক্ত করো।
   (a) দলীয় সভাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা।
   (c) সংখ্যাগুরু সদস্যদের কথা মেনে চলা।
   (b) বিভিন্ন ইস্যুতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাভোটির ব্যবস্থা করা।
   (d) দলের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতাদের সাথে আলোচনা করা।

6. নীচের কোনগুলো ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের পেছনে কারণ হিসাবে কাজ করেছিল? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।
   (a) কংগ্রেস দলে সহজাত দক্ষতা সম্পন্ন (Charismatic) নেতা ছিলেন না।
   (c) কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিভাজন।
   (b) আঞ্চলিক, জাতিভিত্তিক এবং সাম্প্রদায়িক দলগুলোর ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তা।

(d) অ-কংগ্রেসীয় দলগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান একতা।

(e) কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরীণ মত পার্থক্য।

7. ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে ইন্দিরা গান্ধি পরিচালিত সরকারের জনপ্রিয়তার পেছনে কী কী কারণ ছিল?

8. ষাট-এর দশকের কংগ্রেস দলের প্রেক্ষাপটে 'সিন্ডিকেট' কথাটির অর্থ কি? কংগ্রেস দলে সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর ভূমিকা কি ছিল?

9. ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দলে বিভাজনের প্রধান প্রধান কারণগুলোকে বিশ্লেষণ করো?

10. লেখাটি পড়ো এবং নিম্নে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

... ইন্দিরা গান্ধি কংগ্রেসকে একটি কেন্দ্রীভূত ও অগণতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত করেন, যদিও পূর্বে তা নেহরু দ্বারা পরিচালিত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক এবং মতাদর্শভিত্তিক দল ছিল। ..... এমনটা হতো না যদি না ইন্দিরা গান্ধি গোটা রাজনীতির চরিত্র বদলে না ফেলতেন। এই নতুন জনপ্রিয়তা ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মতাদর্শকে ... নির্বাচনী প্রকরণে পরিণত করেছিল। ওই সময় এমন কিছু স্লোগান তৈরি করা হয়েছিল যা কখনো সরকারি নীতিমালায় স্থান পায়নি ..... ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে নির্বাচনে জয়লাভ করার পর যখন বিশাল উৎসব চলছে তখনই আসলে আদর্শ রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের মৃত্যু হয়। ..... — সুদীপ্ত কবিরাজ।

(a) লেখকের মতে নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধির মধ্যে কী কী কৌশলগত পার্থক্য ছিল?

(c) কেন লেখক বলেছেন যে সত্তর-এর দশকে কংগ্রেসের মৃত্যু হয়?

(b) কীভাবে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন অন্যদলকে প্রভাবিত করেছিল?

চলো মিলিমিশে করি

- বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দ্বারা সৃষ্ট স্লোগানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করো।
- তুমি কি বিজ্ঞাপন, ইস্তেহার, স্লোগান এবং রাজনৈতিক দলগুলোর বিজ্ঞাপনের মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাও?
- রাজনৈতিক দলগুলোর ভবিষ্যত রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে— তা নিয়ে আলোচনা করো।

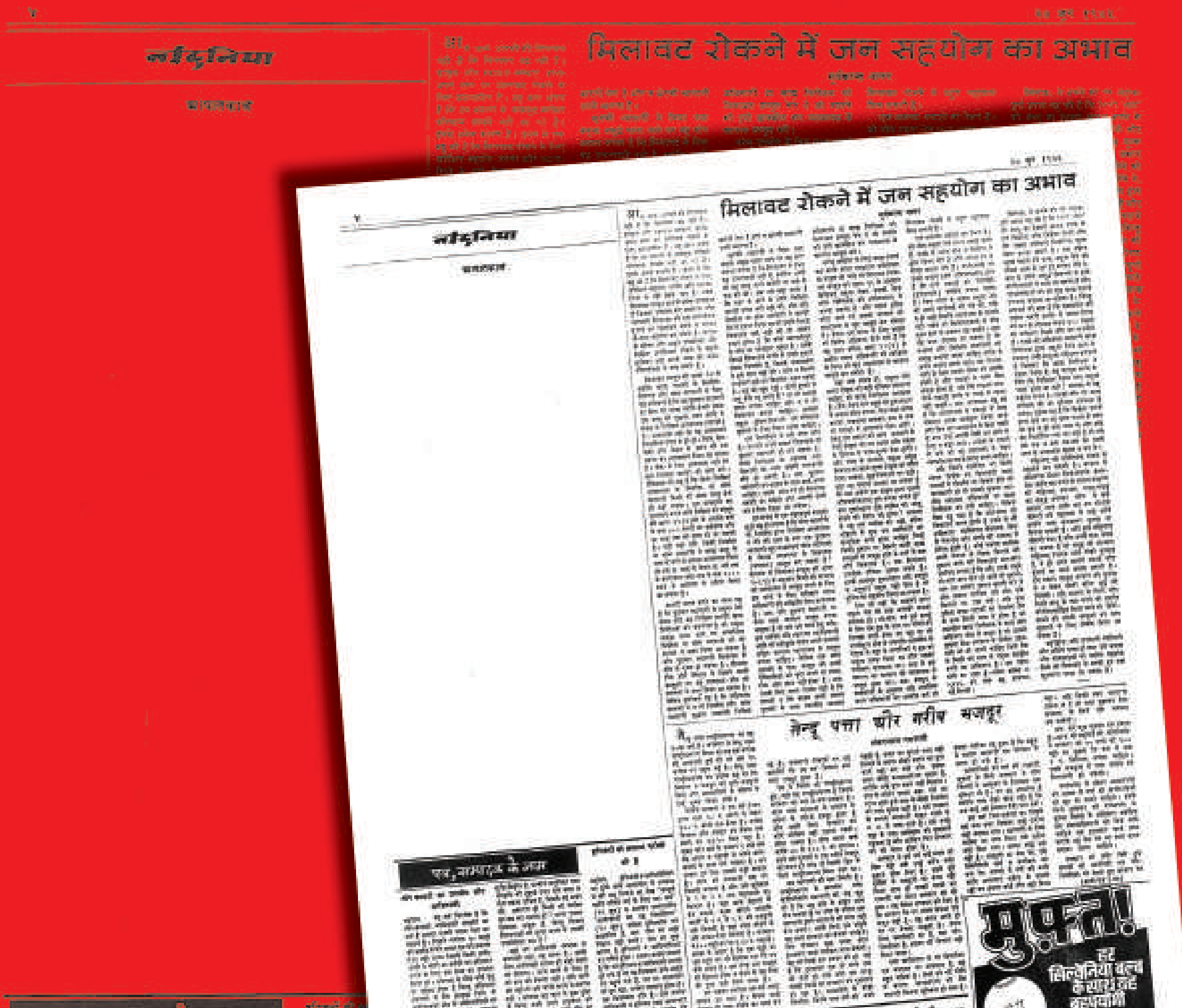

১৯৭৫ সালে ২৭শে জুন তারিখে প্রকাশিত 'নইয়ী দুনিয়া' এর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাটি অন্যান্য দিনের মতো থাকলেও এতে কোনো লেখা ছিল না। জরুরি অবস্থার কারণে এই পৃষ্ঠাটি লেখাশূন্য ছিল। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাগুলোও এখানে খালি রাখা হয়। পরবর্তীতে লেখাশূন্য সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

এই অধ্যায়ে (In this chapter)…

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি যে ১৯৭১ এর পরে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসে। কিন্তু দলের আগের রূপরেখা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ এর মাঝামাঝি সময়ে সংগঠিত অনেকগুলো ঘটনার মধ্য দিয়ে দলের এই পরিবর্তনগত পার্থক্য অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই পরিস্থিতির কারণে ভারতীয় রাজনীতিতেও সংবিধান স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে নানাহ সমস্যা তৈরি হয়। এইসব পরিস্থিতির ক্রমাগত বিপর্যয়ের ফলে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে দেশে 'জরুরি অবস্থা' জারি করা হয়। সাধারণত আমরা 'জরুরি অবস্থা' কথাটিকে যুদ্ধ, আগ্রাসন অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত কোনো ঘটনার সাথে যুক্ত করি। কিন্তু এখানে ব্যবহৃত 'জরুরি অবস্থা' অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উপদ্রবের সম্ভাব্য হুমকির প্রেক্ষাপটে জারি করা হয়। যে নাটকীয়তার সাথে জরুরি অবস্থা শুরু হয় অনুরূপ নাটকীয়তার সাথেই তা সমাপ্ত হয়। তবে এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করব। এই প্রেক্ষাপটে আমরা এমন কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করব যা ওই বছরগুলোর পরবর্তীতে বহু বিতর্কের সৃষ্টি করে।

- জরুরি অবস্থা কেন জারি করা হয়েছিল? এটা কি তখন প্রয়োজন ছিল?
- বাস্তবের প্রেক্ষাপটে জরুরি অবস্থা জারির অর্থ কি?
- দলীয় রাজনীতিতে জরুরি অবস্থা কী কী পরিণাম বয়ে এনেছিল?
- ভারতীয় রাজনীতি জরুরি থেকে কী কী শিক্ষা পেয়েছে?

অধ্যায় 6

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট
(The Crisis of Democratic Order)

জরুরি অবস্থার পটভূমি (Background to Emergency)

১৯৬৭ সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই কিছুটা জানতে পেরেছি। সেই সময় ইন্দিরা গান্ধি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার সাহায্যে ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হোন। একই সময়ে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা তিক্ততার পর্যবসিত হয়, পাশাপাশি এর মেরুকরণও শুরু হয়। ইতিহাসের এই সময় সরকার এবং বিচার বিভাগের মধ্যে উত্তেজনাকর সম্পর্কেরও সাক্ষী হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের মতে ওই সময় ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত কিছু উদ্যোগ সংবিধানের আদর্শ উলঙ্ঘন করে। আবার কংগ্রেস দল মনে করত সুপ্রিম কোর্টের এই অবস্থান ছিল গণতন্ত্র ও সংসদীয় আধিপত্যের নীতির বিরোধী। কংগ্রেস দল এই অভিযোগও করে যে আদালত হলো এক প্রকার রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান যা গরিবমুখী ও কল্যাণকর কর্মসূচিসমূহ রূপায়ণের পথ বড়ো বাঁধা। অন্যদিকে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলো মনে করতো রাজনীতিতে এতটা ব্যক্তিকরণ হচ্ছে যে সরকারি কর্তৃত্ব এখন ব্যক্তিগত কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সেই সময়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিভাজন ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর স্বদলীয় বিরোধীদের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট (Economic context)

১৯৭১ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের নির্বাচনী স্লোগান ছিল গরিবী হঠাও। কিন্তু তারপরেও ১৯৭১-৭২ সালের পর ভারতের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। সেই সময়কার বাংলাদেশ সংকটের কারণে ভারতের অর্থনীতি যথেষ্ট চাপে পরে যায়। প্রায় আট মিলিয়ন শরণার্থী সীমান্তের ওপারের পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের ভূখণ্ডে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সময় ভারত পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। এই যুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জন্য নির্ধারিত সকল প্রকার অনুদান বন্ধ করে দেয়। পাশাপাশি এই সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে ভারতের বাজারে সকল প্রকার পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭৩ ও ৭৪ সালে এই মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩ শতাংশ ও ৩০ শতাংশ। উচ্চহারে মুদ্রাস্ফীতি ভারতের জনগণের জন্য নানাহ প্রকারের সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করে।

ওই সময়ে শিল্পের বিকাশ ছিল খুব কম কিন্তু বেকারত্বের হার ছিল অত্যন্ত বেশি। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে এই অবস্থা ছিল শোচনীয়। সুতরাং ব্যয় কমানোর জন্য সরকার কর্মচারীদের বেতন প্রদান সামরিকভাবে স্থগিত করে দেয়। যার ফলে সরকারি কর্মচারীরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ১৯৭২-৭৩ সালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে কৃষি উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন ৮ শতাংশ কমে যায়। সার্বিকভাবে অর্থনীতির এই করুণ অবস্থার কারণে দেশব্যাপী ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির

আমরা সবচেয়ে ভালো যেটা আশা করতে পারি, তাহলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ১৯৭৩ সালটা চলে যাক।

দরিদ্রদের উপর সংকট অবশ্যই আরো বেশি ঘনীভূত হয়েছিল। গরিবী হঠাও– এই প্রতিশ্রুতির পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল?

বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে অকংগ্রেসি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন গণআন্দোলন কার্যকরভাবে সংগঠিত করতে সামর্থ হয়। ১৯৬০-এর দশকে সংগঠিত বিভিন্ন ছাত্র আন্দোলন এই সময়ে এসে আরো বেশি সক্রিয় হতে শুরু করে। একই সময়ে সংসদীয় রাজনীতিতে অবিশ্বাসী মার্কসবাদী গোষ্ঠীসমূহের কার্যকলাপও এই সময় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব গোষ্ঠী অস্ত্র হাতে নিয়ে জঙ্গি কার্যকলাপ শুরু করে, যাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সরিয়ে নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। মার্কসবাদী লেনিনবাদী (বর্তমান মাওবাদী) হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন গোষ্ঠী বা নকশালবাদীরা এখন পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে বেশ শক্তিশালী, যদিও রাজ্য সরকার তাদেরকে দমন করার জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করেছে।

গুজরাট এবং বিহার আন্দোলন (Gujrat and Bihar movements)

কংগ্রেস শাসিত গুজরাট এবং বিহার রাজ্যের ছাত্র আন্দোলন রাজ্য ও জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে ছাত্ররা গুজরাট রাজ্যে সরকারের উচ্চস্তরে দুর্নীতি, খাদ্যশস্য ও রান্নার তেলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলে। এই ছাত্র আন্দোলনের সাথে প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলো যুক্ত হওয়ার পর তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে রাজ্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। বিরোধী দলসমূহ বিধানসভার জন্য নতুন নির্বাচনের দাবি জানায়। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা মুরারজি দেশাই কংগ্রেসে থাকাকীলীন সময়ে ইন্দিরা গান্ধির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে রাজ্য বিধানসভার জন্য নতুন নির্বাচন ঘোষণা না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসবেন। বিরোধী দল দ্বারা সমর্থিত ছাত্রদের প্রবল প্রতিবাদ আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালের জুন মাসে গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজয় বরণ করে।

“সম্পূর্ণ বিদ্রোহ এখন স্লোগান, ভবিষ্যত এখন আমাদের এবং এটাই মূল গান”

১৯৭৪ সালের বিহার আন্দোলনের একটি স্লোগান

১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে বিহারে ছাত্ররা দুর্নীতি, বেকারত্ব, খাদ্য সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির বিরুদ্ধে একসাথে মিলেমিশে বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলে। এক পর্যায়ে তারা রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নেওয়া প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মী জয়প্রকাশ নারায়ণকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ তিনি এই শর্তে গ্রহণ করেন যে আন্দোলনে কোনো প্রকার হিংসাশ্রয়ী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না এবং এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র বিহারেই সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। ফলে এই আন্দোলন ধীরে ধীরে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয় এবং তা জাতীয় স্তরেও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। সর্বস্তরের জনগণ তখন এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে থাকে। জয়প্রকাশ নারায়ণ বিহার থেকে কংগ্রেস শাসকদের বরখাস্ত করার দাবি জানান। তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তরেও সার্বিক বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান করেন, যাতে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহার সরকারের বিরুদ্ধে হরতাল, ঘেরাও, সমাবেশ ইত্যাদি সংগঠিত করা হয়। কিন্তু সরকার পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানায়।

“ইন্দিরাই ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াই ইন্দিরা”

১৯৭৪ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ডি. কে. বড়ুয়ার প্রণীত স্লোগান

নকশালবাদী আন্দোলন (The Naxalite Movement)

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের দার্জলিং পার্বত্য জেলার অন্তর্গত নকশালবাড়ি পুলিশ চৌকি এলাকায় সেখানকার স্থানীয় ভারতীয় ভারতীয় কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) দলের নেতৃত্বে এক কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। নকশালবাড়ি থানা এলাকায় শুরু হওয়া কৃষক আন্দোলন ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পরে যা পরবর্তীতে নকশালবাদী আন্দোলন নামে পরিচিত লাভ করে। ১৯৬৯ সালে আন্দোলনকারী নেতারা ভারতীয় কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী) দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতীয় কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) সংক্ষেপে সিপিআইএমএল (CPIML) নামে নতুন একটি দল গঠন করে। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নতুন এই দলটি গঠিত হয়েছিল। নতুন এই দলটি গণতন্ত্রকে ভারতের জন্য লজ্জা হিসেবে গণ্য করে এবং গেরিলা সংগ্রামের কৌশল অবলম্বন করে বিপ্লবের নতুন অধ্যায় সূচনা করে।

নকশালবাদী আন্দোলন জোড়পূর্বকভাবে জমিদারদের দখলে থাকা জমি পুনরুদ্ধার করে তা দরিদ্র ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করতো। এই আন্দোলনের সমর্থকগণ তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতো। কংগ্রেস দল দ্বারা পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রতিষেধকমূলক আটক ও অন্যান্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও নকশালবাদী আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায় নি। বরং পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে এই আন্দোলন দেশের অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পরে। বর্তমানে নকশালবাদী গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের মধ্যে ঢুকে পরে। এমন কিছু রাজনৈতিক দল যেমন– সিপিআইএমএল (Liberation) গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও সরাসরি অংশ গ্রহণ করে থাকে।

চারু মজুমদার (১৯১৮-১৯৭২) : সাম্যবাদী বিপ্লবী ও নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা; স্বাধীনতার পূর্বে তেভাগা আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেছিলেন; সিপিআই (CPI) ছেড়ে সিপিআইএমএল (CPIML) নামে নতুন দল গঠন করেন; কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে মাওবাদী আদর্শে বিশ্বাস করেন এবং বিপ্লবী সহিংসতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন; পুলিশ হেপাজতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বর্তমানে নয়টি রাজ্যের প্রায় ৭৫টি জেলা নকশালবাদী সহিংস কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত। এই জেলাগুলোর অধিকাংশই হল পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের অন্তর্গত যেখানে আদিবাসী জনগণ বসবাস করেন। এইসব অঞ্চলের বর্গাদার কৃষক, অধীনস্থ কৃষক এবং ক্ষুদ্র কৃষকগণ উৎপাদিত পণ্যের প্রাপ্য অংশ ও মজুরির অধিকার থেকে সবসময় বঞ্চিত থাকতেন। জোড়পূর্বক বেগার খাটানো, বহিরাগতদের দ্বারা স্থানীয় সম্পদের হরণ, মহাজনদের দ্বারা নিপীড়ন ইত্যাদি ওইসব অঞ্চলে স্বাভাবিক পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচিত হতো। আর এসব কারণে ওইসব অঞ্চলে নকশালবাদী কার্যকলাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নকশালবাদী আন্দোলনে ইতি টানতে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে মানবাধিকার সংস্থা ও কর্মীরা নকশালবাদী আন্দোলন থামাতে কঠোর সরকারি নীতির সমালোচনা করে থাকে। কারণ তাদের মতে সরকার দ্বারা গৃহীত কঠোর নীতি সংবিধানের পরিপন্থী। নকশালবাদী সহিংসতা ও নকশাল বিরোধী সরকারি দমনকারী ব্যবস্থার ফলে এ পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

Credit: R. K. Laxman in The Times of India, 16 April 1974

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ (জেপি)

১৯০২-১৯৭৯

যৌবনকালে মার্কসবাদী; কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি এবং সোসালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক; ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম নায়ক; নেহরুর ক্যাবিনেটে যোগদান করতে অস্বীকৃতি; ১৯৫৫ সালের পরে সক্রিয় রাজনীতি পরিত্যাগ; গান্ধিবাদী দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন এবং ভূদান আন্দোলনে যোগদান, নাগা বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ, কাশ্মীরে শান্তি উদ্যোগ গ্রহণ এবং চম্বলে ডাকাতদের আত্মসমর্পণ নিশ্চিতকরণ, বিহার আন্দোলনের নেতা, জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে বিরোধের প্রতীক এবং জনতা দলগঠনে প্রবহমান শক্তিরূপে আবির্ভাব।

এই আন্দোলন জাতীয় রাজনীতিতেও প্রভাব বিস্তার শুরু করে। জয়প্রকাস নারায়ণ চাইতেন বিহার আন্দোলন যেন দেশের অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পরে। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের পাশাপাশি রেলের কর্মচারীরাও দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়। এর ফলে দেশে প্রচণ্ড অচলাবস্থা তৈরি হয়। ১৯৭৫ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ জনগণের দ্বারা সংসদ অভিযান আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এটা ছিল দেশের রাজধানীতে সংগঠিত দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক সমাবেশ। এই সময়ে তিনি বহু অকংগ্রেসি বিরোধী দলের সমর্থন লাভ করেন। যেমন- ভারতীয় জনসংঘ, কংগ্রেস (O), ভারতীয় লোকদল, সোস্যালিস্ট পার্টি ও অন্যান্যরা। এই রাজনৈতিক দলগুলো জয়প্রকাশ নারায়ণকে ইন্দিরা গান্ধির বিকল্প হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু উনার দর্শন এবং তার দ্বারা পরিচালিত গণআন্দোলনের রাজনীতিও অনেকের দ্বারা সমালোচিত হয়। বিহার এবং গুজরাট আন্দোলনকে রাজ্য সরকার বিরোধী নয়, বরং কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করা

হতো। অনেকে মনে করেন যে এই আন্দোলন মূলত ছিল ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন। ইন্দিরা গান্ধি নিজেও মনে করতেন যে এই আন্দোলন ছিল তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত উদ্দেশ্যমূলক একটি আন্দোলন।

১৯৭৪ সালে রেল হরতাল (Railway Strike of 1974)

রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে কী অবস্থা হবে? একদিন কিংবা দুদিনের জন্য নয় বরং এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পর্যন্ত বন্ধ হলে তখনই বা কী হবে? অবশ্যই, বেশিরভাগ মানুষই অসুবিধায় পরবে; অধিকন্তু, দেশের অর্থনীতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। কারণ রেলের মাধ্যমেই দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পণ্য দ্রব্য স্থানান্তর করা হয়।

তোমরা কি জান এরকম একটি পরিস্থিতি ১৯৭৪ সালে তৈরি হয়েছিল? জর্জ ফার্নান্ডেজের নেতৃত্বে পরিচালিত রেলওয়ে আন্দোলনের জাতীয় সমন্বয় কমিটি দ্বারা দেশব্যাপী রেলকর্মীদের ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল, যাতে কাজের পরিবেশ ও প্রাপ্য বোনাস সম্পর্কিত তাদের দাবি পূরণ করা হয়। সরকার এই দাবির বিপক্ষে ছিল। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালের মে মাসে ভারতের সবচেয়ে বড় সরকার অধিগৃহীত সংস্থা হিসেবে পরিচিত রেল কর্মচারীরা দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করে। এই ধর্মঘটের ফলে দেশে বৃহত্তর শ্রমিক আন্দোলনের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের অধিকার বিষয়টি সামনে উঠে আসে। এর মাধ্যমে এই প্রশ্নটিও উঠে আসে যে প্রয়োজনীয় পরিসেবায় নিযুক্ত কর্মচারীরা হরতালের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে কি না।

সরকার এই আন্দোলনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। ধর্মঘটরত শ্রমিকদের দাবি পূরণে সরকার অস্বীকৃতি জানায় এবং অনেক নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। তাছাড়া রেলওয়ে লাইনগুলোকে রক্ষা করতে টেরিটোরিয়াল আর্মি নিযুক্ত করে। ফলে কোনো প্রকার আপোস মীমাংসা ছাড়াই প্রায় কুড়ি দিন পর এই হরতাল প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

বিচার ব্যবস্থার সাথে সংঘাত (Conflict with Judiciary)

ওই সময়কালে সরকার এবং শাসকদল বিচার ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন মতপার্থক্যের কারণে সংঘাত জড়িয়ে পড়ে। আদালত এবং সংসদের মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী সংঘাতের ফলে সৃষ্ট বিতর্কের কথা কি তোমাদের মনে আছে? গতবছর এ সম্পর্কে তোমরা কিছুটা অধ্যায়ন করেছ। ওই সময়ে তিনটি সাংবিধানিক বিষয় উত্থাপিত হয়। সংসদ কি মৌলিক অধিকার কাটছাঁট করতে পারে? সুপ্রিম কোর্টের মতে পারে না। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার কি জনগণের সম্পত্তির অধিকার হরণ করতে পারে? সুপ্রিম কোর্টের মতে মৌলিক অধিকার খর্ব করে সংসদ সংবিধানে কোনো প্রকার সংশোধনী আনতে পারে না। তৃতীয়ত, সংসদ এই বলে সংবিধান সংশোধন করে যে রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার খর্ব করা যায়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সংসদের এই যুক্তি বাতিল করে দেয়। এই অবস্থার ফলে সরকার এবং বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। তোমাদের হয়তো মনে আছে যে বিখ্যাত কেশবানন্দ ভারতী মামলায় এই সংকট সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রদত্ত রায় ছিল যে সংসদ কখনোই সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহকে সংশোধন করতে পারবে না।

'সমর্পিত বিচার ব্যবস্থা' এবং 'সমর্পিত আমলাতন্ত্রের' অর্থ কি এই যে বিচারক এবং আমলাগণ শাসকদলের প্রতি অনুগত থাকবে?

সরকার এবং বিচার ব্যবস্থার মধ্যেকার সংকটজনক সম্পর্কে আরো দুটি বিষয় যুক্ত হয়। ১৯৭৩ সালের কেশবনান্দ ভারতী মামলায় প্রদত্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ভারতের প্রধান বিচারপতির পদটি

শূন্য হয়ে পরে। নিয়মানুসারে কর্মরত সবচেয়ে প্রধান বিচারপতিই ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হোন। কিন্তু ১৯৭৩ সালে চলমান প্রথার বিপরীতে কর্মরত তিনজন বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে এ.এন.রায়-কে ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই নিযুক্তি ছিল রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত বিতর্কিত। ফলে বঞ্চিত তিন প্রধান বিচারপতি সরকারের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে রুলিং জারি করে। ফলশ্রুতিতে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা কিংবা পর্যবেক্ষণ এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ একে অপরের সাথে খুব দ্রুত মিথোস্ক্রিয়া শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর নিকটস্থ লোকেরা বলতে শুরু করে যে এমন এক নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে বিচারব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্র সরকার এবং আইনসভার প্রতি অনুগত থাকবে। আসলে এরূপ সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতির পেছনে মূল কারণ ছিল হাইকোর্ট দ্বারা ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচন বাতিল সংক্রান্ত রায়।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা (Declaration of Emergency)

১৯৭৫ সালের ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহনলাল সিনহা লোকসভায় ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচনকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে মনোনীত প্রার্থী বিশিষ্ট সমাজকর্মী রাজ নারায়ণের আবেদনের ভিত্তিতে এই রায় প্রদান করা হয়েছিল। এই আবেদনে ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচনকে এই বলে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় যে নির্বাচনী সময়কালে শ্রীমতী গান্ধি সরকারি কর্মচারীদেরকে তাঁর পক্ষে প্রচারে ব্যবহার করেছিলেন। উচ্চ আদালতের এই রায়ের ফলে লোকসভায় ইন্দিরা গান্ধির সদস্যতা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। সুতরাং, যতক্ষণ না পর্যন্ত পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধি নতুন করে সংসদের সদস্য হিসেবে পুনঃ নির্বাচিত না হন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন থাকতে পারবেন না। ওই বছরের ২৪ জুন তারিখে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায় আংশিকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেন। অর্থাৎ আবেদনের ভিত্তিতে রায় না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সদস্যতা থাকবে, তবে লোকসভার কোন প্রকার কার্যক্রমে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

সংকট এবং প্রতিক্রিয়া (Crisis and response)

উদ্ভুত পরিস্থিতি এখন বৃহত্তর রাজনৈতিক সংঘাতের জন্য প্রস্তুত। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল ইন্দিরা গান্ধিকে পদত্যাগে বাধ্য করতে সংগঠিত হয় এবং ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দিল্লির রামলীলা ময়দানে বৃহৎ প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। জয়প্রকাশ নারায়ণ শ্রীমতী গান্ধির পদত্যাগ নিশ্চিত করার নিমিত্তে দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং কর্মচারীদের সরকারি কোনো 'অবৈধ ও অনৈতিক নির্দেশিকা' না মানার জন্য অনুরোধ করেন। এই আহ্বানের ফলে সরকারি কার্যক্রম স্থবির হয়ে পরে। দেশের রাজনৈতিক মনোভাব পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিকভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত হতে থাকে।

এরূপ পরিস্থিতিতে সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন সরকার ঘোষণা করে যে দেশে এখন অভ্যন্তরীণ উচ্ছৃঙ্খলতা হুমকি হিসেবে আবির্ভূত। সুতরাং সংবিধানের ৩৫২ নং ধারা এখন দেশের জন্য প্রযোজ্য। সংবিধানের এই ধারা অনুসারে সরকার বহিরাগত কিংবা অভ্যন্তরীণ হুমকির প্রেক্ষাপটে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারে। সরকার তাই ঘোষণা করে যে দেশের এই গভীর অভ্যন্তরীণ সংকটের প্রেক্ষাপটে জরুরি অবস্থা জারি করা একান্ত প্রয়োজন। কৌশলগতভাবে বলতে

এই ব্যাঙ্গ চিত্রটি জরুরি অবস্থা ঘোষণার কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়। এতে চলমান রাজনৈতিক সংকটের পরিস্থিতি ধরা পড়েছে। চেয়ারের পেছনের ব্যক্তিটি হলেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ডি.কে. বড়ুয়া।

গেলে এই সিদ্ধান্ত ছিল সরকারি ক্ষমতারই অধীন, যে একবার জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর বিশেষ কিছু ক্ষমতা সরকারের হাতে চলে আসে।

একবার যখন জরুরি অবস্থা জারি করা হয় তখন ক্ষমতার যুক্তরাষ্ট্রীয় বণ্টন আর কার্যকর থাকে না। এই অবস্থায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চলে যায়। দ্বিতীয়ত, জরুরি অবস্থায় সরকার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে সকল প্রকার কিংবা যে-কোনো মৌলিক অধিকার সীমিত অথবা খর্ব করে দিতে পারে। সংবিধানের ধারাগুলোতে ব্যবহৃত শব্দ কিংবা শব্দমালা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে জরুরি অবস্থা এমন এক অভূতপূর্ব বাতাবরণের সৃষ্টি করে যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোনোভাবেই কার্যকর থাকে না। সুতরাং, এই অবস্থায় সরকার বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করে থাকে।

১৯৭৫ সালে ২৫ জুন রাতে প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের কাছে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রদান করেন। সুপারিশ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। মধ্যরাতের পর দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র অফিসগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করা হয়। পরদিন প্রভাত শুরু হতেই বিরোধী দলগুলোর অসংখ্য নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এইসব কিছু করার পর ২৬ জুন ভোর ৬টায় বিশেষভাবে আহূত ক্যাবিনেট বৈঠকে এব্যাপরে সদস্যদের অবগত করানো হয়।

ক্যাবিনেটের সুপারিশ ছাড়াই জরুরি অবস্থা জারি করা কি রাষ্ট্রপতির উচিত হয়েছিল?

नईदुनिया
अखबारों पर बंदिश लगी, हटी
देश में तानाशाही रोकने के लंबे संघर्ष हेतु तैयार रहें
रामलीला मैदान की विशाल सभा में जयप्रकाश की घोषणा
श्रीमती गांधी को प्रधान
बने रहना
CHIEF SUBS/SUBS:
Message to Chief Sub, Bombay/Ahmadabad, from Chief Sub, Delhi.
The censor rang up to say that the Prime Minister's interview to the correspondent of the "Daily Telegraph" should be sent to him before publication.
September 28, 197
To Editor/News Editor/Chief Subs/Subs/Reporters:
No news, comments, rumour or other reports relating to the family planning programme should be published without clearance from the Censor.
Editorial, 7/9/1976
RAMSON PAINTS
SEA PALACE HOTEL
THE TIMES OF INDIA
STATE OF EMERGENCY DECLARED
Several leaders arrested
CM warns against call
Security in peril, says P.M.
Rights suspended
Be vigilant, states told
Pre-censorship imposed
CHIEF SUBS/SUBS/CHIEF REPORTER/REPORTERS:
Chief Sub, Delhi, to Chief Sub, Bombay/Ahmadabad:
Phone from Censor (Mr. Laxmi Chand): "Only official version of Indo-Pak talks today to be used. No comments or editorials to be written

नया आपात्काल : जयप्रकाश और कई नेता गिरफ्तार
क्या नहीं हुआ
To our readers
The city edition of Friday and dak editions of Friday and Saturday of the Hindustan Times could not be brought out as no power was available from 12-45 p m on Thursday till 7-15 p m on Friday The inconvenience is deeply regretted
Emergency ensures YOUR Security— and the NATION'S
WORK MORE TALK LESS
प्रधान मन्त्री का क्रान्तिकारी कार्यक्रम आइए, इसे सफल बनाएं
THE HINDUSTAN TIMES
MRS GANDHI DEFEATED
Janta Party forges ahead in North
Bansi Lal, Sanjay out
Cong rout in Delhi total
Nightmare over, says Vajpayee
We've always practised Compulsory Sterilisation
Amul

ফলাফল (Consequences)

জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার ফলে সকল প্রকার আন্দোলন থমকে যায়; হরতাল নিষিদ্ধ করা হল; বিরোধী দলসমূহের অনেক নেতা কারারুদ্ধ হোন; রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হলেও বাহ্যিকভাবে শান্ত হয়ে গেল। জরুরি অবস্থার কারণে হাতে আসা বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। সংবাদপত্রকে যে-কোনো বিষয় প্রকাশনার পূর্বে সরকার থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে বাধ্য করা হল। এই অবস্থা প্রচার মাধ্যমের উপর বিধিনিষেধ বলে পরিচিতি লাভ করল। সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সম্ভাব্য হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS) এবং জামাতি ইসলামি নামক দুটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। যে কোনো প্রকার প্রতিবাদসভা, হরতাল, গণআন্দোলন ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ওই সময় অর্থাৎ জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে জনগণের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়। এমনকি মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার থেকেও জনগণকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে সরকার প্রচুর পরিমাণে প্রতিষেধকমূলক গ্রেপ্তারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এই ক্ষমতার আওতায় জনগণকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটক রাখা হয়। এই ধরনের আটক এই জন্য নয় যে তারা কোনো অন্যায় করেছে বরং এই ভয়ে যে তারা কোনো অন্যায় করতে পারে। প্রতিষেধকমূলক আটক আইন প্রয়োগ করে জরুরি অবস্থার সময় সরকার অসংখ্য নাগরিককে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ওই সময়ে গ্রেপ্তারকৃত রাজনৈতিক কর্মীরা বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus) লেখ ব্যবহার করে অনৈতিক আটকের বিরুদ্ধে আদালতেও যেতে পারতো না। এই নিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া নাগরিকদের পক্ষে হাইকোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টে প্রচুর পরিমাণে মামলা করা হয়। কিন্তু সরকার দাবি করে যে আটককৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোনো তথ্য কিংবা আটকের কারণ জানাতে তারা বাধ্য নয়। দেশের বিভিন্ন উচ্চ আদালত এই বলে রায়দান করেছিলেন যে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরেও বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ লেখটি কার্যকর থাকে যার মাধ্যমে অবৈধ আটকের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করা যায়। তবে ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ উচ্চ আদালতের এই রায় বাতিল করে সরকারি অবস্থানের পক্ষে রায় ঘোষণা করে। এর অর্থ এই যে জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে সরকার নাগরিকদের জীবন এবং স্বাধীনতার অধিকার কেড়ে নিতে পারে। এই রায়ের মধ্য দিয়ে জরুরি অবস্থা কালীন সময়ে জনগণের জন্য আদালতে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। অনেকে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে অত্যন্ত বিতর্কিত বলে মন্তব্য করেন।

এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টও আত্মসমর্পণ করে ফেলল! ওইসব দিনগুলোতে প্রত্যেকের সাথেই কি ঘটেছিল?

সেই সময়ে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে অনেক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছিল । প্রথম ধাপে গ্রেপ্তার না হওয়া রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের অনেকেই গোপন আস্তানায় লুকিয়ে থেকে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং স্টেটসম্যান এর মতো সংবাদপত্রগুলো বিধিনিষেধের অন্তর্ভুক্ত সংবাদের পাতাগুলো খালি রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সেমিনার এবং মেইন স্ট্রিম-এর মতো ম্যাগাজিনগুলোর প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে লেখনির কারণে অনেক সাংবাদিককে আটক করা হয়। সরকারি বিধিনিষেধকে তোয়াক্কা না করে গোপন আস্তানা থেকে প্রচুর পরিমাণে সংবাদপত্র ও প্রচারপত্র প্রকাশ করা হতো। গণতন্ত্র হরণের প্রতিবাদে কন্নড় লেখক শিবরাম কারান্থ তাঁর প্রাপ্ত পদ্মভূষণ পুরস্কার সরকারকে ফিরিয়ে দেন। একইভাবে হিন্দি লেখক ফনিশ্বরনাথ রেণু তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দেন। মোটের উপর এসব প্রকাশ্য প্রতিবাদ ও অবাধ্যতা সেই সময়ের জন্য ছিল অত্যন্ত বিরল।

ওই সময়ে সংসদ সংবিধানে নানাহ পরিবর্তন আনে। ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় এলাহাবাদ

হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে বিশেষ সংশোধনী এনে ঘোষণা করা হয় যে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যাবে না। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীও জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে করা হয়। তোমরা ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছ যে এই সংশোধনীয় মাধ্যমে সংবিধানের বিভিন্ন জায়গায় পরির্তন আনা হয়। এই পরিবর্তনগুলোর একটির মাধ্যমে আইনসভার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে ছয় বছর করা হয়। এই পরিবর্তন শুধু জরুরি অবস্থাকালীন সময়ের জন্য ছিল না বরং একে স্থায়ী করারও চিন্তা ভাবনা করা হয়েছিল। এছাড়াও অন্য একটি সংশোধনীতে বলা হয়েছে জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নির্বাচন ব্যবস্থা এক বছরের জন্য স্থগিত করা যাবে। সুতরাং এর ফলে ১৯৭১ সালের পর সাধারণ নির্বাচন ১৯৭৬ সালের পরিবর্তে ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

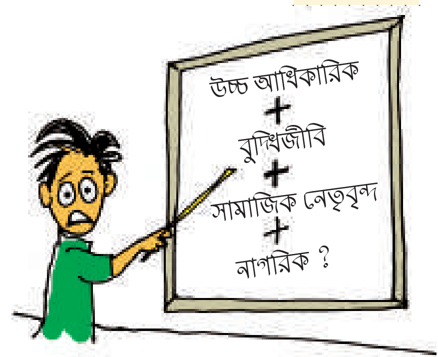

চলো এই সকল প্রতিবাদ আন্দোলনকারীদের নিয়ে আমরা কথা বলব না। কারণ তারা সংখ্যায় ছিল কম। বাকিদের কি হয়েছিল? বড়ো বড়ো আধিকারিক, বুদ্ধিজীবি, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ জনগণ ..... তারা কি করছিল?

জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত বিতর্ক (Controversies regarding Emergency)

জরুরি অবস্থা হলো ভারতীয় রাজনীতির অত্যন্ত বিতর্কিত একটি পর্ব। এর একটি কারণ হলো জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নানাহ মতামত। অন্য একটি কারণ হলো সংবিধান পদ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকার বস্তুত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ধ্বংস করে দেয়। জরুরি অবস্থার পরে গঠিত শাহ কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয় যে ওই সময়ে বহু পরিমাণে 'মাত্রাতিরিক্ত' অন্যায় করা হয়েছিল। সবশেষে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জরুরি অবস্থা থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল তা নিয়ে নানাহ মূল্যায়ন রয়েছে। চলো এক এক করে এই বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনা করি।

জরুরি অবস্থা কি প্রয়োজন ছিল? (Was the Emergency necessary?)

সংবিধানে জরুরি অবস্থা ঘোষণার কারণ হিসেবে 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগ' (Internal Disturbance) কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের পূর্বে এই কারণে কোনো প্রকার জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি। আমরা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানাহ ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন চলছিল। জরুরি অবস্থা জারি করার পেছনে এটা কি কোনো কারণ ছিল? সরকার যুক্তি দিয়ে বলেছিল যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক দলকে নিয়ম অনুসারে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর সাহায্য করা উচিত। সরকারের মতে ঘন ঘন বিক্ষোভ, প্রতিবাদ আন্দোলন এবং সামগ্রিক কার্যক্রম গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো নয়। ইন্দিরা গান্ধির অনেক সমর্থকগণ মনে করতেন যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদীয় রূপরেখার বাইরে সরকারকে টার্গেট করে কোনো প্রকার অতিসক্রিয়তা ভালো নয়। কারণ এতে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং উন্নয়নের পথ থেকে প্রশাসনকে বিচ্যুত করবার প্রচেস্টা গ্রহণ করা হয়। সরকারের সকল

শাহ্ তদন্ত কমিশন (Shah Commission of Inquiry)

১৯৭৭ সালের মে মাসে জনতা দল সরকার ভারতের সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জে.সি শাহ -এর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল "১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন তারিখে ঘোষিত জাতীয় জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে সরকার দ্বারা গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম অপকর্ম, মাত্রাতিরিক্ত অন্যায়, অধিকারের অপপ্রয়োগ ইত্যাদি অভিযোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে তদন্ত করা।" কমিশন বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা করেন এবং নানাহ সাক্ষী ও প্রমাণাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। যাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তাদের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধিও ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধি কমিশনের সামনে হাজির হলেও কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

ভারত সরকার শাহ্ কমিশন দ্বারা প্রদত্ত দুটি অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদনও তৃতীয় তথা চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা বিভিন্ন তথ্য, পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশমালা গ্রহণ

"গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের কার্যকারিতাকে অমান্য করার চেষ্টা চলছে। বৈধভাবে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে কোনোভাবেই তার কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিক্ষোভ আন্দোলন সামাজিক পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, যার ফলে সহিংসতার মতো ঘটনা ঘটছে। ..... কিছু সংখ্যক মানুষ আমাদের সেনাবাহিনী ও পুলিশকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখন অতি সক্রিয় এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্রমে ক্রমে মাথাচারা দিয়ে উঠছে, যা আমাদের রাষ্ট্রীয় একতার জন্য হুমকি স্বরূপ। দেশের স্থিতিশীলতা ধ্বংসের পথে পরিচালিত হলে যে কোনো নির্বাচিত সরকার কীভাবে নীরব থাকতে পারে। কিছু সংখ্যক মানুষের কার্যকলাপ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অধিকারকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।"

ইন্দিরা গান্ধি

১৯৭৫ সালের ২৬ জুন তারিখে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে দেওয়া ভাষণ।

শাহ কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের পর ইন্দিরা গান্ধির প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপট থেকে এই ব্যঙ্গ চিত্রটি অঙ্কিত।

শক্তি আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ব্যয় হয় এবং উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পরে। শাহ্ কমিশনকে লেখা ইন্দিরা গান্ধির চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে বিপদগামী শক্তি সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তাকে অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতাচ্যুত করতে প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল।

সিপিআই এর মত কিছু দল জরুরি অবস্থার সময়ে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন জারি রেখেছিল। তারা মনে করতো যে ওই সময়ে ভারতের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংস করার জন্য আন্তর্জাতিক স্বরযন্ত্র সক্রিয় ছিল। তারা এটাও বিশ্বাস করতো যে এই ধরনের গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা

দিল্লির তুর্কমান গেইট এলাকা ধ্বংস (Demolitions in Turkman Gate area, Delhi)

জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে দিল্লির দরিদ্রতম এলাকাগুলোতে বসবাসরত জনগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে পরে। তাদের ঝুপড়িগুলোকে জোরপূর্বকভাবে যমুনা নদীর তীরবর্তী পতিত এলাকায় স্থানান্তর করা হয়। এই ব্যবস্থার কারণে তুর্কমান গেটের সংলগ্ন কলোনিগুলো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলাকার ঝুপড়িগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই এলাকার বেশিরভাগ লোকজনদের বন্ধ্যাকরণ (Sterilisation) করা হয়। তবে অনেকেই বন্ধ্যাকরণ প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পেরেছিলেন। কারণ তারা অন্যদেরকে উৎসাহিত করে বন্ধ্যাকরণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে সামর্থ হয়েছিলেন। এতে তারা পুরস্কার হিসাবে এক টুকরো জমিও পেয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে শিকারে পরিণত করেছিল। অনুরূপভাবে কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী লোকও অন্যদেরকে এই প্রক্রিয়ার শিকার বানিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির টুকরো আইনগতভাবে সরকার থেকে হাতিয়ে নিয়েছিলেন। তাছাড়া এর ফলে তারা অন্যত্র স্থানান্তরের প্রক্রিয়া থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উৎস : *শাহ্ তদন্ত কমিশন, অন্তবর্তী প্রতিবেদন II*

চলো গবেষণা করি

তোমরা পিতামাতা বা তোমার পরিবারের অন্যান্য প্রধান কিংবা প্রতিবেশীদের কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত সময়কালে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল। নিম্নে প্রদত্ত বিষয়গুলো লিখে রাখো :

* জরুরিকালীন অবস্থায় তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।
* জরুরি অবস্থার পক্ষে অথবা বিপক্ষে তোমার এলাকায় প্রকাশিত কোনো প্রতিবেদন।
* ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণ এবং কেন তারা এই পদ্ধতিতে ভোট দিলেন।

প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে এক সাথে করে একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন তৈরি করো। প্রতিবেদনের শিরোনাম হবে "আমার শহরে/গ্রামে জরুরি অবস্থার প্রাভাব।"

বৈধ ছিল। সিপিআই মনে করেছিল যে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পরিচালিত বিক্ষোভ আন্দোলন বিশেষত মধ্যবৃত্ত শ্রেণির দ্বারা সমর্থিত ছিল যারা মূলত কংগ্রেস দলের মৌলিক ও রক্ষণশীল নীতিমালার বিরোধিতা করতো। কিন্তু জরুরি অবস্থার পর সিপিআই অনুভব করে যে তাদের মূল্যায়ণ ভুল ছিল এবং জরুরি অবস্থার প্রতি তাদের সমর্থন ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ।

অন্যদিকে জরুরি অবস্থার সমালোচকরা মনে করেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কাল থেকে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল জনপ্রিয় সংগ্রামে পরিপূর্ণ। জয়প্রকাশ নারায়ণসহ অন্যান্য বিরোধী নেতাগণ মনে করতেন যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন হলো এক ধরনের অধিকার। বিহার এবং গুজরাট আন্দোলন সামগ্রিকভাবে ছিল হিংসাবিহীন ও শান্তিপূর্ণ, যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার দেশ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ আনা হয়নি। আটককৃত অনেকের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার মামলাই করা হয়নি। দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার মূল্যায়ণ ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর কোনো আশঙ্কাও ব্যক্ত করেনি। কিছু কিছু বিক্ষোভ অন্দোলন যদিও সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সরকার তাদেরকে আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। এসব কিছু নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক কার্যকলাপে বিধিনিষেধ আরোপ করা কিংবা জরুরি অবস্থার মতো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে দেশের একতা এবং অখণ্ডতার প্রতি আসলে কোনো প্রকার হুমকি ছিল না তবে শাসকদল এবং প্রধানমন্ত্রীর নিজের অবস্থান হুমকির মুখে পড়েছিল। সমালোচকরা মনে করেন দেশ সুরক্ষার নিমিত্তে লিপিবদ্ধ সংবিধানের ধারা সমূহকে ইন্দিরা গান্ধি তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা সুরক্ষা করতে অবৈধভাবে ব্যবহার করেছিল।

জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে আসলে কী ঘটেছিল ? (What happened during emergency?)

জরুরি অবস্থার বাস্তব প্রয়োগ নিজেই একটি বিতর্কের বিষয়। সরকার কি জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেছিল ? অথবা কর্তৃত্বের কি মাত্রাতিরিক্ত কিংবা অন্যান্য প্রয়োগ হয়েছিল ? সরকারের যুক্তি ছিল যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, দক্ষতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি গরিবমুখী কল্যাণকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্যই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার বিশ-দফা উন্নয়ন কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। বিশ-দফা কর্মসূচির মধ্যে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ভূমি সংস্কার, ভূমি পুনর্বণ্টন, কৃষি মজুরির পর্যালোচনা, পরিচালন, ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি, ক্রীতদাস

প্রথার বিলুপ্তি সাধন ইত্যাদি। জরুরি অবস্থা জারির প্রথম দিকের মাসগুলোকে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা এই ভেবে খুশি হয়েছিল যে জরুরি অবস্থার ফলে বিক্ষোভ আন্দোলনের প্রায় সমাপ্তি ঘটেছে এবং সরকারি কর্মচারীদের অনুশাসন মানতে বাধ্য করা হয়েছে। দরিদ্র ও গ্রামীণ জনগণরেও প্রত্যাশা ছিল যে কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলো ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। সুতরাং, জরুরি অবস্থাকালীন সময় সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকমের অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

Credit: R. K. Laxman in the Times of India

জরুরি অবস্থার সমালোচকদের মতে ওই সময়ে সরকারের বেশিরভাগ প্রতিশ্রুতিই পূরণ করা হয়নি। দরিদ্রমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার নামে আসলে সরকার মানুষের মনোযোগ ভিন্ন দিকে পরিচালনা করা চেষ্টা করেছিলেন। সমালোচকরা বিশাল সংখ্যক প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন। আমরাও লক্ষ্য করেছি যে ওই সময়ে অনেক খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মোট ৬৭৬ জন বিরোধী দলীয় নেতাকে আটক করা হয়েছিল। শাহ্ কমিশন তদন্তের মধ্যে উল্লেখ করে যে প্রায় এক লক্ষ এগারো হাজার মানুষকে সেই সময় প্রতিরোধমূলক আইনের আওতায় আটক করা হয়েছিল। শাহ্ কমিশনের প্রতিবেদনে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭৬ সালের ২৬ জুন তারিখে তৎকালীন উপ-রাজ্যপাল মৌখিকভাবে দিল্লি পাওয়ার সাপ্লাই করপোরেশনের (Delhi Power Supply Corporation) জেনারেল ম্যানেজারকে সংবাদপত্র অফিসগুলোতে বেলা ২ ঘটিকা থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য জরুরি নির্দেশ প্রদান করেন। প্রায় দুই থেকে তিনদিন পর সংবাদ মাধ্যমের অধিকার খর্বকারী বিধিনিষেধ আইন প্রয়োগ শেষে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় স্থাপন করা হয়।

বন্দিকালীন সময়ে রাজনের মৃত্যু (Costodial death of Rajan)

১৯৭৬ সালের ১ মার্চ কেরালার কালিকট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষবর্ষের ছাত্র পি. রাজন ও জোসেফ চালি নামক অন্য একজন ছাত্রকে তাদের হোস্টেল থেকে সাত সকালে উঠিয়ে নেওয়া হয়। রাজনের পিতা টি.ভি. ইছারা ওয়ারিয়র ছেলেকে হন্যে খুঁজতে শুরু করেন। তিনি সেখানকার বিধায়কদের সাথে মিলিত হোন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন এবং তখনকার গৃহমন্ত্রী কে. করুণাকরণের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। যেহেতু দেশে ইতোমধ্যে জরুরি অবস্থা জারি হয়ে গেছে তাই নাগরিকদের স্বাধীনতা কিংবা মুক্তির বিষয় নিয়ে আদালতে যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। জরুরি অবস্থা সমাপ্তির পর ওয়ারিয়র এরনাকুলামে অবস্থিত কেরালা হাইকোর্টে তার ছেলের ব্যাপারে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus) লেখ এর মাধ্যমে আবেদন করেন। সাথীদের থেকে প্রাপ্ত প্রমাণাদির সাহত্রায্যে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ছাত্রাবাস থেকে রাজনকে কালিকটের পর্যটন বাংলোয় নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরদিন সেখানে পুলিশ তার উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়। পরবর্তী শুনানিতে কালিকট হাইকোর্টকে কেরালা সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে শারীরিকভাবে ক্রমাগত পুলিশি নির্যাতনের কারণে অবৈধ বন্দিদশায়' রাজনের মৃত্যু হয়। কেরালা হাইকোর্টের ডিভিশন ব্যাঞ্চ শুনানির পরে করুণাকরণকে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করেন। রায়ের সময় কে করুণাকরণ কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু আদালতের কঠোর রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে করুণাকরণ পদত্যাগে বাধ্য হয়।

উৎস : শাহ্ কমিশন তদন্ত, অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন II

জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আরেকটি গুরুতর অভিযোগ ছিল ওই যে এই সময়ে এমন কিছু লোক সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেন যারা মূলত সরকারি কোনো পদে আসীন ছিলেন না। যেমন ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর ছোটো ছেলে সঞ্জয় গান্ধি সরকারি কোনো পদে আসীন ছিল না। কিন্তু তারপরেও সে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতো এবং সরকারি কার্যক্রমে অযাচিত হস্তক্ষেপ করতো। দিল্লিতে সংগঠিত জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণ ও গরীব মানুষের ঝুপড়ি ধ্বংসে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত।

রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের বিচার বিহীন আটক এবং সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ আরোপ ছাড়াও জরুরি অবস্থার কারণে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকাও বিভিন্নভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পরেছিল। ওই সময়ে বিভিন্ন স্থানে আটককৃত ব্যক্তিদের উপর পুলিশি নির্যাতন এবং বন্দিদশায় মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল; অবৈধভাবে গরিব জনগণকে তাদের আবাসস্থল থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছিল এবং অতি উৎসাহের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচেস্টায় বাধ্যতামূলক বন্ধ্যাত্বকরণ করা হয়েছিল। এইসব উদাহরণ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় না থাকলে সমাজে কি পরিমাণ জঘন্য ঘটনা ঘটতে পারে।

> “... death of D. E. M. O'Cracy, mourned by his wife T. Ruth, his son L. I. Bertie, and his daughters Faith, Hope and Justice.”

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার কিছুদিন পর টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় ছদ্মনামে এই বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়।

জরুরি অবস্থা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা (Lessons of the Emergency)

জরুরি অবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তি ও দুর্বলতা উভয়ই হঠাৎ করে সামনে চলে আসে। অনেক পযবেক্ষকগণ এটা মনে করেন যে জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে যদিও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় ছিল, তবে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক কার্যক্রম পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। সুতরাং জরুরি অবস্থার একটি শিক্ষা হলো এই যে ভারতের মতো দেশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেশিদিনের জন্য দূরে থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানে উল্লেখিত জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত ধারা সমূহের অস্পষ্টতা এর ফলে পরিলক্ষিত

"আজ ভারতের স্বাধীনতা দিবস ..... ভারতের গণতন্ত্রের দীপশিখা যেন নিভে না যায়।"

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে লন্ডনের দি টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।
ফ্রি. জে. পি. প্রচারাভিযান

হয় যা পরবর্তীতে পরিমার্জিত করা হয়। বর্তমানে 'আভ্যন্তরীণ' জরুরি অবস্থা শুধুমাত্র 'সশস্ত্র বিদ্রোহের' প্রেক্ষাপটেই জারি করা যাবে। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির কাছে জরুরি অবস্থা জারি সংক্রান্ত পরামর্শ অবশ্যই কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

তৃতীয়ত, জরুরি অবস্থার ফলশ্রুতিতে প্রত্যেকেই নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে অবগত হয়। জরুরি অবস্থার পরে আদালতও ব্যক্তির নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে। এটা ছিল জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে নাগরিক স্বাধীনতার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আদালতের নিষ্ক্রিয়তার প্রতি আদালতেরই মোক্ষম জবাব। জরুরি অবস্থা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার পর বহু সংখ্যক নাগরিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত সংগঠন জন্ম নিতে শুরু করে।

যাই হোক, জরুরি অবস্থাকালীন সংবেদনশীল বছরগুলোতে এমন কিছু সমস্যা উঠে এসেছিল যেগুলোকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করা হয়নি। এই অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে গণতান্ত্রিক সরকারের স্বাভাবিক কার্যক্রম এবং এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রতিবাদ পাশাপাশি চলে আসছে। এই বিপরীতমুখী দুটি অবস্থার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা যায়? প্রতিবাদ আন্দোলন করার ক্ষেত্রে নাগরিকরা কী সম্পূর্ণ স্বাধীন অথবা এ ব্যাপারে কী তাদের কোন প্রকার অধিকারই থাকা উচিত নয়? এসব প্রতিবাদ আন্দোলন কতটুকু পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকা উচিত?

দ্বিতীয়ত, জরুরি অবস্থাকালীন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন পুলিশ এবং প্রশাসনিক দ্বারাই সম্ভব করা হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। বরং এই প্রতিষ্ঠানগুলো শাসকদলের রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল। শাহ্ কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই পরিস্থিতিতে পুলিশ এবং প্রশাসন রাজনৈতিক চাপের মুখে প্রচণ্ড অসহায় হয়ে পরেছিল। জরুরি অবস্থার পরেও এ সমস্যার সার্বিক সমাধান হয়নি।

জরুরি অবস্থার পরবর্তী রাজনীতি (Politics after emergency)

সবচেয়ে মূল্যবান এবং দীর্ঘস্থায়ী অভিজ্ঞতা জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পরে অর্জিত হয়েছিল যখন লোকসভা নির্বাচন ঘোষিত হয়। ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচন মূলত জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতার উপর জনগণের সার্বিক প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে উত্তর ভারতে জরুরি অবস্থার প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। বিরোধীরা এই নির্বাচনে 'গণতন্ত্র রক্ষা করো'— এই স্লোগানের উপর ভিত্তি করে লড়েছিল। নির্বাচনে জনগণের স্পষ্ট রায় ছিল জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে। এই শিক্ষা ছিল স্পষ্ট যা বেশিরভাগ প্রাদেশিক নির্বাচনেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ ওই রাজ্যগুলোতে জরুরি অবস্থার পক্ষ নেওয়া বা গণতন্ত্র বিরোধী দলগুলো নির্বাচকদের দ্বারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত জনগণের জরুরি অবস্থাকালীন অভিজ্ঞতা ভারতের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরো বেশি মজবুত করেছিল।

লোকসভা নির্বাচন, ১৯৭৭ (Lok Sabha Elections, 1977)

আঠারো মাস ব্যাপী জরুরি অবস্থার পর ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা করে। এর ফলে রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা কারাগার থেকে মুক্তি পায়। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলগুলো নির্বাচনী প্রস্তুতিতে কম সময় পেলেও ওই সময়ে অনেক রাজনৈতিক ঘটনা দ্রুত ঘটতে থাকে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পূর্ব থেকেই বিরোধী দলগুলো একে অপরের কাছাকাছি আসতে সচেস্ট ছিল। নির্বাচনের প্রাক্কালে তাদের পারস্পরিক নৈকট্য আরো সুদৃঢ় হয় এবং তারা সহমতের ভিত্তিতে জনতা পার্টি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন

করেন। নতুন এই দলটি জয়প্রকাশ নারায়ণকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। কংগ্রেস দলের অন্তর্ভুক্ত যে সকল নেতৃবৃন্দ জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করতেন তারাও নতুন এই দলে এসে শামিল হোন। কংগ্রেস দলের অন্য কয়েকজন নেতাও জগজীবন রামের নেতৃত্বে পৃথক একটি দল গঠন করেন। এই দলের নাম ছিল ‘কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি’ (Congress for Democracy) যা পরবর্তীতে জনতা পার্টির সাথে মিশে যায়।

জনতা দল এই নির্বাচনকে জরুরি অবস্থার উপর মানুষের সার্বিক প্রতিক্রিয়ায় বা গণরায়ে (referendum) পরিণত করেছিল। এই দলের প্রচারাভিযানের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও ক্ষমতার মাত্রাতিরিক্ত অপব্যবহার। হাজার হাজার মানুষকে অবৈধভাবে আটক করা, সংবাদপত্রের উপর বিধিনিষেধ ইত্যাদি কারণে জনমত কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে চলে যায়। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার অবিসংবাদিত নেতা ও প্রতীক হিসেবে জয়প্রকাশ নারায়ণ আবির্ভূত হোন। সমবেতভাবে জনতাদল গঠনের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা হয় যাতে কংগ্রেস বিরোধী ভোট বিভাজিত না হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা কংগ্রেসের জন্য কঠিন হয়ে পরেছিল।

তারপরেও নির্বাচনী ফলাফলে প্রত্যেকেই অবাক হন। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবারের মতো লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দল পরাজিত হয়। লোকসভার মাত্র ১৫৪টি আসনে কংগ্রেস দল পরাজিত হয়। লোকসভার মাত্র ১৫৪টি আসনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। দলের ভোট প্রাপ্তির হার ৩৫ শতাংশেরও নীচে চলে যায়। লোকসভার ৫৪২টি আসনের মধ্যে জনতা দল এবং তার জোট সঙ্গীর ৩৩০টি আসনে জয়লাভ করে এবং জনতা দল একাই ২৯৫টি আসনে

মোরারজি দেশাই (১৮৯৬-১৯৯৫) :
স্বাধীনতা সংগ্রামী; একজন গান্ধিবাদী নেতা; খাদি, প্রাকৃতিক উপায়ে চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থার প্রবক্তা, বম্বে স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী; উপ-প্রধানমন্ত্রী (১৯৬৭-১৯৬৯); কংগ্রেস বিভাজনের পর কংগ্রেস (O) তে যোগদান; প্রধানমন্ত্রী ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯— প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী।

আর. কে. লক্ষ্মণ, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৩ মার্চ, ১৯৭৭

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কে হারলো— কে জিতলো এই বিষয়ে একজন ব্যাঙ্গ চিত্র শিল্পীর ভাবনার বহিঃপ্রকাশ, সাধারণ মানুষের সাথে দাঁড়ানো নেতারা হলেন জগজীবন রাম, মোরারজি দেশাই, চরণ সিং এবং অটল বিহারী বাজপায়ী।

জয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। উত্তর ভারতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই রায় ছিল বিশাল। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের প্রায় প্রত্যেকটি নির্বাচনী ক্ষেত্রে কংগ্রেস পরাজয় বরণ করে। রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে মাত্র ১টি করে আসনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। রায়বেরেলি নির্বাচনী ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধি ও আমেথি থেকে তাঁর পুত্র সঞ্জয় গান্ধিও পরাজয়ের সম্মুখীন হন।

কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল সংক্রান্ত মানচিত্রের দিকে তাকলে তোমরা দেখতে পাবে যে সমগ্র দেশেই কংগ্রেস পরাজয় বরণ করেনি। মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং উড়িষ্যায় কংগ্রেস প্রচুর আসন দখল করে এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে কংগ্রেস প্রায় একক ভাবেই জয়লাভ করে। এর পেছনে অবশ্য অনেক কারণ রয়েছে। প্রথমেই বলা যায় যে জরুরি অবস্থার প্রভাব সব রাজ্যে সমান ছিলনা। বলপূর্বক স্থানান্তর, বাস্তুচ্যুতি, অন্যত্র পুনর্বাসন, জোড়পূর্বক বন্ধ্যাত্বকরণ ইত্যাদি বেশিরভাগই সংগঠিত হয়েছিল উত্তরের রাজ্যগুলোতে। অধিকন্তু, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় কিছু দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছিল। উত্তর ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণি কংগ্রেস দল থেকে দূরে সরতে থাকে। তারা জনতা দলকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের মঞ্চ হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বলা যায় যে ১৯৭৭ সালের নির্বাচন সামগ্রিকভাবে শুধুমাত্র জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট কিংবা প্রভাবকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়নি।

জনতা সরকার (Janata Government)

১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পর জনতা দল সরকার গঠন করলেও তার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি ছিল। নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে তিনজন বিশিষ্ট নেতার মধ্যে গভীর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যেমন— মোরারজি দেশাই যিনি ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকেই ইন্দিরা গান্ধির প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন;

১৯৭৭ সালের নির্বাচনের প্রথম অকংগ্রেসীয় কেন্দ্রীয় সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। ছবিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ, জে.বি. কৃপালিনি, মোরারজি দেশাই এবং অটল বিহারী বাজপায়ীকে দেখা যাচ্ছে।

লোকসভার নির্বাচনী ফলাফল ১৯৭৭

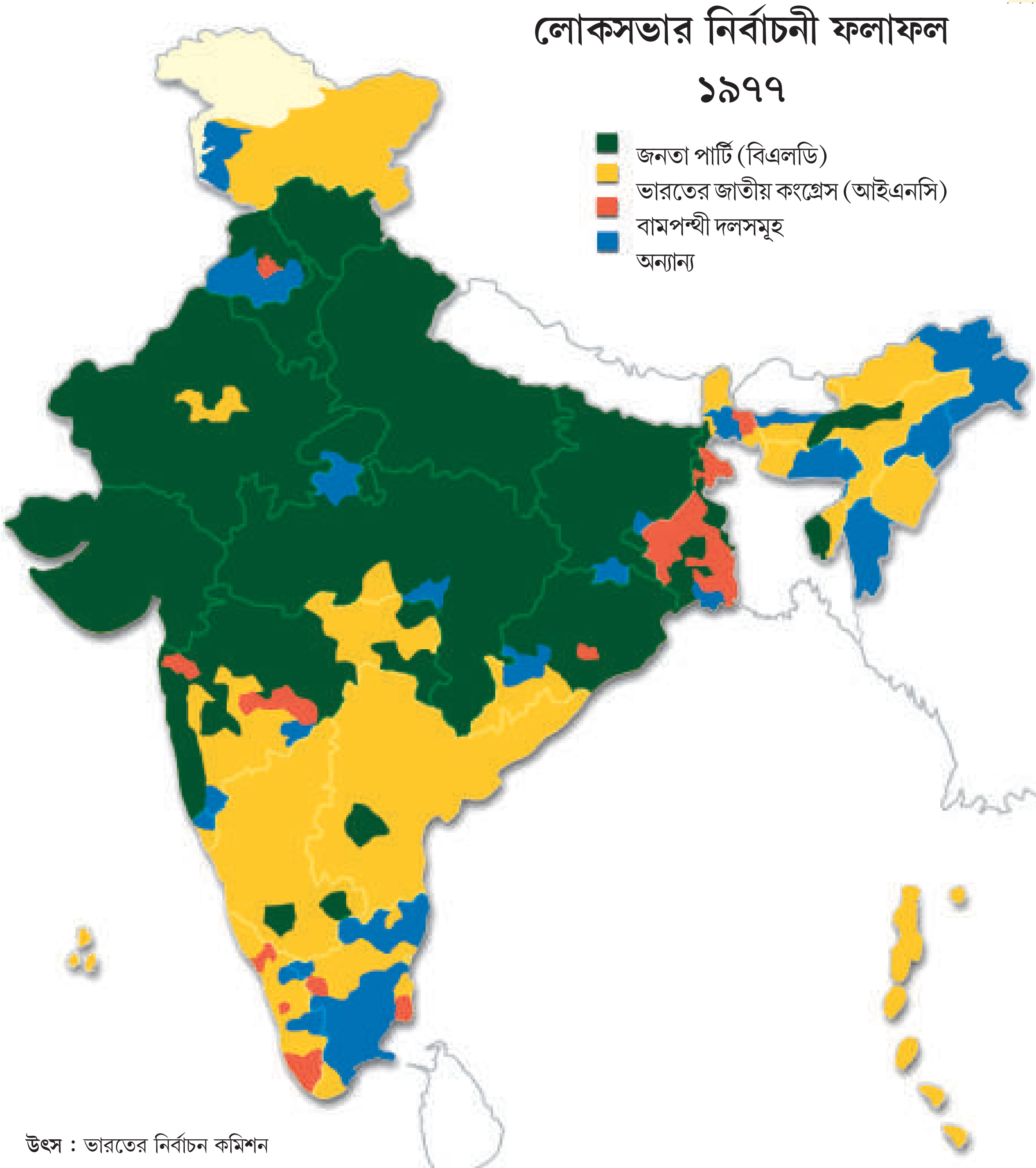

উৎস : ভারতের নির্বাচন কমিশন

দ্রষ্টব্য : এই মানচিত্রটি কোনভাবেই স্কেল দ্বার অঙ্কিত ভারতের মানচিত্র নয়। এখানো দেখানো ভারতের আন্তর্জাতিক সীমারেখা প্রামাণিক সীমারেখা হিসেবে গণ্য হবে না।

এই মানচিত্রে ওই সকল রাজ্যগুলোকে চিহ্নিত করো যেখানে

— কংগ্রেসের পরাজয়,

--- কংগ্রেসের খুব খারাপভাবে পরাজয় এবং

--- ওই সকল রাজ্য যেখানে কংগ্রেস এবং তার জোট সদস্যরা প্রায় মোটামোটিভাবে জয়লাভ করেছে।

উত্তর ভারতের কোন নির্বাচনী ক্ষেত্রে কংগ্রেস জয়লাভ করেছে?

আমরা কীভাবে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে প্রদত্ত গণরায় কিংবা জনমত নিয়ে কথা বলি যখন উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গীকে জনগণ ভোট প্রদান করে।

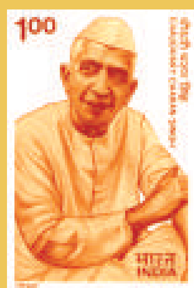

চৌধুরি চরণ সিং (১৯০২-১৯৮৭)

জুলাই ১৯৭৯ থেকে জানুয়ারি ১৯৮০ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী; স্বাধীনতা সংগ্রামী; উত্তর প্রদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়; কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যতম প্রবক্তা; ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস দল ছেড়ে ভারতীয় ক্রান্তি দলগঠন; উত্তর প্রদেশে দুইবারের মুখ্যমন্ত্রী; ১৯৭৭ সালের জনতা দলের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; ১৯৭৭-৭৯ পর্যন্ত উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী; লোকদলের প্রতিষ্ঠাতা।

Credit: Atanu Roy/India Today

Credit: R. K. Laxman in The Times of India, 13 November 1979

Credit: R. K. Laxman in the Times of India

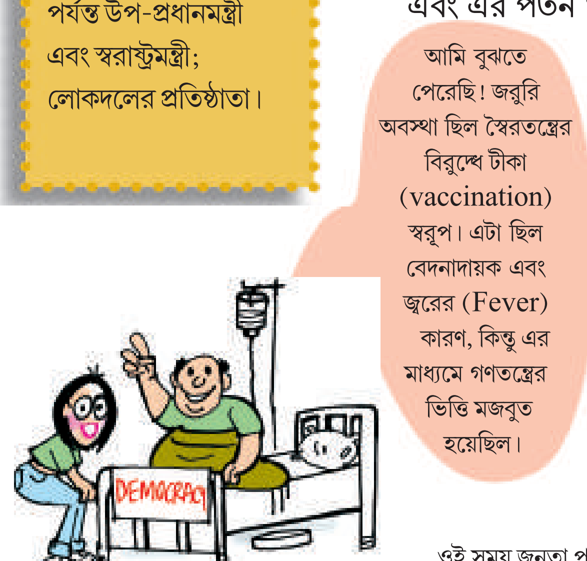

ওই সময় জনতা পার্টির দলীয় বিরোধের উপর অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ব্যঙ্গাচিত্র তৈরি করা হয়েছে। এখানে তার কিছু নির্দশন রয়েছে।

চরণ সিং যিনি ছিলেন উত্তর প্রদেশের কৃষক নেতা এবং ভারতীয় লোকদলের প্রধান; এবং জগজীবন রাম যিনি ছিলেন কংগ্রেস সরকারের বিশাল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন প্রবীণ মন্ত্রী। যদিও শেষ পর্যন্ত মোরারজি দেশাই দেশের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ অলংকৃত করেন, তার পরেও দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরিসমাপ্ত হয়নি।

জরুরি অবস্থার বিরোধিতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা ঐক্যমত জনতা দলে বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। সমালোচকদের মতে জনতা দলের মধ্যে সঠিক নেতৃত্ব, প্রকৃত দিক নির্দেশনা কিংবা যৌথ কর্মসূচি কোনোটাই সুদৃঢ় ছিল না। জনতা দলের সরকারও কংগ্রেসের দ্বারা অনুসৃত নীতি আদর্শ থেকে মৌলিকভাবে সরে আসতে পারেনি। ফলে দলের অভ্যন্তরে বিভাজনের সৃষ্টি হয় এবং মাত্র আঠারো মাসের কম সময়ের মধ্যেই মোরারজি দেশাই পরিচালিত সরকার তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। পরবর্তীতে কংগ্রেস দলের সমর্থনের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে চরণ সিং এর নেতৃত্বে আরেকটি সরকার গঠিত হয়। কিন্তু কংগ্রেস দলের সমর্থন প্রত্যাহারের ফলে চরণ সিং এর সরকার চার মাসের বেশি ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। এর পরিণামে ১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে লোকসভার নির্বাচন সংগঠিত হয় যেখানে জনতা দল বিশালভাবে পরাজিত হয়। বিশেষ করে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে উত্তর ভারতে যেখানে জনতা দল নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছিল সেখানেই এই দলের ভরাডুবি হয়। অন্যদিকে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস দল ১৯৭১ সালের নির্বাচনে বিশাল জয়ের প্রায় পুনরাবৃত্তি ঘটায়। দলটি ৩৫৩ আসনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় পুনরায় ফিরে আসে। ১৯৭৭-৭৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য ছিল আরেকটি বড়ো শিক্ষা, অর্থাৎ ওই সময়ের পরবর্তীতে গড়ে উঠা জনতা দল সরকারের অস্থিতিশীলতা ও অভ্যন্তরীণ বিবাদের কারণে নির্বাচকমণ্ডলী তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেয়।

পরম্পরা (Legacy)

নির্বাচনের এই ফলাফল কি শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধির প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছিল? ১৯৭৭ এবং ১৯৮০ সালের নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে অনেক নাটকীয় পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৬৯ থেকে কংগ্রেস দল নিজেকে এমন এক পৃষ্ঠপোষক সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল যেখানে বিভিন্ন মতাদর্শের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে কংগ্রেস দল নিজেকে একটি বিশেষ মতাদর্শের দ্বারা পরিচিত করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়। দলের এই বিশেষ মতাদর্শ সমাজতান্ত্রিক ও দরিদ্রমুখী উন্নয়ন ভাবধারার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং ১৯৭০ এর দশকের শুরুর দিকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সফলতা সামাজিক ও মতাদর্শগত বিভাজনের ভিত্তিতে জনগণকে নিজের পক্ষে আকর্ষিত করার মধ্যে নির্ভর করতো। তাছাড়া এই সম্পর্কিত ইন্দিরা গান্ধির একক আহ্বানও ছিল দলের মতাদর্শগত ভিত্তি। কংগ্রেস দলের এই ধরনের চারিত্রিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অন্যান্য বিরোধী দলগুলো এমন এক মতাদর্শগত ভিত্তির উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল, ভারতীয় রাজনীতিতে যা 'অকংগ্রেসিবাদ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বিরোধীরা এটাও অনুধাবন করে যে অকংগ্রেসি ভোট ভাগ হতে দেওয়া যাবে না। এই কারণটিই ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বিরোধীদের পক্ষে বৃহত্তরভাবে ভূমিকা গ্রহণ করে।

অপ্রত্যক্ষভাবে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়ন বিষয়টিও ১৯৭৭ এর পর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করা শুরু করে। উপরে উল্লেখিত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি যে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের ফলাফলের পেছনে আংশিক কারণ ছিল উত্তর-ভারতে অবস্থিত পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থানগত পরিবর্তন। লোকসভা নির্বাচনের পর ১৯৭৭ সালে বিভিন্ন রাজ্যেও বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনগুলোতেও উত্তর-ভারতের রাজ্য সমূহে অকংগ্রেসি সরকার প্রতিষ্ঠিত

জগজীবন রাম (১৯০৮-১৯৮৬)
স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বিহার থেকে আগত কংগ্রেসের অন্যতম নেতা; ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী (১৯৭৭-৭৯); গণপরিষদের সদস্য; ১৯৫২ সাল থেকে আমৃত্যু সংসদের সদস্য; স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভার শ্রমমন্ত্রী; ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী; একজন বিদ্বান এবং সুদক্ষ প্রশাসক।

Credit: India Today

নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

Credit: R. K. Laxman in the Times of India

১৯৮০ সালের নির্বাচনের পর প্রকাশিত ব্যঙ্গাচিত্র।

হয়, যেখানে পিছিয়ে পরা জাতিগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। "অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির" জন্য সংরক্ষণ ইস্যুটি বিহারে অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয় হিসেবে পরিণত হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রের জনতা সরকার মণ্ডল কমিশন গঠন করে। এ বিষয়ে এবং রাজনীতিতে পশ্চাদপদ শ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে তোমরা এ বইটির সর্বশেষ অধ্যায়ে অনেক কিছু জানতে পারবে। জরুরি অবস্থার পরে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সমূহে দলীয় রাজনীতিতে এই ধরনের পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হতে থাকে।

জরুরি অবস্থা ও তার আশপাশের সময়কালকে সংবিধানিক সঙ্কটকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এই সময়ে সংসদ এবং বিচার ব্যবস্থার আওতাভুক্ত এলাকা নিয়ে উদ্ভুত সংবিধানিক বিবাদ সংগঠিত হতে শুরু করে। অন্যদিকে এ সময়কে রাজনৈতিক সঙ্কটকাল হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। ওই সময়ে ক্ষমতাসীন দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও এর নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক কর্ম প্রক্রিয়া স্থগিত করার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাগণ বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক দলসমূহ মৌলিকভাবে গণতান্ত্রিক নীতি আদর্শ সবসময় মেনে চলবে। এমন কি জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতাও সরকার আইনের শাসন অনুসারে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হবে। তাই জরুরি অবস্থাকালীন সময়েও সরকার তার অধীনে থাকা বিস্তৃত ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহার করবে– এটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল। কিন্তু সরকার জরুরি অবস্থার সময়ে প্রাপ্ত বিশাল ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল। ফলে সেই সময়ে সাংবিধানিক সঙ্কটের চেয়েও মারাত্মক ছিল রাজনৈতিক সঙ্কট।

এই সময়ে আবির্ভূত অন্য একটি সঙ্কট ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলন। এই পরিস্থিতিতে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত গণঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে গড়ে উঠা গণতন্ত্রের মধ্যে টানাপোড়ন শুরু হয়। এই টানাপোড়নের মূল কারণ ছিল জনগণের প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির অসামর্থতা। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা এধরনের জটিলতা সম্পর্কে অধ্যায়ন করার চেষ্টা করব। বিশেষ করে আমরা বিভিন্ন গণআন্দোলন এবং আঞ্চলিক পরিচয় ও বিষয়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিতর্ক সম্পর্কে অধ্যায়ন করবো।

চলো ছায়াছবিটি দেখি

হাজারো খোয়াহিশে এয়সে

সিদ্ধার্থ, বিক্রম এবং গীতা— এই তিনজন হলেন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত উদ্দীপ্ত বিদ্যার্থী। দিল্লি থেকে স্নাতক ডিগ্রি নেওয়ার পর তিনজনই আলাদা আলাদা পেশায় নিযুক্ত হন। তাদের মধ্যে সিদ্ধার্থ সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিপ্লবী মতাদর্শের একজন সমর্থক ছিল। বিক্রম যে-কোনো মূল্যে জীবনে সফল হওয়ার পথ অনুসরণের পক্ষ নিয়েছিল। এই চলচ্চিত্রটিতে নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর নিমিত্তে অনুসৃত যাত্রাপথ এবং এ ক্ষেত্রে তাদের অসফলতা ও হতাশার কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে?

এই ছবিটি ১৯৭০ এর দশকের সার্বিক পরিস্থিতির পটভূমিতে নির্মাণ করা হয়েছে। ছবির তিনজন চরিত্র ওই সময়ের বিরাজমান জীবন আদর্শ ও প্রত্যাশার প্রতিনিধিত্ব করছে। সমাজে বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ও এরজন্য একটি মঞ্চ গড়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধার্থ সফল হতে পারেনি। কিন্তু তারপরেও সে দরিদ্র মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পরেছিল, তার মনে হয়েছে বিপ্লবের চেয়ে তাদের উন্নতি সাধন করা অনেক বেশি প্রয়োজন। অন্যদিকে বিক্রম একজন প্রথাগত রাজনৈতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে, তবে একাজে সে খুব একটা সফল হয়নি।

সাল : ২০০৫
পরিচালক : সুধীর মিশ্র
চিত্রনাট্য : সুধীর মিশ্র, রুচি নারায়েন, শিবকুমার সুব্রামণিয়ম
অভিনয়ে : কে.কে. মেনন, সাইনি আহুজা, চিত্রাঙ্গাদা সিং।

অনুশীলনী

1. জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত নীচের মন্তব্যগুলোর সঠিক কিংবা ভুল হিসেবে চিহ্নিত করো।
   (a) ইন্দিরা গান্ধি ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করেন।
   (b) জরুরি অবস্থার কারণে মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়।
   (c) অর্থনীতিতে ধস নামার কারণে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়।
   (d) বহু সংখ্যক বিরোধী দলের নেতারা জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে গ্রেপ্তার হয়।
   (e) সিপিআই জরুরি অবস্থার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল।
2. নিম্নলিখিত ধারণাগুলোর মধ্যে কোনটি জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে অমিল
   (a) সর্বাত্মক বিপ্লবের আহ্বান।
   (b) ১৯৭৪ সালের রেল ধর্মঘট।
   (c) নকশালবাদী আন্দোলন।
   (d) এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়।
   (e) শাহ্ কমিশন রিপোর্টের পর্যবেক্ষণ।
3. নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলো মেলাও

(a) সর্বাত্মক বিপ্লব	i. ইন্দিরা গান্ধি
(c) গরিবী হটাও	ii. জয়প্রকাশ নারায়ণ
(b) ছাত্র আন্দোলন	iii. বিহার আন্দোলন
(d) রেল ধর্মঘট	iv. জর্জ ফার্নান্ডেজ

4. ১৯৮০ সালের মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের কারণগুলো কী ছিল?
5. ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি সরকার শাহ্ কমিশনকে নিযুক্ত করেছিল। কেন এই কমিশনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং এই কমিশনের পর্যবেক্ষণ কী ছিল?
6. ১৯৭৫ সালের জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে সরকার কী কী কারণ দেখিয়েছিল?
7. ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বিরোধী দল প্রথমবারের মতো কেন্দ্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এটা কী কারণে সম্ভব হয়েছিল বলে তুমি মনে করো?
8. নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর কী প্রভাব ফেলেছিল।
   - নাগরিকদের পৌর স্বাধীনতার উপর প্রভাব
   - শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের সম্পর্কের উপর প্রভাব
   - গণমাধ্যমের কার্যাবলি।
   - পুলিশ এবং আমলাতন্ত্রের কার্যক্রম।
9. ভারতের দলীয় ব্যবস্থা জরুরি অবস্থার কী প্রভাব বিস্তার করেছিল? উদাহরণ সহকারে তোমার উত্তরের বিশ্লেষণ করো।

10. রচনাংশটি পড় এবং নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভারতীয় গণতন্ত্র কখনো ততটা দ্বিদলীয় ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পরেনি যতটা ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ঝুঁকেছিল। যদিও এর পরবর্তী কয়েক বছর সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছিল। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পরে ..... জনতা দলকেও অনেক গভীর সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল ..... ডেভিড বাটলার অশোক লাহিড়ী এবং প্রণয় রায়। — পার্থ চ্যাটার্জি

(a) ১৯৭৭ সালে ভারতের দলীয় ব্যবস্থা কেন প্রায় দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল ?

(b) ১৯৭৭ এ দুই এর অধিক রাজনৈতিক দল সক্রিয় ছিল। তাহলে কেন লেখকগণ ওই সময়কে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার সময়কাল বলে অভিহিত করেন ?

(c) কংগ্রেস এবং জনতাদলে কী কী কারণে ভাঙন ধরেছিল ?

এই পৃষ্ঠায় ও পরবর্তী পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ছবিতে চিপকো আন্দোলনের নেতা এবং অংশীদারদের দেখা যাচ্ছে। এই আন্দোলনটি দেশের প্রথম পরিবেশ আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃত।

এই অধ্যায়ে (In this chapter)...

স্বাধীনতার তিন দশক পরে, জনগণ অধৈর্যশীল হতে শুরু করে। তাদের অসন্তুষ্টি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা ইতোমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকট ও নির্বাচনী বিপর্যয় সম্পর্কে জানতে পেরেছি। যদিও অসন্তুষ্টির এটাই একমাত্র রূপ ছিল না। যার মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিল। ১৯৭০-এর দশকে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী যেমন— নারী, ছাত্রছাত্রী, দলিত এবং কৃষকরা অনুধাবন করতে শুরু করে যে গণতান্ত্রিক রাজনীতি তাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। সুতরাং, তারা তখন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ছত্রছায়ায় একসাথে মিলিত হয়ে নানাহ প্রকারের দাবি-দাওয়া উত্থাপন করতে শুরু করে। এই ধরনের দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় রাজনৈতিতে নতুন করে সামাজিক কিংবা নাগরিক আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠে।

এই অধ্যায়ে ১৯৭০ এর পরে উত্থিত বিভিন্ন সামাজিক ও নাগরিক আন্দোলনের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানতে চেস্টা করবো, যাতে আমরা বুঝতে পারি :

- গণআন্দোলনগুলো কী কী?
- ভারতীয় সমাজের কোন গোষ্ঠীগুলো এতে যুক্ত হয়েছিল?
- এই আন্দোলনগুলোর মূল এজেন্ডা বা বিষয় কী ছিল?
- আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল?

অধ্যায় 7

গণ-আন্দোলনের উত্থান
(Rise of popular movements)

গণ-আন্দোলনের প্রকৃতি
(Nature of popular movements)

এই অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ছবিটির দিকে তাকাও। তুমি এতে কি দেখছ? গ্রামবাসীরা সোজাসুজি একটি গাছকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কি কোনো খেলা খেলছে? অথবা কোনো আচরণ কিংবা উৎসবে অংশগ্রহণ করছে? আসলে না। এই ছবিটি যৌথ কর্মসূচির একটি অপ্রথাগত রূপকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। যাতে বর্তমান উত্তরাখণ্ডের একটি গ্রামে ১৯৭৩ সালের শুরুতে নারী ও পুরুষেরা মিলেমিশে অংশগ্রহণ করেছিল। এই গ্রামবাসীরা আসলে সরকার দ্বারা অনুমোদিত বাণিজ্যিক বৃক্ষনিধন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। তাদের প্রতিবাদের একটি অভিনব পদ্ধতি ছিল জড়িয়ে ধরে গাছকে নিধন থেকে রক্ষা করা। এই ধরনের অভিনব প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত পরিবেশ আন্দোলন শুরু হয়, যার নাম চিপকো আন্দোলন।

চিপকো আন্দোলন (Chipko movement)

এই আন্দোলন উত্তরাখণ্ডের দুই বা তিনটি গ্রামে প্রথম শুরু হয়েছিল। সেই সময় বনদপ্তর এ্যাশ (ash) গাছ কেটে কৃষি উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের বাঁধা দিয়েছিল। অথচ, এই বন দপ্তরই বাণিজ্যিক সামগ্রী নির্মাণের জন্য ক্রীড়া সরঞ্জাম উৎপাদক কোম্পানিকে ওই বৃক্ষগুলো কাঁটার জন্য অনুমোদন দিয়েছিল। এই দ্বিমুখী আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে গ্রামবাসীরা সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই বিক্ষোভ আন্দোলন ক্ষণকালের মধ্যে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই অঞ্চলের বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের মতো বিষয়গুলো আন্দোলনের প্রধান ইস্যুতে পরিণত হয়। গ্রামবাসীদের দাবি ছিল

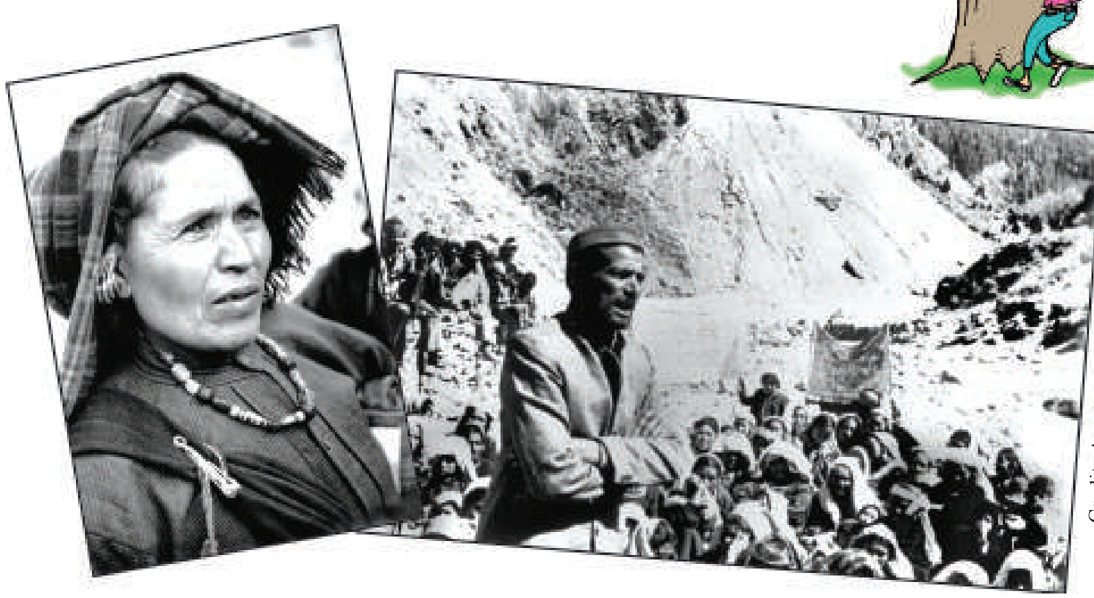

উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে সংগঠিত চিপকো আন্দোলনের প্রথম দিকের দুটি ঐতিহাসিক ছবি।

Credit: Anupam Mishra

কোনো বহিরাগত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে গাছ কাঁটা সম্পর্কিত কোনরূপ চুক্তিতে আবন্ধ হওয়া যাবে না এবং স্থানীয় জঙ্গল, ভূমি এবং জলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার গ্রামবাসীদের হাতে দিতে হবে। তারা আরো দাবি করে যে সরকার যেন ক্ষুদ্র শিল্পগুলোকে স্বল্পমূল্যের উপকরণ সরবরাহ করেন যাতে বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যের ক্ষতি না করে এই অঞ্চলের উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি এই আন্দোলন বনাঞ্চলের ভূমিহীন শ্রমিকদের অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকেউ তাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য দাবি করতে থাকে।

চিপকো আন্দোলনের একটি অভিনব দিক ছিল নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এই অঞ্চলের ঠিকেদাররা সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে পুরুষদের মদ সরবরাহ করত। ফলে নারীরা মদ্যপানজনিত অভ্যাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে এবং অন্যান্য সামাজিক ইস্যুগুলোকেও তাদের আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করে। এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হয় যখন সরকার পনেরো বছরের জন্য গোটা হিমালয় অঞ্চলের গাছ কাঁটা নিষিদ্ধ করে, যাতে এই এলাকার সবুজায়ন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকন্তু, চিপকো আন্দোলন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে শুরু হলেও তা ১৯৭০ এর দশকে ও তারপরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উত্থিত নানাহ গণআন্দোলনের প্রতীক ও অনুপ্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। এই অধ্যায়ে আমরা এই ধরনের কিছু আন্দোলন সম্পর্কে পর্যালোচনা করব।

দলভিত্তিক আন্দোলন (Party based movement)

গণআন্দোলন সমূহ কখনো কখনো সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে এবং একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের জাতীয় আন্দোলন ছিল মূলত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে, ঔপনিবেশিক শাসনকালে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইস্যু সমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা বিভিন্ন কর্মসূচি স্বাধীন সামাজিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। যেমন– বিংশ শতকের প্রথম দিকে সংগঠিত জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন, কৃষাণ সভা এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। এইসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ সামাজিক সমস্যাগুলোকে সরকার ও জনসমক্ষে উত্থাপন করা হয়েছিল।

এদের মধ্যে কিছু আন্দোলন দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অব্যাহত থাকে। শিল্প কারখানার শ্রমিকদের উপর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই শিল্প কারখানাগুলো মুম্বাই, কলকাতা এবং কানপুরের মতো বড় বড় শহরে অবস্থিত ছিল। শ্রমিক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার জন্য সকল বৃহৎ রাজনৈতিক দলই নিজ নিজ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানায় কৃষকদের সুবিশাল আন্দোলন সংগঠিত হয়। তাদের মূল দাবি ছিল কৃষকদের জন্য ভূমির পুনর্বণ্টন করা। অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং তৎসংলগ্ন বিভিন্ন অংশে মার্কস ও লেনিনবাদী সংগঠনের নেতৃত্বে কৃষক এবং কৃষিভিত্তিক শ্রমজীবী সম্প্রদায় তাদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা স্বাধীনতার পরেও বজায় রাখে। মার্কস ও লেনিনবাদী শ্রমিকরা একসময় নক্সালবাদী হিসেবে পরিচিত ছিল। (পূর্বের অধ্যায়ে তোমরা নক্সালবাদী আন্দোলন সম্পর্কে ইতোমধ্যেই অনেক কিছু জানতে পেরেছো)। অর্থনৈতিক অবিচার এবং বৈষম্যতা ছিল কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের মৌলিক বিষয়।

আমি এটা বুঝতে পারছি না। রাজনৈতিক দল ছাড়া তুমি কীভাবে রাজনীতি করবে?

উল্লেখিত আন্দোলনগুলো নির্বাচনী রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করত না। তবে রাজনৈতিক দলের সাথে তাদের যোগসূত্র বজায় থাকত। আন্দোলনগুলোর সাথে জড়িত ব্যক্তি, অংশগ্রহণকারী জনগণ কিংবা সংগঠন রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতেন। এই যোগসূত্রতার কারণেই সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন দাবি-দাওয়া দলীয় রাজনীতিতে প্রতিফলিত হতো।

দলহীন আন্দোলন (Non-party movement)

১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশকে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হয়ে পরে। এই বিভ্রান্তির আশু কারণ ছিল জনতা সরকারের ব্যর্থতা এবং তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা। তবে বিভ্রান্তির দীর্ঘস্থায়ী কারণ ছিল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিমালা। স্বাধীনতার পর আমাদের গৃহীত পরিকল্পিত উন্নয়নের দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিকাশে সুষম বণ্টন। তৃতীয় অধ্যায়ে তোমরা এই সম্পর্কে জানতে পেরেছো। পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রথম বিশ বছরে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির আকর্ষণীয় হার সত্ত্বেও দারিদ্রতা এবং বৈষ্যমতা প্রায় সর্বত্রই কম বেশি বিরাজমান ছিল। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের লভ্যাংশ সমাজের সর্বত্র সুষমভাবে বণ্টিত হয়নি। চলমান সামাজিক বৈষম্য যেমন জাতি ও লিঙ্গাভেদ দারিদ্রতার ইস্যুটিকে আরো বেশি তীক্ষ্ণ ও জটিল করে তুলে। শহুরে শিল্পক্ষেত্র ও গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে উন্নয়নের আকাশ-পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজের সর্বস্তরেই অন্যায় এবং বঞ্চনা অনুভূত হতে থাকে।

এহেন পরিস্থিতিতে অনেকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় গোষ্ঠী চলমান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচনী রাজনীতিতে তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা দলীয় রাজনীতির বাইরে এসে গণআন্দোলনের মাধ্যমে তাদের প্রতিবাদ জানতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের যুবা রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রসমাজ নিজ নিজ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে দলিত এবং আদিবাসীদের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সমূহকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মধ্যবর্তী শ্রেণির যুবকর্মীরা গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য পরিসেবামূলক সংগঠন তৈরি ও গঠনমূলক কর্মসূচির সূচনা করে। এই ধরনের সামাজিক কাজকর্মের সেবামূলক চরিত্রের জন্য অধিকাংশ সংস্থাই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো দলীয় রাজনীতির বাইরে থাকতেই পছন্দ করে। স্থানীয় কিংবা আঞ্চলিক নির্বাচনী রাজনীতিতে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত না এবং কোন রাজনৈতিক দলকে সরাসরি সমর্থনও করত না। এদের অনেকেই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করত কিন্তু রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণ করতে চাইতে না। যার ফলে এসব সংগঠনকে ‘দলহীন রাজনৈতিক সংগঠন’ বলা হতো। তারা মনে করতো যে রাজনৈতিক দলের তুলনায় স্থানীয় নাগরিকদের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধানে আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে। তাছাড়া এটাও আশা করা হয়েছিল যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক সরকারের চরিত্রকে সংস্কার করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এই সমস্ত সেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো এখনও শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় কার্যকর রয়েছে। তবে তাদের চরিত্রের অনেক পরিবর্তন এসেছে। সাম্প্রতিককালে এই সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংস্থা সহ বিভিন্ন বহিরাগত প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। এই সংগঠনগুলো দ্বারা বিশাল আকারের বহিরাগত অনুদান প্রাপ্তির ফলে স্থানীয় উদ্যোগ সমূহের আদর্শ অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে।

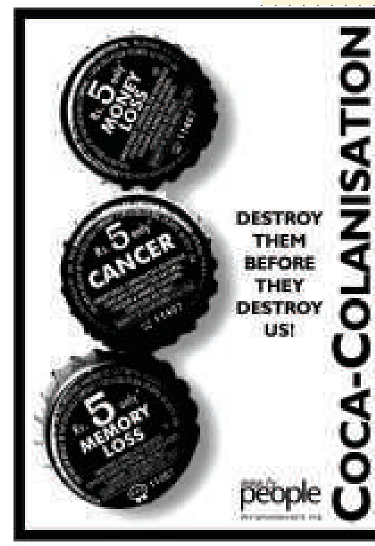

এখানে প্রদত্ত পোস্টরগুলোর মতো সাজানো প্রতিচ্ছবির দ্বারা গণান্দোলনসমূহ অনুপ্রাণিত হয়। প্রকাশিত তিনটি পোস্টার (উপর থেকে নীচে) কোকাকোলা শিল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, রাজপথ নির্মাণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং সেভ প্যারিয়ার নদী আন্দোলন থেকে সংগৃহীত করা হয়েছে।

নামদেও ধাসাল

শতবর্ষব্যাপী ভ্রমণশীল এ মানুষগুলো সূর্যের মতো 'পিঠ দেখিয়ে'।
এখন, এখন আমাদেরও বলতে হবে চলবো না আর অন্ধকারে যাত্রী হয়ে।
এক অন্ধকারকে বয়ে বয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষেরাও বেঁকে গেছে;
এখন, এখন আমাদেরকেও তাদের পিঠ থেকে বোঝা সরাতে হবে।
এই মহান শহরের জন্য আমাদেরও ঝরেছিল রক্ত নিথর
আর পরিবর্তে আমরা পেয়েছি খাবার হিসেবে পাথর
এখন, এখন আমরাও গুড়িয়ে দেবো গগনচুম্বী প্রাসাদ!
হাজার বছর পরে ধন্য আমরা পেয়ে সূর্যমুখীর মতো ফকিরং;
এখন, এখন সূর্যমুখীর মতো আমরাও হব সূর্যমুখী বীর।

নামদেও ধাসালের লেখা গোলপিঠের মারাঠী কবিতা।

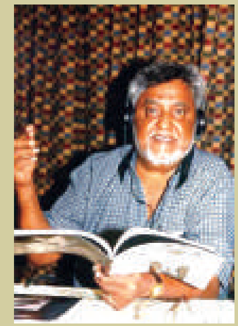

দলিত প্যান্থার্স (Dalit Panthers)

বিখ্যাত মারাঠি কবি নামদেও ধাসালের কবিতাটি পর। তোমরা কি জান এই কবিতায় অন্ধকারের যাত্রী কারা এবং তাদেরকে উদ্ধারকারী সূর্যমুখীর মতো ফকির কে? এখানে যাত্রী বলতে দলিত সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে যারা আমাদের সমাজে সুদীর্ঘ কালব্যাপী ভয়ানক জাতিভিত্তিক অন্যায় অত্যাচারের শিকার। কবিতায় সূর্যমুখীর মতো ফকির তাদের মুক্তির দূত ড: আম্বেদকরকে বোঝানো হয়েছে। সত্তর-এর দশকে মহারাষ্ট্রের দলিত কবিরা এই ধরনের অনেক কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাগুলো ছিল স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও দলিত সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রমাগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তবে এই কবিতাগুলোতে ভবিষ্যতের প্রত্যাশার কথাও বিব্রত হয়েছে। এই প্রত্যাশাগুলো ছিল দলিতদের নিজের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জীবন গঠনের ইচ্ছা। তোমরা ড: বি আর আম্বেদকরের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যের কথা নিশ্চই জানো। তোমরা এটাও জানো যে হিন্দুদের জাতিভিত্তিক সামাজিক অবকাঠামোর বাইরে নিয়ে এসে দলিতদের মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যত নির্মাণের ক্ষেত্রে ড: আম্বেদকর কী ধরনের নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে ছিল। এটা মোটেই অবাক হওয়ার মতো নয় যে দলিতদের মুক্তি সম্পর্কিত লেখনিগুলোতে ড: বি আর আম্বেদকর হলেন একজন প্রবাদপ্রতিম পুরুষ।

উৎস (Source)

ওই সময়ের পর থেকে দলিতদের অবস্থার কি বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়েছে? আমি সবসময়ই দলিতদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের ঘটনাগুলো সম্পর্কে পড়াশোনা করি। এই ক্ষেত্রে আন্দোলনগুলো কি ব্যর্থ? অথবা এটা কি সমগ্র সমাজেরই ব্যর্থতা?

উনিশশো সত্তরের দশকের শুরুতে প্রথম প্রজন্মের দলিত স্নাতকরা বিশেষ করে যারা শহুরে বস্তিতে বসবাস করত, তারা বিভিন্ন আন্দোলনের মঞ্চ থেকে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে শুরু করে। এর অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালে মহারাষ্ট্রে দলিত সম্প্রদায়ের যুবকরা দলিত প্যান্থারস নামে একটি সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দলিত সম্প্রদায়ের মূল সংগ্রাম ছিল জাতিভিত্তিক বৈষম্য এবং বস্তুগত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কারণ সাম্য এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির পরেও দলিতদের উপর নিপীড়নের মাত্রা থেকে থাকেনি। সংরক্ষণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন এবং সামাজিক ন্যায় সম্পর্কিত অন্যান্য নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগের নিশ্চয়তা ছিল তাদের মূল দাবিগুলোর অন্যতম।

তোমরা জান যে ভারতের সংবিধান অস্পৃশ্য প্রথাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে সরকার বহু আইন চালু করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দলিতদের

বিরুদ্ধে সামাজিক বৈষম্য ও প্রতিহিংসা থেমে থাকেনি। একই গ্রামের দলিতদের আবাদি ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত থাকত। পানীয় জলের মতো সার্বিক উৎসগুলোতে দলিতদের অধিকার অস্বীকার করা হতো। দলিত নারীদের কোনো স্বীকৃত মর্যাদা ছিল না। ক্ষুদ্র এবং নামমাত্র ইস্যুতে দলিতদের উপর জাতিগত আভিজাত্যের নামে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হতো। দলিতদের বিরুদ্ধে এই ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন বন্ধ করতে আইনি সংস্থাগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করত না। অন্যদিকে দলিতদের দ্বারা সমর্থিত রাজনৈতিক দল যেমন– ভারতের রিপাবলিক পার্টিও নির্বাচনী রাজনীতিতে সফলতা লাভ করতে পারেনি। এধরনের রাজনৈতিক দল চরিত্রগতভাবে ছিল প্রান্তীক। ফলে অন্যদলের সাথে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়তে হতো। নির্বাচনে জয়লাভ করলেও বিভিন্ন ইস্যুতে এদের মধ্যে ভাঙন দেখা দিত। ফলশ্রুতিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় দলিত প্যান্থার্সরা গণকর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

এপার্থেইড (Apartheid), এর অর্থ হল 'বিচ্ছিন্নতা' বা 'বর্ণবাদ' বিচ্ছিন্নতা বলতে এখানে জাতিগত বৈষম্যের ওই সকল সরকারি নীতিমালাকে বোঝানো হয়েছে যা বিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় কার্যকর ছিল। এই ব্যবস্থাকে কেন গুপ্ত বর্ণবাদ বলা হয়? অন্যখানেও কি এই ধরনের উদাহরণ রয়েছে?

কর্মকাণ্ড (Activities)

দেশের বিভিন্ন জায়গায় দলিতদের উপর সংগঠিত ক্রমবর্ধমান নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই ছিল দলিত প্যান্থার্সদের কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দু। দলিত প্যান্থার্স ও অন্যান্য সমভাবাপন্ন সংগঠনগুলোর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদ আন্দোলনের কারণে ১৯৮৯ সালে সরকার দলিতদের উপর নিপীড়ন রোধ করার জন্য একটি সর্বজনীন আইন প্রণয়ন করে যার মধ্যে এসব নিপীড়নকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়। প্যান্থার্সদের মতাদর্শগত মূল ইস্যু ছিল জাতিভেদ প্রথার বিলুপ্তি সাধন এবং ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক ও শহুরে কারখানার শ্রমিকদের সহ সকল নিপীড়িত অংশের মানুষদের নিয়ে একটি বৃহত্তর সাংগঠনিক মঞ্চ গড়ে তোলা।

এই ধরনের আন্দোলন শিক্ষিত দলিত যুবকদের জন্য এমন একটি মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেখানে তারা নিজেদের সৃজনশীল কর্মগুলোকে প্রতিবাদের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ওই সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্য কর্মে দলিত লেখকগণ বিভিন্ন জীবনীমূলক কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে জাতিভেদ প্রথার নৃশংসাতার বিরোধিতা করেছিলেন। এসব সাহিত্যকর্মে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার নির্যাতিত অংশের মানুষের করুণ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা হয়েছিল। মারাঠি সাহিত্য জগতে এগুলো ছিল প্রচণ্ড অভিঘাত এবং এর ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আরো সর্বজনীন হয়েছিল। পাশাপাশি সাহিত্য সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই পরিস্থিতিতে সংস্কৃতির জগতে সাহিত্য কর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জরুরি অবস্থার পরে দলিত প্যান্থার্সরা নির্বাচনী সমঝোতায় জড়িয়ে পরে। তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ভাঙন দেখা

দিলে ধীরে ধীরে এর সাংগঠনিক শক্তির পতন হতে থাকে। বিভিন্ন সংগঠন যেমন 'ব্যাকওয়ার্ড এন্ড মাইনরিটি কমিউনিটিস এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (Backword and Minority Communities Employees Federation (BAMCEF)) পরবর্তীতে প্যান্থার্সদের শূন্যস্থান পূরণ করে।

ভীরতীয় কিষাণ ইউনিয়ন (Bharatiya Kisan Union)

সত্তরের দশক থেকে ভারতীয় সমাজের অসন্তুষ্টি ছিল বহুমাত্রিক, এমনকি যে সকল গোষ্ঠী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আংশিকভাবে হলেও উপকৃত হয়েছিল তারাও রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ জানাতে থাকে। আশির দশকের কৃষক সংগ্রাম হলো এমনই একটি উদাহরণ যেখানে অপেক্ষাকৃত সংগতি সম্পন্ন কৃষকরাও রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করে।

বিকাশ (Growth)

১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রায় বিশ হাজার কৃষক উত্তর প্রদেশের মীরাট শহরে জমায়েত হন। তারা বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। কৃষকরা জেলা কালেক্টরের অফিসের সামনে তিন সপ্তাহ ধরে শিবির করে অবস্থান করেছিল। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করেছিল। এটা ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ কৃষক আন্দোলন। অবস্থানকালে পাশের গ্রাম থেকে কৃষকদের খাবার সরবরাহ করা হতো। মিরাট বিক্ষোভ ছিল গ্রামীণ শক্তির বিশাল প্রদর্শন। গ্রামীণ শক্তির অর্থ হল দরিদ্র ও কৃষকদের শক্তি। আন্দোলনকারী কৃষকরা ছিলেন ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের (BKU) সদস্য। এই সংগঠনটি পশ্চিম উত্তর প্রদেশ ও হরিয়ানা অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠন। এটি আশির দশকে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনে সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং পশ্চিমী উত্তর প্রদেশের কৃষকগণ ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে সরকার দ্বারা গৃহীত 'সবুজ বিপ্লবের' নিয়মাবলি দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল। ওই সময় থেকে এসব অঞ্চলে চিনি এবং গম নগদ আয়ের অন্যতম পণ্যে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কারণে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় নগদ পণ্য বাজার সংকটে পরে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের ঐকান্তিক দাবি সমূহ ছিল সরকার যেন আখ এবং গম অধিক মূল্যে ক্রয় করে, কৃষি পণ্যের আন্তঃরাজ্যে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বিবিধ নিষেধ বিলুপ্ত করে, উচিত মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, ঋণ পরিশোধে সহজ কিস্তির ব্যবস্থা করে এবং কৃষকদেরকে সরকারি ভাতা প্রদান করে।

Credit: Hindustan Times

পাঞ্জাবে ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন দ্বারা সংগঠিত সমাবেশ।

অন্যান্য কৃষক সংগঠনগুলোও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুরূপ দাবি জানাতে থাকে। মহারাষ্ট্রের শেটকারী সংগঠন ঘোষণা করেছিল যে কৃষক আন্দোলন হলো ইন্ডিয়ার (শহুরে

শিল্প ক্ষেত্র) বিরুদ্ধে ভারতের (গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্র) যুদ্ধ। তৃতীয় অধ্যায়ে তোমরা ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছো যে ভারতীয় উন্নয়ন রূপরেখার অন্যতম বিষয় ছিল কৃষি বনাম শিল্পক্ষেত্রের ধারাবাহিক বিতর্ক ও প্রতিযোগিতা। অনুরূপ বিতর্ক আশির দশকে পুনরায় দেখা দেয় যখন অর্থনৈতিক উদারবাদী নীতিমালা বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্র সংকটের মুখোমুখি হয়।

আমি কখনো এমন একজনের সাক্ষাত পাইনি যে কৃষক হতে ইচ্ছুক। আমাদের জন্য কি দেশে কৃষক থাকার প্রয়োজন নেই?

বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics)

দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারের উপর চাপসৃষ্টি করার নিমিত্তে ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন যেসকল কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তারমধ্যে অন্যতম ছিল সমাবেশ, প্রদর্শন, ধর্না, জেলভরো আন্দোলন ইত্যাদি। এই সকল প্রতিবাদ আন্দোলনে পশ্চিমী উত্তর প্রদেশ ও তার আশপাশের অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের প্রায় দশ হাজার থেকে লক্ষাধিক কৃষক পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছিল। গোটা আশিরদশক জুড়ে কিষাণ ইউনিয়ন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রধান কার্যালয়সমূহ এমনকী দেশের রাজধানীতেও কৃষকদের নিয়ে বিশাল আকারের সমাবেশ সংগঠিত করেছিল। এই আন্দোলনের একটি অভিনব দিক ছিল সমাবেশগুলোতে কৃষকদের মধ্যে জাতিভিত্তিক যোগাযোগের ইতিবাচক ব্যবস্থা। ইউনিয়নের বেশিরভাগ সদস্যরাই একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ইউনিয়ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথাগত জাতিভিত্তিক পঞ্চায়েতগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ইস্যুতে সমন্বয় সাধন করতে সামর্থ্য হয়েছিল। নিয়মমাফিক সংগঠন না হয়েও কিষাণ ইউনিয়ন সদস্যদের বংশগত বা গোষ্ঠীগত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে সকলকে নিয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত টিকে থাকতে সক্ষম হয়। সংগঠনের তহবিল, সহায় সম্পদ এবং কর্মসূচি এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যমে আবর্তিত হয়েছিল।

নব্বই-এর দশকের শুরু পর্যন্ত ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন সকল প্রকার রাজনৈতিক দল থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিল। সংখ্যাধিক্যের শক্তির জোড়ে এই সংগঠন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে নিজ কর্মসূচি কার্যকর করেছিল। দেশের অন্যান্য কৃষক সংগঠনের সাথে মিলে কিষাণ ইউনিয়ন তাদের কিছু অর্থনৈতিক দাবি আদায়ে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে আশির দশকে সংগঠিত সকল সামাজিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে কৃষক আন্দোলন ছিল অন্যতম। এই আন্দোলনের সফলতার মূলে ছিল সদস্যদের রাজনৈতিক দর কষাকষির অভাবনীয় ক্ষমতা। তবে এই আন্দোলন দেশের তুলনামূলকভাবে উন্নত রাজ্যগুলোতেই বেশি সক্রিয় ছিল। ভারতীয় কৃষকদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকার জন্য শুধু গ্রামীণ কৃষিতে নির্ভর ছিল তাদের বিপরীতে কিষাণ ইউনিয়নের মতো সংগঠনগুলোর কৃষক সদস্যরা বাজারের জন্য নগদ আমদানিকারক পণ্য উৎপাদনে বেশি ব্যস্ত ছিল। কিষাণ ইউনিয়নের মতো অন্যান্য কৃষক সংগঠনগুলোও বিভিন্ন রাজ্য থেকে ওই সকল সদস্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করত যারা আঞ্চলিক নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রভাবশালী ছিল। মহারাষ্ট্রের শেঠকারী সংগঠন এবং কর্ণাটকের রায়ত সংঘ কৃষকদের এরূপ সংগঠনের অন্যতম উদাহরণ।

কিষাণ ইউনিয়নের দাবি হল কৃষিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার (WTO) নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা

আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি

মহিশূর, ১৫ ফেব্রুয়ারি।। ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন হুমকি দিয়েছে যে ভারত সরকার যদি দর কষাকষির মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থাকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে আসতে না পারে তাহলে তারা দেশজুড়ে আর্থ সামাজিক বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করবে।

আজ এখানে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে কিষাণ ইউনিয়নের প্রধান মহেন্দ্র সিং টিকায়েত এবং সংগঠনের সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক এম. যধুবীর সিং সতর্ক করে বলে যে যদি ভারত সরকার নভেম্বর মাসে হংকং-এ অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী পর্যায়ের বৈঠকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা দ্বারা প্রণীত শর্তাবলির সাথে সহমত পোষণ করে তাহলে দেশ বহুমুখী বিপদের সম্মুখীন হবে।

নেতারা বলেন যে, কৃষি ব্যবস্থাকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির নিমিত্তে আগামী ১৭ মার্চ নতুন দিল্লিতে কৃষকদের নিয়ে বিশাল সমাবেশ সংগঠিত করা হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি কৃষক এই সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতেও এই ধরনের বিক্ষোভ সমাবেশ সারাদেশে সংগঠিত করা হবে, তারা হুশিয়ারি দেন।

দ্যা হিন্দু, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

Credit: Hindu

জাতীয় মৎস্য শ্রমিক ফোরাম (National Fish Worker's Forum)

তোমরা কি জান যে বিশ্বের মৎস্যজীবী জনসংখ্যার দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ ভারতে বসবাস করে? দেশের পূর্ব এবং পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে হাজার হাজার পরিবারের পেশা হলো মৎস্য আহরণ। এদের বেশিরভাগ আদিবাসী মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এসব মৎস্য শ্রমিকদের জীবন জীবিকা সংকটের মুখোমুখি হয় যখন সরকার যন্ত্রচালিত মাছ ধরার বিশেষ নৌকা ও অন্যান্য প্রযুক্তিভিত্তিক উপকরণের মাধ্যমে সমুদ্র থেকে অধিক পরিমাণে মৎস্য আহরণের অনুমোদন দিতে থাকে। সত্তর এবং আশির দশক জুড়ে স্থানীয় মৎস্য শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠন তাদের প্রথাগত জীবন জীবিকার ইস্যুতে রাজ্য সরকার সমূহের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পরে। মৎস্য সংক্রান্ত বিষয়টি যেহেতু একটি রাজ্যিক বিষয় তাই সমৎস্য শ্রমিকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক স্তরে স্থানান্তরিত হয়।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে উদারনীতিবাদী অর্থনৈতিক নীতিমালা যখন কার্যকর হওয়া শুরু হয় তখন মৎস্যজীবিদের বিভিন্ন সংগঠন বাধ্য হয়ে জাতীয় স্তরে 'ন্যাশনাল ফিস্ ওয়ার্কারস ফোরাম, (National Fish Worker's Forum- (NFF) একটি বৃহত্তর মঞ্চ গড়ে তোলে। কেরলার মৎস্য শ্রমিকরা তাদের সহকর্মীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব গ্রহণ করে। পাশাপাশি তারা অন্যান্য রাজ্যের নারী শ্রমিকদেরও সংগঠিত করতে থাকে। ফোরামের কার্যক্রম ১৯৯১ সালে যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠে যখন এর সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটি সফল আইনি সংগ্রাম পরিচালনা করে। এটা ছিল গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালার বিরুদ্ধে। কারণ এই নীতিমালায় ভারতীয় জলসীমাকে বিশাল বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল এমনকী বহুজাতিক মৎস্য আহরণ কোম্পানির জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। নব্বুইয়ের দশক জুড়ে এই ফোরাম সরকারের সাথে বিভিন্ন প্রকারের আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পরে। তাদের এই লড়াই ছিল মূলত ওই সকল মৎস্যজীবি পরিবারের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য যাদের জীবন ধারণের একমাত্র জীবিকা ছিল মৎস্য আহরণ। তারা ওই সকল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল যাদের কাছে মৎস্য আহরণ ছিল একটি লাভজনক পেশা। ২০০২ সালের জুলাই মাসে জাতীয় মৎস্য ফোরাম দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে যার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি মাছ ধরার ট্রলারগুলোকে সরকারি অনুমোদন বন্ধ করা। এই ফোরাম বিশ্বব্যাপী অন্যান্য সংগঠনের সাথেও যুক্ত হয়েছিল যাতে মৎস্য শ্রমিকদের জীবন জীবিকা ও বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যে সুরক্ষিত থাকে।

মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন
(Anti-Arrack Movement)

কিষাণ ইউনিয়ন যখন উত্তরের কৃষকদের সংগঠিত করতে ব্যস্ত তখন দক্ষিণের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের আরেকটি আন্দোলন চলছিল। এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণকারী নারীদের দাবি ছিল আশপাশের অঞ্চলে মদ কিংবা সুরা বিক্রি যেন নিষিদ্ধ করা হয়।

নারীদের প্রতিবাদে মদ মাফিয়াদের পলায়ন

চিত্তোর জেলার কালিকারি মণ্ডল অঞ্চলের গুন্ডলুর গ্রামের নারীরা এক জায়গায় জমায়েত হয়ে তাদের গ্রামে সম্পূর্ণভাবে মদ বিক্রি বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়। তাদের এই প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রামের মদ বিক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। প্রতিজ্ঞাপত্র পেয়ে বিক্রেতা মদের প্যাকেট ভর্তি জিপ গাড়ি নিয়ে দ্রুত সে স্থান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু মদ বিক্রেতা যখন এই ব্যাপারে তার ঠিকাদারকে জানায় ঠিকেদার তখন একদল গুন্ডা বাহিনী তাকে সাহায্য করতে পাঠায় যাতে সে পুনরায় মদ বিক্রি শুরু করতে পারে। কিন্তু গ্রামের মহিলারা তাদের প্রতিজ্ঞায় অনড় ছিলেন এবং গুন্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, পরে ঠিকেদাররা পুলিশের সাহায্য নেয় কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে মদ বিক্রির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী মহিলাদের উপর ঠিকাদারের গুন্ডা বাহিনী লোহার রড ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে নৃশংস আক্রমণ চালায়। কিন্তু আবারো মহিলারা সংঘবদ্ধভাবে এই আক্রমণ দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করেন। উপায় অন্তর না দেখে ভারাটে গুন্ডা বাহিনী দ্রুত পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আন্দোলনকারী মহিলারা পরবর্তীতে মদের প্যাকেট ভর্তি তিনটি জিপ গাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়।

ইনাডুতে প্রকাশিত প্রতিবেদন
২৯ অক্টোবর, ১৯৯২

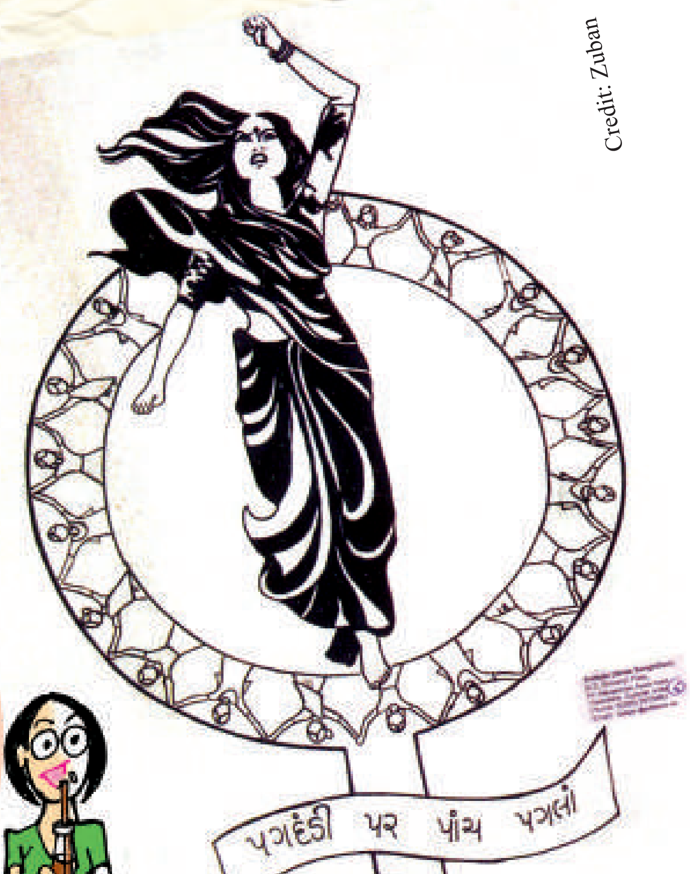

Credit: Zuban

১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে এই ধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই তেলেগু ভাষায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো। প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোতে গ্রামের নাম ভিন্ন হলেও ঘটনাগুলোর প্রকৃতি প্রায় একই থাকত। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের মহিলারা ওই সময়ে সরকারি কিছু সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, ভারাটে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে এবং সমগ্র মদ্যপান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। ওই রাজ্যে এসব বিক্ষোভ আন্দোলনসমূহ এন্টি এরাক মুভমেন্ট (Anti Arrack Movement) বা মদ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

উৎপত্তি (Origin)

নব্বই-এর দশকের শুরু দিকে অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর জেলার দুবাগুন্টার প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি গ্রামের বিশাল সংখ্যক মহিলারা বয়স্ক স্বাক্ষরতা কর্মসূচিতে (Adult literacy drive) নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেন। শ্রেণিকক্ষের আলোচনাকালে অংশগ্রহণকারী নারীরা অভিযোগ করেন যে তাদের পরিবারের পুরুষেরা স্থানীয়ভাবে নির্মিত এরাক (Arrack) নামে এক প্রকার মদ্যপানে ক্রমাগত আসক্ত হয়ে পরছে। মদ্যপানের অভ্যাস সেই গ্রামের মানুষদের বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে এমন গভীরে প্রবেশ করেছে যা তাদের দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি ওই অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। মদ্যপানের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে বেশিরভাগ পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পরছে, কর্মস্থলে পুরুষদের উপস্থিতির হার দ্রুত কমে যাচ্ছে এবং মদের ঠিকাদাররা মদ বাণিজ্যে তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েমের জন্য বিভিন্ন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পরছে। এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড়ো ভুক্তভোগী ছিলেন মহিলারা। কারণ এর ফলে পারিবারিক অর্থনীতি প্রায় ধ্বংস হয়ে পরেছিল। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের বিশেষ করে স্বামীদের অকর্মণ্যতা ও হিংসার যন্ত্রণা মহিলাদেরকেই সবচেয়ে বেশি ভোগ করতে হতো।

১৯৯২ সালে হায়দ্রাবাদ শহরে এরাক নামের মদ বিক্রির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশে আন্দোলনরত মহিলারা।

নেল্লোর জেলায় মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত স্থানীয় উদ্যোগের মধ্যেমে একসাথে মিলিমিশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা আন্দোলনে শামিল হোন এবং জোরপূর্বকভাবে সেখানকার মদের দোকানগুলো বন্ধ করে দেন। এই খবর এতটা দ্রুত ছড়িয়ে পরে যে বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৫০০০ মহিলা এতে অনুপ্রাণিত হয়ে একসাথে জমায়েত হন এবং মদ বিক্রি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার দাবিতে একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করে তা জেলা অধিকর্তার কাছে জমা দেন। ফলে নেল্লোর জেলায় এরাক নাম মদ বিক্রির উপর যে নিলাম ডাকা হতো তা মোট সতেরবার বাতিল করা হয়। নেল্লোর জেলার এই উদ্যোগ ধীরে ধীরে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পরে।

যোগসূত্র (Linkage)

এই মদ বিরোধী আন্দোলনের শ্লোগানটি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও সাধারণ– 'এরাক বিক্রি নিষিদ্ধ করা'। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ও সাধারণ দাবিটি ওই অঞ্চলের বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোকেও স্পর্শ করে যা ওখানকার নারীদের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতি ও দুর্নীতির অভ্যন্তরীণ যোগসূত্রতাকে উন্মোচন করা হয়েছিল। রাজ্য সরকার এরাক বিক্রিতে কর আরোপের মাধ্যমে অনেক রাজস্ব আদায় করত, যার ফলে এই ধরনের ব্যবস্থার বন্ধ করতে আগ্রহী ছিল না। স্থানীয় নারী সংগঠনগুলো এরাকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন করে এই জটিল বিষয়টির উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত। পাশাপাশি তারা পরিবারের অভ্যন্তরীণ সহিংসতার বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করত। প্রথমবারের মতো এই আন্দোলনের মাধ্যমে এমন একটি মঞ্চ তৈরি হয় সেখানে পারিবারিক সহিংসতার মতো ব্যক্তিগত ও বিষয়গুলো নিয়েও জনসমক্ষে আলোচনা করা হতো। সুতরাং ধীরে ধীরে এরাক বিরোধী আন্দোলন বৃহত্তর নারী আন্দোলনের অংশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

পূর্বে, মহিলা সংগঠনগুলো সাধারণত যে সকল ইস্যু নিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করত সেগুলো হলো গার্হস্থ্য হিংসা, পণপ্রথা, কর্মস্থল ও জনসমক্ষে যৌন হয়রানি কিংবা শ্লীলতাহানি ইত্যাদি। এসব বিষয়ে আন্দোলনকারী

মহিলারা সাধারণত শহুরে মধবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের দ্বারা গৃহীত কর্মসূচি এই ধারণার জন্ম দিয়েছিল যে নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা কিংবা লিঙ্গা বৈষম্যতা ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল বিষয়। আশির দশকে নারী আন্দোলনের মূল অভিমুখ ছিল পরিবারের অভ্যন্তরে কিংবা বাহিরে নারীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতা। এসকল নারী সংগঠন পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান করতো এবং লিঙ্গা সমতার ভিত্তিতে প্রণীত ব্যক্তিগত ও সম্পত্তি আইনের দাবি করতো।

এসব প্রচারাভিযান নারী সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। তবে ধীরে ধীরে নারী আন্দোলনের অভিমুখ আইনগত সংস্কারের দাবি থেকে সামাজিক দ্বন্দ্বের দিকে আবর্তিত হয়। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অবস্থার পরিণতিতে নব্বুই-এর দশকে নারী সংগঠনগুলো রাজীতিতে তাদের সম প্রতিনিধিত্ব দাবি করে। আমরা জানি যে ৭৩ ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনীতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারীদের দাবি হল অনুরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা যেন রাজ্য আইনসভা ও কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষেত্রেও কার্যকর করা হয়। এ সম্পর্কিত একটি সংবিধান সংশোধনী বিল প্রস্তাব করা হলেও প্রয়োজনীয় সমর্থনের অভাবে সংসদে তা এখনো পাশ হয়নি। এই বিলের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছে তাদের মধ্যে কিছু নারী সংগঠনও রয়েছে। তাদের দাবি হলো সংরক্ষণ প্রস্তাবের মধ্যে দলিত এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের জন্য যেন আলাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। উচ্চস্তরীয় সরকারি দপ্তরগুলোতেও তারা অনুরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থার দাবি করে।

পণপ্রথা বিরোধী আইনের সপক্ষে প্রদর্শনরত মহিলাগণ।

চলো ছায়াছবিটি দেখি

আক্রোশ

ভিকু লাহান্য়া নামে একজন আদিবাসী নিজের স্ত্রী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। তাকে আইনিভাবে সাহায্য করার জন্য ভাস্কর কুলকার্নি নামে একজন আইনজীবি নিযুক্ত করা হয়। আইনজীবী হত্যার কারণ খুঁজে পাওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্তু এই ব্যাপারে অভিযুক্ত এবং তার পরিবার নিরব ভূমিকা পালন করে। মামলাটি তদন্তকালে আইনজীবী প্রচুর পরিশ্রম করেন। এই ব্যাপারে তাকে কেউ সাহায্য করেনি বরং উল্টো তিনি আক্রমণের শিকার হন এবং যা কিছু এ পর্যন্ত ঘটেছে সেই ব্যাপারে তাকে একজন সামাজিক কর্মী সতর্কও করে দেন।

কিন্তু এই সামাজিক কর্মী একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। এর মধ্যে ভিকুর বাবারও মৃত্যু হয়। তার বাবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যোগদানের জন্য ভিকুকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এখানে এসে ভিকু ভেঙে পরে এবং তার চরম 'আক্রোশ' জেগে উঠে। ..... এই কঠিন সংঘাতপূর্ণ ছবিটি একজন নিপীড়িত ব্যক্তির মানবেতর ও চরম কষ্টসাধ্য জীবন-যাপনের কাহিনি বর্ণনা করছে। যেখানে আধিপত্যবাদী সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ানো যে কত কঠিন কাজ তাও এই ছবিতে চিত্রায়িত করা হয়েছে।

সাল : ১৯৮০
পরিচালক— গোবিন্দ নিহলানী
কাহিনি : বিজয় তেণ্ডুলকর।
চিত্রনাট্য : সত্যদেব দুবে
অভিনয়ে : নাসিরুদ্দিন শাহ, ওমপুরী, স্মিতা পাতিল, নানা পাটেকর, মহেশ এলকুঞ্চার।

নর্মদা বাচাঁও আন্দোলন (Narmada Bachao Aandolan)

Credit: Design and People

নর্মদা বাঁচাও অন্দোলনের সমর্থনে প্রচারিত একটি পোস্টার

এই পর্যন্ত আমাদের দ্বারা আলোচিত সামাজিক আন্দোলনসমূহ স্বাধীনতার সময়কালে গৃহীত ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় সমূহকে উত্থাপন করেছে। যেমন– চিপকো আন্দোলন বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়ের বিষয় এবং কৃষকরা কৃষিক্ষেত্রের প্রতি সরকারি উদাসীনতার বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছে। দুর্দশাগ্রস্ত সামাজিক এবং বস্তুগত অবস্থার প্রেক্ষাপটে দলিত সম্প্রদায় গণআন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। অন্যদিকে আরাক (এক প্রকার মদ) বিরোধ আন্দোলন তথাকথিত উন্নয়নের নেতিবাচক বিপর্যয়ের বিষয়টি উত্থাপন করেছিল। এসব আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অব্যক্ত বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট করার ক্ষেত্রে যেসব আন্দোলন ভূমিকা রেখেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। এই আন্দোলন বিশাল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে বাস্তুচ্যুত জনগণের স্বপক্ষে পরিচালিত হয়েছিল।

সর্দার সরোবর প্রকল্প (Sardar Sarovar Project)

আশির দশকের শুরুতে মধ্য ভারতের নর্মদা উপত্যকায় একটি উচ্চকাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। প্রকল্পের রূপরেখা অনুসারে নর্মদা এবং তার শাখা নদী সমূহের তীরবর্তী অঞ্চলে ৩০টি বিশাল আকারের বাঁধ, ১৩৫টি মাঝারি আকৃতির এবং প্রায় ৩০০০-এর মতো ক্ষুদ্র বাঁধ নির্মাণের কথা ছিল। নর্মদা ও তার শাখা নদীগুলো মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। গুজরাটের সর্দার সরোবর প্রকল্প এবং মধ্যপ্রদেশের নর্মদা সাগর প্রকল্প ছিল বিশাল আকৃতির ও বহুমাত্রিক দুটি প্রকল্প। নর্মদা নদীর সুরক্ষায় গঠিত নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণের প্রবল বিরোধীতা করে এবং দেশের উন্নয়ন চলমান প্রকল্পগুলোর প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা শুরু করে।

সর্দার সরোবর প্রকল্প হলো একটি বহুমাত্রিক ও বিশাল আকৃতির বাঁধ। এই প্রকল্প সমর্থনকারীদের বক্তব্য ছিল যে এই বাঁধ গুজরাট এবং তার প্রতিবেশী অঞ্চলের তিনটি রাজ্য পানীয় জল, সেচ প্রকল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষিভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দারুণভাবে উপকৃত হবে। তাছাড়া এই বাঁধের মাধ্যমে এই অঞ্চলকে বন্যা ও খরার প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করা যাবে। তবে এই বাঁধগুলো নির্মাণ প্রক্রিয়ার ফলে এই চারটি প্রদেশের প্রায় ২৪৫টি গ্রাম জলে ডুবে যাবে বলেও অনেক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এ কারণে এই গ্রামগুলো থেকে প্রায় আড়াই লাখ জনগণকে বাস্তুচ্যুত করে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে। স্থানীয় সক্রিয় জনগোষ্ঠী প্রথমেই এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিল যে প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত বাস্তুচ্যুত জনগণের জন্য নতুন আবাস স্থান নির্ধারণ এবং তাদের পুনর্বাসন বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং সমস্যা সংকুল হবে। তবে ১৯৮৮-৮৯ সালের দিকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয় যখন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (NBA) এই বিষয়টিকে নিয়ে নানাহ কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (NBA) আসলে হলো স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহের একটি সমষ্টি বা জোট।

বিতর্ক এবং সংগ্রাম (Debates and struggles)

প্রকল্পের প্রথম থেকে এন বি এ (NBA) তার বিরোধীদের এই বিষয়টির সাথে যুক্ত করার প্রচেস্টা চালায়।

Credit: NBA

তারা বুঝানোর চেষ্টা করে যে সর্দার সরোবর প্রকল্পের সাথে দেশের অন্যান্য বৃহত্তর বিষয়ে যেমন– চলমান উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা, প্রকল্প রূপায়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা ইত্যাদি বিষয় ও জড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া গৃহীত উন্নয়ন নীতিমালা এবং গণতান্ত্রিক জনস্বার্থের গুরুত্ব কী—এই ব্যাপারেও সকলকে সচেতন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। তাদের দাবি দেশের মধ্যে এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হওয়া উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণ করা উচিত। তাদের যুক্তি ছিল যে এই ধরনের বিশ্লেষণে উন্নয়নের সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি বলতে প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত জনগণের জন্য জোড়পূর্বক আবাসন ও স্থানান্তরকে বোঝানো হয়েছে। এই আন্দোলনকারীদের মতে তথাকথিত একপেশে উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগণের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির মারাত্মক ক্ষতি হয়। তাছাড়া এর ফলে বাস্তুতান্ত্রিক সম্পদের অবক্ষয় হয়।

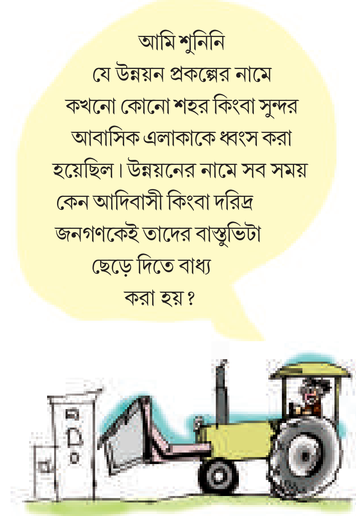

প্রথমদিকে আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল প্রকল্পের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত জনগণের জন্য স্বাস্থ্য ও ন্যায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, পরবর্তীতে এই আন্দোলনের পক্ষ থেকে এই ধরনের বিশাল আকৃতির উন্নয়ন প্রকল্পের সিদ্ধান্ত প্রণয়নজনিত প্রক্রিয়ার পদ্ধতি সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। এন বি এ (NBA)-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে। তাছাড়া সর্বাবস্থায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন– জল, জঙ্গাল, ভূমি ইত্যাদির উপর স্থানীয় জনগণের অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ যেন বজায় থাকে এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন কিছু মানুষ অন্যদের স্বার্থে নিজেদের সর্বস্ব বিসর্জন দেবে। এইসব প্রশ্নের মাধ্যমে এন বি এ (NBA) প্রথম থেকে উত্থাপিত শুধুমাত্র ন্যায্য পুনর্বাসনের দাবি থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণের সম্পূর্ণ বিরোধিতার দিকে সরে আসে।

উপরে :
২০০২ সালে অনুষ্ঠিত জল সমাধিতে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেতা মেধা পাটেকর ও অন্যান্য সক্রিয় কর্মীরা।

নীচে :
নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন দ্বারা সংগঠিত একটি নৌকা র‍্যালি।

বাঁধ নির্মাণ দ্বারা উপকৃত রাজ্যসমূহ বিশেষ করে গুজরাটে আন্দোলনকারীদের বিতর্ক ও বিক্ষোভ আন্দোলন গভীরভাবে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। একই সময় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের বিষয়টি সরকার এবং বিচার ব্যবস্থায় স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ফলে সরকার ২০০৩ সালে একটি সর্বজনীন জাতীয় পুনর্বাসনে নীতিমালা (National Rehabilitation Policy, 2003) গ্রহণ করে। এটা ছিল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম একটি সফলতা। তবে তাদের দ্বারা প্রচারিত বাঁধ নির্মাণ বন্ধ করার দাবি অনেকের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। কারণ সমালোচকদের মতে এহেন দাবির অর্থ হল

Credit: NBA

অন্যদেরকে জল ও উন্নয়নের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। দেশের সুপ্রিম কোর্টও সরকারকে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন বিশ বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। আন্দোলনকারীরা দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে সকল প্রকার গণতান্ত্রিক কৌশল গ্রহণ করেছিল। গৃহীত কৌশলগুলোর মধ্যে বিচারালয়ে আবেদন, আন্তর্জাতিক স্তরে সমর্থন আদায়, আন্দোলনের সপক্ষে গণসমাবেশ, আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝাতে বিভিন্ন জায়গায় সত্যগ্রহ পালন ইত্যাদি ছিল অন্যতম। এতদ্‌সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা বিরোধী দলসহ মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো থেকে তেমন কোনো সমর্থন আদায় করতে পারেনি। প্রকৃত সত্য হলো এই যে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের যাত্রাপথ ভারতীয় রাজনীতিতে রাজনৈতিক দল ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্যেকার ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতা কিংবা সমন্বয়হীনতার বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। নব্বুই-এর দশকের শেষের দিকে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন একাই বিশাল আকারের উন্নয়ন প্রকল্পের বিরোধিতা করত না বরং অন্যান্য অনেক স্থানীয় গোষ্ঠী ও আন্দোলনকারী দল তাদের অঞ্চলে বিশাল আকারের প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের যুক্তির প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে শুরু করে। ওই সময়কালে বিভিন্ন গণআন্দোলনের দ্বারা গঠিত বৃহত্তর জোটের অংশ হিসেবে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুরূপ বিষয়ের উপর সংগঠিত সংগ্রামে জড়িত হতে থাকে।

গণআন্দোলন থেকে শিক্ষণীয় (Lessons from popular movement)

এই ধরনের জনপ্রিয় গণআন্দোলন সমূহের ইতিহাস আমাদেরকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে দারুণভাবে সাহায্য করে। আমরা ইতোমধ্যেই দেখছি যে দলহীন আন্দোলন গোষ্ঠীগুলো প্রকৃতভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় আবার তারা সমাজের জন্য কোনো সমস্যাও নয়। দলীয় রাজনীতির কর্মসূচি থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তাদের সমাধানের জন্যই আন্দোলনকারী গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। সুতরাং তাদেরকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তারা এমন কিছু নতুন সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে যাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভাব অভিযোগগুলো নির্বাচনী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভালোভাবে গ্রহণ করা হয় না। তাই গণআন্দোলন সমূহ বঞ্চিত জাতিগোষ্ঠী ও তাদের প্রত্যাশার সফল প্রতিনিধিত্ব করে। এসব আন্দোলনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নানাহ বঞ্চিত গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সংঘর্ষ ও অসন্তুষ্টিকে হ্রাস করা সম্ভব হয়। গণ-আন্দোলন যে-কোনো কর্মসূচিতে নতুন রূপে সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত করে ফলে ভারতীয় গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থায় গণঅংশগ্রহণের ধারণাকে আরো বেশি বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে।

আমরা কি বলতে পারি যে সরকার হলো রাজনীতির গবেষণাগার? এখানে সবসময়ই নতুন নতুন বিষয় পরীক্ষা নীরিক্ষা করা হয় এবং পরে সফলতাগুলোকে রাজনৈতিক দলসমূহ গ্রহণ করে নেয়।

তবে সমালোচকগণ মনে করেন যে এসব আন্দোলনকারীদের যৌথ কর্মসূচি যেমন হরতাল, ধর্ণা, সমাবেশ ইত্যাদি সরকারি কর্মকাণ্ডকে যথেষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাছাড়া এসব কারণে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলে। তবে এসব যুক্তিতে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন— আন্দোলনরত গোষ্ঠীগুলো কেন প্রতিবাদী কর্মসূচি গ্রহণ করে? আমরা এই অধ্যায়ে দেখেছি যে গণআন্দোলনসমূহ জনগণের বৈধ দাবি সমূহকেই সামনে নিয়ে আসে এবং বিশাল সংখ্যক নাগরিক সমাজকে এর সাথে যুক্ত করে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সব সম্প্রদায়কে আন্দোলনে যুক্ত করা হয় তারা আসলে দরিদ্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত তথা সমাজের প্রান্তীক জনগোষ্ঠী। তাদের দ্বারা গৃহীত আন্দোলন পদ্ধতি ও তার ধরাবাহিকতা এটা প্রমাণ করে যে চলমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এসব বঞ্চিত সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর অভাব-অভিযোগ শুনার মতো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা এখনো গড়ে উঠেনি। এই কারণেই এসব আন্দোলনকারী গোষ্ঠী সমূহ

Popular movements have produced a wide range of litrature, often in the form of small magazines. Here is a selcetion.

তথ্য অধিকার আন্দোলন (Movement for Right to Information)

Credit: Pankaj Pushkar

এম.কে.এস.এস (MKSS) দ্বারা আবর্তিত জনপ্রিয় থিয়েটারের একটি রূপ। "ঘোটালা রথযাত্রা"

সাম্প্রতিক সময়ে সংগঠিত সফল আন্দোলন সমূহের অন্যতম হল তথ্য অধিকারের আন্দোলন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে তাদের দাবি পূরণে বাধ্য করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় যখন রাজস্থানের মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন (MKSS) নামক একটি গণভিত্তিক সংগঠন দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ বিতরণ এবং শ্রমিকদের সংখ্যা নির্ণয়ের তথ্যাবলি সম্পর্কে জানার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এই দাবি সর্বপ্রথম রাজস্থানের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া একটি অঞ্চলের ভীম নামক তহশিল অফিসের উত্থাপন করা হয়। ওখানকার গ্রামবাসীরা তথ্যের অধিকারের ভিত্তিতে দাবি করে যে এই অঞ্চলের কমিউনিটি হল, ছোট ছোট বাঁধ, ঔষধালয় এবং স্কুল নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যয়কৃত অর্থের বিল-ভাউচার, শ্রমিকদের হাজিরাবাহী (Muster roll) নাম ও মজুরির পরিমাণ ইত্যাদির প্রতিলিপি যেন তাদের হাতে দেওয়া হয়। দপ্তরের কাগজপত্র অনুসারে এসব প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে অথচ গ্রামবাসীরা সকলেই জানত যে একাজের ক্ষেত্রে তহবিলের যথেষ্ট তছরূপ করা হয়েছে। ১৯৯৪ এবং ১৯৯৬ সালে এম.কে.এস.এস (MKSS) গণ শুনানি কার্যক্রমের আয়োজন করতে প্রশাসনকে প্রাপ্ত অর্থব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছিল।

এই আন্দোলনের দ্বারা একটি ক্ষুদ্র সফলতা অর্জিত হয়েছিল। কারণ আন্দোলনকারীরা রাজস্থানের পঞ্চায়েতরাজ আইনে সংশোধনী আনতে সরকারকে বাধ্য করেছিল। এই সংশোধনীটি ছিল যাতে পঞ্চায়েত অফিসগুলোতে থাকা বিভিন্ন প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত কপি জনগণ আবেদন সাপেক্ষে পেতে পারে। এই সংশোধনটি দ্বারা বাজেট, হিসাবপত্র, খরচের পরিমাম, গৃহীত নীতিমালা এবং সুবিধা প্রাপ্তদের তালিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রকাশ করতে পঞ্চায়েতগুলো বাধ্য থাকত। ১৯৯৬ সালে দিল্লিতে এম.কে.এস.এস (NKSS) জনগণের তথ্য অধিকার সংক্রান্ত একটি জাতীয় পরিষদ (National Council for People's Right to Information) গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল তথ্য অধিকার বিষয়টিকে জাতীয় স্তরের প্রচারাভিযানের অন্তর্ভুক্ত করা। এর পূর্বে বিভিন্ন সংগঠন যেমন– দ্যা কনজিউমার এডুকেশান এন্ড রিসার্চ সেন্টার (Consumer Education and Research Center), দ্যা প্রেস কাউন্সিল (the Press Council) এবং শৌরী কমিউনিটি (Shourie Committee) তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া প্রস্তাব করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে ফ্রিডম অফ্ ইনফরমেশন (Freedom of Information Act) এই নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়, যা প্রকৃতিগতভাবে ছিল অত্যন্ত দুর্বল। পরিশেষে ২০০৪ সালে তথ্য অধিকার বিল সংসদে পাশ হয় এবং ২০০৫ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রপতির সম্মতি সূচক স্বাক্ষরের মাধ্যমে তা আইনে পরিণত হয়।

Credit: Sudhir Tailang/UNDP and Planning Commission

চলো পুনরায় গবেষণা করি

তোমরা জেলা কিংবা শহরে বিগত ২৫ বছরের মধ্যে সক্রিয় যে-কোনো একটি গণআন্দোলনকারী সংস্থাকে খুঁজে বের করো। এই আন্দোলন সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যাদি সংগ্রহ করো।

- এটা কখন শুরু করেছিল? কতদিন পর্যন্ত কার্যকর ছিল?
- প্রধান নেতৃত্বে করা ছিলেন? সমাজের কোন কোন গোষ্ঠী এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল?
- এই আন্দোলনের প্রধান বিষয় ও দাবিগুলো কী ছিল?
- আন্দোলনটি কি সফল হয়েছিল? এই আন্দোলনের ফলে তোমরা এলাকায় কী ধরনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পরেছে?

নির্বাচনী রাজনীতির বাইরে গণকর্মসূচি ও সমাবেশ সংগঠিত করত।

এই ধরনের পরিস্থিতি সাম্প্রতিক সময়ের অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। নবম অধ্যায়ে তোমরা জানতে পারবে যে এসব অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল সমূহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়। দেখা গেছে, যে সকল প্রান্তীক সামাজিক জনগোষ্ঠী সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক নীতিমালার কারণে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তাদের প্রতি রাজনৈতিক দল কিংবা গণমাধ্যম তেমন কোনো দৃষ্টি দেয় না। সুতরাং, এই অবস্থায়, গণআন্দোলন সমূহের পক্ষ থেকেই এসব নিপীড়নমূলক নীতিমালার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সংগঠিত করা হয়। এইসব গণআন্দোলন দলীয় রাজনীতির আওতার বাইরে গিয়ে সংগঠিত করা হয়।

আন্দোলন বলতে শুধুমাত্র সমষ্টিগত কর্মসূচি কিংবা গণপ্রতিবাদ বা গণসমাবেশকেই বুঝায় না। গণআন্দোলন এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে সমরূপ দাবি, সমরূপ সমস্যার কিংবা সমরূপ প্রত্যাশার পক্ষপাতি জনগণ ধীরে ধীরে একে অপরের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাছাড়া গণআন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও প্রত্যাশা সম্পর্কে সার্বিকভাবে সচেতন করা হয়। ভারতে সক্রিয় সামাজিক আন্দোলনসমূহ এসব দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে নিজেদেরকে লিপ্ত রাখে। সুতরাং, বলা যায় এসব আন্দোলনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনোরূপ জটিলতা সৃষ্টি করা হয় না। বরং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরো বিস্তৃত ও সার্বজনীন করতে সাহায্য করে। তথ্য অধিকার আইনের জন্য শুরু হওয়া আন্দোলন এর প্রকৃস্ট উদাহরণ।

তারপরেও জনস্বার্থে গৃহীত নীতিমালা বাস্তব জীবনে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এসব আন্দোলনের প্রভাব এখনো যথেষ্ট সীমিত। এর আংশিক কারণ হল এই যে বেশিরভাগ সমকালীন আন্দোলনসমূহ প্রায় ক্ষেত্রে সমাজের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি বিষয় নিয়েই সাধারণত সক্রিয় হয়। সুতরাং তাদের সেই যুক্তিপূর্ণ দাবিটির প্রতি সরকার খুব বেশি একটা গুরুত্ব দেয় না। গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য সুবিধা বঞ্চিত সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বৃহত্তর জোট গঠন করা খুবই প্রয়োজন। এই ধরনের একটি সামাজিক জোট সবসময়ই আন্দোলনকারী গোষ্ঠীসমূহের নেতৃত্বে সংগঠিত হবে— এমনটা নাও হতে পারে। সেই জন্যই রাজনৈতিক দলসমূহের উচিত বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী সমূহের স্বার্থগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। কিন্তু কখনো কখনো রাজনৈতিক দলগুলো এ ধরনের স্বার্থ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। আবার কখনো কখনো রাজনৈতিক দলও প্রান্তীক সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর দাবি দাওয়াসমূহকে সামনে নিয়ে আসতে উদ্যোগী হয় না। এক্ষেত্রে আন্দোলনকারী গোষ্ঠীসমূহ এই ইস্যুগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন বিধিনিষেধের মধ্যে কাজ করে থাকে। তাই দেখা যায় রাজনৈতিক দল ও গণআন্দোলন সমূহের মধ্যেকার সম্পর্ক সময়ের সাথে সাথে দুর্বল হয়ে পরছে। যার ফলে রাজনীতিতে শূন্যতা দেখা দেয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই বিষয়টি ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গভীর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

অনুশীলনী

1. নীচের কোন বক্তব্যগুলো সঠিক নয়
চিপকো আন্দোলন
   (a) ছিল গাছ কাঁটা বন্ধ করার নিমিত্তে গড়ে উঠা একটি পরিবেশ আন্দোলন।
   (b) বাস্তুতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক নিপীড়ন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।
   (c) মহিলাদের দ্বারা শুরু করা একটি মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন ছিল।
   (d) এর দাবি ছিল স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর নিয়ন্ত্রণ যেন বজায় থাকে।

2. নিম্নে উল্লেখিত কিছু মন্তব্য শুদ্ধ নয়। অশুদ্ধ মন্তব্যগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোকে পুনরায় শুদ্ধ করে লেখ।
   (a) সামাজিক আন্দোলনগুলো ভারতীয় গণতন্ত্রের কার্যকারীতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
   (b) সামাজিক আন্দোলনসমূহের মূল শক্তি হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের গণভিত্তি ও প্রভাব।
   (c) ভারতের সামাজিক আন্দোলনের আবির্ভাবের কারণ হল বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামাজিক ইস্যুগুলোকে নিয়ে সক্রিয় হওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের ব্যর্থতা।

3. ১৯৭০-এর দশকে উত্তরপ্রদেশে চিপকো আন্দোলন শুরু হওয়ার পেছনে কারণগুলো চিহ্নিত করো। এই আন্দোলনের ফলাফল কী ছিল।

4. ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী সংগঠন। নব্বই-এর দশকে কোন কোন বিষয় নিয়ে এই সংগঠনটি সক্রিয় ছিল এবং এক্ষেত্রে কতটুকু সফলতা অর্জন করেছিল?

5. অন্ধ্রপ্রদেশে সংগঠিত এরাক (বিশেষ একপ্রকার মদ) বিরোধী আন্দোলন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গোটা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওই সকল ইস্যুগুলো কী ছিলো?

6. তুমি কি এরাক বিরোধী আন্দোলনকে একটি নারী আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করো? কেন?

7. নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন নর্মদা উপত্যাকায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের বিরোধীতা কেন করেছিল?

8. দেশে সংগঠিত সামাজিক এবং প্রতিবাদ আন্দোলনগুলো কি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সহায়ক? উদাহরণের সাহায্যে তোমরা উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

9. দলিত প্যান্থার্সগণ কোন কোন ইস্যু নিয়ে কাজ করেছিল?

10. রচনাংশটি পড় এবং নিম্নে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

..... প্রায় সকল প্রকার 'নতুন সামাজিক আন্দোলন সমূহ' বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি যেমন– পারিবেশিক অবক্ষয়, নারীদের মর্যাদা লঙ্ঘন, আদিবাসী উপজাতি সংস্কৃতির ধ্বংস করার প্রবণতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদির কারণ নির্ণয় ও তার সমাধানের জন্য আবির্ভূত হয়েছে। কারণ এইসব সমস্যাসমূহ নিজে থেকেই সমাধান হয় না এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে না। সামাজিক আন্দোলনসমূহ অতীতে সংগঠিত বিপ্লবী মতাদর্শগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে তাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো অভ্যন্তরীণ বিভাজন..... সমাজে বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে দখল করা নতুন সামাজিক আন্দোলন সমূহ এখন বিভিন্ন..... সমস্যায় আক্রান্ত এবং যার ফলে তারা দরিদ্র ও নিপীড়িত

জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ আদর্শ প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ। তারা প্রতিবেশী বিভাজিত, প্রতিক্রিয়াশীল, অপরিকল্পিত ও অস্থিতিশীল– ফলে সামাজিক পরিবর্তনের বৃহত্তর রূপরেখা তৈরি করতে পারছে না। তারা প্রায় সবকিছুরই বিরোধী (পশ্চিমা বিরোধী, পুঁজিবাদী বিরোধী, উন্নয়ন বিরোধী ইত্যাদি) ফলে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় চাহিদা ও প্রত্যাশার সাথে সাজুয্যতা বজায় রেখে চলতে পারছে না। — **রাজনী কোঠারি**

(a) সামাজিক আন্দোলন ও বিপ্লবী মতাদর্শের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে?

(b) লেখকের মতে সামাজিক আন্দোলনসমূহের সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?

(c) সামাজিক আন্দোলনসমূহ যদি নির্দিষ্ট কিছু ইস্যু নিয়ে সক্রিয় হয় তবে কি তুমি বলবে যে তারা বিভক্ত? না কি তারা অতি সক্রিয়? উদাহরণের সাহায্যে তোমরা উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

চলো আমরা মিলেমিশে করি

এক সপ্তাহ ধরে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলো সংগ্রহ করো এবং এর মধ্যে থেকে তিনটি প্রতিবেদন বাছাই করো যাকে তুমি ‘গণআন্দোলনের’ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করবে। এই আন্দোলনসমূহের মূল দাবি। তাদের দ্বারা গৃহীত আন্দোলন পদ্ধতি এবং দাবিগুলোর প্রতি রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করো।

আঞ্চলিক দাবিসমূহ সাধারণত স্থানীয় জনসাধারণ এবং সরকারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ভাষাতেই প্রকাশ করা হয়। উক্ত পোস্টারটিতে সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় উত্তরাখণ্ড আন্দোলনের পক্ষে প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে সহযোগিতার আবেদন করা হয়েছে এবং এইভাবে একটি স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠীর আঞ্চলিক দাবি ধীরে ধীরে লক্ষণীয়ভাবে সুসংগঠিত হয়ে উঠে।

এই অধ্যায়ে (In this chapter)…

এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আমরা স্বাধীনোত্তর যুগের প্রথম দশকে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পড়েছি। কিন্তু জাতি গঠন প্রক্রিয়া এমন একটি বিষয় যা একবারের প্রচেষ্টাতে কখনো অর্জন করা যায় না। সময়ের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এছাড়াও কিছু কিছু পুরনো সমস্যা সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। কখনো কখনো এরূপ আঞ্চলিক দাবির স্বপক্ষে ভারতভূমির বাইরেও আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা যায়। এসকল আন্দোলন কোথাও কোথাও সশস্ত্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে এবং দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে।

আশির দশকে জনতা সরকারের পতনের পর ভারতের কেন্দ্রীয় স্তরে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এলেও নতুন করে কিছু সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে আসাম, পাঞ্জাব, মিজোরাম এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বিভিন্ন আঞ্চলিক দাবিতে গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। নিম্নে উল্লেখিত কতকগুলো সাধারণ প্রশ্নের ভিত্তিতে আমরা এই অধ্যায়ে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

- আঞ্চলিক দাবিগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়গুলো দুশ্চিন্তার কারণ?
- কীভাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলো এই সকল সমস্যা ও দুশ্চিন্তার মোকাবেলা করছে?
- জাতীয় ঐক্য ও গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে কী ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়?
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য কী ধরনের শিক্ষা ও সচেতনতা প্রয়োজন?

অধ্যায় ৪

আঞ্চলিক প্রত্যাশা (Regional Aspirations)

অঞ্চল এবং জাতি (Region and Nation)

আশির দশকে স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং এমনকী ভারতের বাইরেও আঞ্চলিকতাবাদের উত্থান পরিলক্ষিত হয়। নেতিবাচক রাজনীতি, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এবং সরকারের উৎপীড়নমূলক কাজের প্রতিবাদে স্থানীয় জনসাধারণ ব্যাপকভাবে এই সকল আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরে চলে এবং একটা সময় স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনকারী নেতৃবর্গের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সন্তোষজনক বোঝাপরা বা চুক্তির মাধ্যমে আন্দোলনের অবসান ঘটে। সংবিধান কাঠামোর মধ্যে থেকেই দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর আঞ্চলিক দাবি সম্পর্কে একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত ও চুক্তি সম্পাদিত হয়। যদিও এই দীর্ঘ আন্দোলন প্রক্রিয়া প্রায়শই ছিল হিংসাত্মক, সশস্ত্র ও সংঘর্ষপূর্ণ।

ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Indian approach)

ভারতীয় সংবিধান এবং জাতিগঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনাকালে আমরা বারবার যে মৌলিক নীতির উল্লেখ পেয়েছি সেটা হলো– 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।' ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক জনসাধারণের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষাকে কখনোই অস্বীকার বা অসম্মান করেনা। ভারতীয় সংবিধানের মূল মন্ত্র হলো– এদেশের সকল জাতিগোষ্ঠী নিজস্ব স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ণতা রেখে সামাজিকভাবে সকলে ঐক্যবদ্ধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার অধিকারী। ভারতের জাতীয়তাবাদ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এ বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বহু ইউরোপীয়ান দেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কারণ সেসব ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রসমূহ নাগরিকের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এই বিভিন্নতাকে জাতীর বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ বলে মনে করে।

এই বৈচিত্র্যময় কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ সর্বদা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আঞ্চলিক জনগণ নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করার অধিকারী এবং ভারতে এ ধরনের আঞ্চলিক গণআন্দোলনকে কখনোই জাতীয়তা বিরোধী আন্দোলন বলে মনে করা হয় না। এছাড়াও বিভিন্ন জাতি, দল বা সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী নিজেদের আঞ্চলিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে মিছিল মিটিং বা সভার মাধ্যমে আন্দোলন করার অধিকারী। এভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক আন্দোলনগুলো ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং জাতীয় নীতি নির্ধারণে আঞ্চলিক দাবিসমূহ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

এ ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কখনো কখনো সাময়িক উত্তেজনা ও সমস্যার উদ্ভব ঘটে। আঞ্চলিকতাবাদ জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠে। আঞ্চলিক জনগণ জাতির

বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলে নিজস্ব দাবি দাওয়াকে অধিক গুরুত্ব দিতে থাকে। সামগ্রিকভাবে দেশে একটা অস্থিরতা ও উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত দাবি দাওয়া নিয়ে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়— তা প্রশমন করে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সকল জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হয়।

উত্তেজনাপূর্ণ অঞ্চলসমূহ (Areas of Tension)

তোমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছো স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারত কীভাবে দেশভাগ, শরণার্থী সমস্যা, রাজন্যশাসিত রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্তি, বিভিন্ন রাজ্যের পুনর্গঠন এবং এরকম আরও অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। দেশের অভ্যন্তর এবং বাইরের অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের অভিমত ছিল— বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষ খুব বেশিদিন ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারবে না। স্বাধীনতা লাভের পরেই জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এটা শুধু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয় ছিল না। এটা ছিল কাশ্মীর উপত্যাকায় স্থানীয় জনগমের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখার রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্থান। অনুরূপভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে প্রথম থেকেই সম্মতি জ্ঞাপন করেনি। প্রথমে নাগাল্যান্ড ও পরে মিজোরামে ভারত থেকে পৃথক থাকার দাবিতে তীব্র লড়াই আন্দোলন সংঘটিত হতে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতেও দ্রাবিড় আন্দোলনে সামিল কয়েকটি গোষ্ঠী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি করতে থাকে।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিতে গণবিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়, এর মধ্যে আজকের অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে এ ধরনের গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চলে বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে হিন্দি ভাষাকে সরাকরিভাবে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন হতে দেখা যায়। অন্যদিকে আবার উত্তর ভারতে হিন্দিকে অবিলম্বে রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে পাঞ্জাবী ভাষাভাষি জনগণ নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে তাদের দাবি মেনে ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নামে দুটি পৃথক রাজ্য গঠিত হয়। পরে, ধীরে ধীরে ছত্রিশগড়, উত্তরাখণ্ড এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। এভাবে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর দাবি মেনে নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আঞ্চলিক সীমানা পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়।

যদিও এভাবে ভারতের সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়নি। ভারতের কিছু রাজ্যে বিশেষ করে কাশ্মীর ও নাগাল্যান্ডের সমস্যা এত জটিল ছিল যে জাতি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলোর সমাধান করা যায়নি। পাশাপাশি পাঞ্জাব, আসাম ও মিজোরামে নতুন করে সমস্যার উদ্ভব ঘটে। চলো, এ বিষয়ে এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি। জাতি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্র যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে সে বিষয়ে ফিরে তাকানো যাক্। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অতীতকে জানা নয় বরং ভারতের ভবিষ্যতকেও ভালোভাবে উপলব্ধি করা।

জম্মু ও কাশ্মীর (Jammu and Kashmir)

দ্রষ্টব্য : মানচিত্রটি যথাযথভাবে স্কেলভিত্তিক নয়। সুতরাং ভারতের বাহ্যিক সীমানার মানচিত্র হিসাবে এটি যথার্থ নয়।

তোমরা নিশ্চয়ই জম্মু ও কাশ্মীরের সহিংসতার ঘটনা শুনে থাকবে, এসকল সহিংস আন্দোলনের ঘটনায় অনেক জীবনহানি ঘটে এবং অসংখ্য পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়। কাশ্মীর সমস্যাকে সর্বদা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। যদিও বাস্তবে এ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অভিমুখ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পরিচালিত হতে দেখা যায়।

জম্মু, কাশ্মীর এবং লাদাখ : এই তিনটি রাজনৈতিক অঞ্চল নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য গঠিত কাশ্মীর উপত্যকাটি কাশ্মীর অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীগণ মুসলিম ধর্মাবলম্বী। স্বল্প সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও এখানে বসবাস করে। এখানে হিন্দু -মুসলিম সকলের ভাষা হলো কাশ্মীরি। হিমালয়ের পাদদেশে কিছুটা সমতল ভূমি ও কিছু পাহাড়ি অঞ্চল নিয়ে জম্মুর ভৌগোলিক অবস্থান। এখানে প্রধানত হিন্দু, মুসলিম ও শিখ ধর্মাবলম্বীগণ বসবাস করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন। লাদাখের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে পাহাড়। লাদাখের জনসংখ্যা খুব কম। অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় সমান সংখ্যক বুদ্ধিস্ট এবং মুসলিম ধর্মাবলম্বী রয়েছে।

কাশ্মীর সমস্যাটি শুধুমাত্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নয়। এই সমস্যার একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ কারণ রয়েছে; তেমনি রয়েছে কতকগুলো বাহ্যিক কারণ। এই আন্দোলনের মূলে রয়েছে কাশ্মীরি জনগণের নিজস্ব পরিচিতি 'কাশ্মীরিয়াত' প্রতিষ্ঠা করা এবং পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ করা।

সমস্যার মূল কারণ সমূহ (Roots of the Problem)

১৯৪৭ সালের পূর্বে জম্মু ও কাশ্মীর ছিল একটি রাজন্যশাসিত স্বাধীন রাজ্য। তৎকালীন হিন্দু শাসক হরি সিং প্রথমদিকে ভারতের সাথে যুক্ত হতে চাননি। বরং জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের সাথে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যান। সে সময় পাকিস্তানের নেতৃবর্গ মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবেই মনে করতেন। কিন্তু কাশ্মীরের জনগণ এটা মনে করতো না। তারা নিজেদের স্বতন্ত্র 'কাশ্মীরী' পরিচয়কেই অধিক গুরুত্ব দিত। শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্সের জনপ্রিয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল কাশ্মীরের রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করা, কিন্তু তারা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার বিপক্ষে ছিল। ন্যাশনাল কনফারেন্স ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন এবং কংগ্রেসের সাথে তাদের সুদীর্ঘকাল সুসম্পর্ক বজায় ছিল। নেহরুসহ জাতীয়তাবাদী অনেক নেতার সাথে শেখ আবদুল্লার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান কাশ্মীর দখলের উদ্দেশ্যে বেশকিছু উপজাতি অনুপ্রবেশকারীদের প্রেরণ করে। এ অবস্থায় কাশ্মীরের রাজা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইলে ভারত সরকারও তৎক্ষণাৎ

এক্ষেত্রে কেন তারা রাজ্যটিকে "জম্মু, কাশ্মীর এবং লাদাখ" হিসেবে নতুন নামকরণ করে না? তাহলে তো 'জে.কে.এল (JKL) একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত নামকরণ হয়ে উঠতে পারে!

ই.ভি.রামস্বামী নেইকার (১৮৭৯-১৯৭৩) পেরীয়ার (শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি) নামে পরিচিত; ই.ভি. রামস্বামী নেইকার ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। তিনি দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়িয়ান নবজাগরণ এবং জাতপাত বিরোধী আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেস দলের সদস্য হলেও তিনি ১৯২৫ খ্রি: দাক্ষিণাত্যে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন। এছাড়াও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্বদান ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেন। পরবর্তীকালে তিনি ‘দ্রাবিড় কাজাগাম’ নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে হিন্দি বিরোধী ও উত্তর ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণদের দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করেন।

দ্রাবিড় আন্দোলন (Dravidian movement)

‘ভাদাক্কু ভাজকিরাথু (Vadakku Vaazhkirathu); থেরক্কু থাইকিরাথু (Therkku Thaeilirathu)’ [উত্তরের সফলাভিযান দক্ষিণের মাটিতে ব্যর্থ]। এই জনপ্রিয় স্লোগানের মাধ্যম ভারতের একটি অঞ্চলের জনগণের আত্মমর্যাদাপূর্ণ স্বভিমানের প্রকাশ ঘটে যা দ্রাবিড় আন্দোলন নামে একটা সময় বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। ভারতীয় রাজনীতিতে এটা ছিল প্রথম আঞ্চলিক আন্দোলন, যদিও এই আন্দোলনের কিছু সংখ্যক নেতৃবর্গের উদ্দেশ্য ছিল পৃথক দ্রাবিড় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আন্দোলন ছিল নিরস্ত্র এবং শান্তিপূর্ণ। সাফল্যের জন্য আন্দোলনকারীরা আলাপ আলোচনা, বিতর্কসভা, মিছিল মিটিং এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে। এরূপ আন্দোলনের ফলে তারা রাজ্যস্তরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং জাতীয়স্তরে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠে।

এই দ্রাবিড় আন্দোলনের মাধ্যমেই বিশিষ্ট তামিল সমাজ সংস্কারক ই.ভি. রামস্বামী পেরীয়ারের নেতৃত্বে দ্রাবিড় কাজাগাম নামে (DK) একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই সংগঠন ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয়দের আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের জাত্যাভিমানকে সুসংগঠিত করে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। এই দ্রাবিড় আন্দোলন ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ ভারতীয়দের আত্মমর্যাদা প্রকাশের মুখপাত্র হয়ে উঠে। যদিও পরবর্তীকালে ব্যপক সমর্থনের অভাবে এই আন্দোলন তামিলনাড়ুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পরে।

দ্রাবিড় কাজাগাম ভেঙে প্রতিষ্ঠিত দ্রাবিড়মুন্নেত্রা কাজাগাম (DMK) দলের হাতে আন্দোলনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার চলে যায়। ১৯৫৩-৫৪ সালে তিনটি প্রচণ্ড বিক্ষোভ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক অঙ্গানে ডি.এম.কে'র আবির্ভাব ঘটে। এ দলের প্রথম আন্দোলন ছিল সাবেক কাল্লাকুডি রেলস্টেশনের নতুন নাম ‘ডালমিয়াপুরম’ বাতিল করে পুনরায় ‘কাল্লাকুডি’ নামকরণ করা। এই আন্দোলনের মাধ্যমে উত্তর ভারতীয় অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বিস্তারের

Credit: The Hindu

Anti-Hindi agitation in Tamil Nadu, 1965

HINDI PROTAGONISTS ALLEGE BID TO REVERSE POLICY

"The Times of India" News Service

NEW DELHI, December 2.

A STORM broke out in the Lok Sabha today during question-hour when protagonists of Hindi contested the Government's right to refer the question of medium of instruction to the Education Commission after Parliament had set its seal of approval on the Government's language policy.

Despite the Education Minister, Mr. M. C. Chagla's assurance that there had been no change in the language policy and that the findings of the commission were not binding on the Government, excitement ran high and a spate of points of order ... the Government's policy which was quite correct. His remark that the findings of the Commission were not binding on the Government or his Ministry was greeted with loud cries: "Then why appoint a commission?"

The furore started when Mr. Prakash Vir Shastri asked whether the reference to the Commission meant that the Minister did not agree with the Government's policy. Would it not also mean that Parliament, which had endorsed the policy, was being bypassed?

GOVT. POLICY

Other questions were also on similar lines. Mr. Bhagwat Jha Azad said that he had appointed a Commission ... before Parliament and it would be open to the House to take whatever attitude it liked on them.

Earlier, answering questions on the report of the Sampurnanand Committee, Mr. Chagla said that he had been consistently taking the position that regional languages should become the media of instruction in universities. But they should go slow in the matter. This was also the recommendation of the National Integration Committee.

He said that Gujarat was the only State which had introduced English from Standard VIII. Most other States had introduced it from Standard V. One or two States were starting English from Standard III.

বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রতিবাদ ছড়িয়ে পরে। এই দলের দ্বিতীয় আন্দোলন ছিল বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে তামিলনাড়ুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। এদের তৃতীয় আন্দোলন ছিল রাজ্য সরকার পরিচালিত বৃত্তি - শিক্ষা প্রকল্পের বিরুদ্ধে যা রচিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে। দলটি হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করার বিরুদ্ধেও আন্দোলন সংগঠিত করে। ১৯৬৫ সালে এই হিন্দি বিরোধী আন্দোলনের সাফল্য দলটিকে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলে।

এরূপ তীব্র আন্দোলনের মাধ্যমে ডিএমকে (DMK), ১৯৬৭ সালে তামিলনাড়ুর বিধানসভার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সেই থেকে দ্রাবিড় দলগুলো তামিলনাড়ুতে রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রেখে চলেছে। যদিও ডিএমকে নেতা সি. আন্নাদুরাই এর মৃত্যুর পর ডিএমকে দল বিভাজিত হয়ে এআইএডিএমকে (AIADMK) নামক আরেকটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয় যারা নিজেদেরকে ডিএমকে দলের প্রকৃত রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী বলে দাবি করতে থাকে। এই দুটি দলই গত চল্লিশ বছর ধরে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে আসছে। ১৯৯৬ সাল থেকে এই দুটি দলের যে-কোনো একটি কেন্দ্রীয় সরকারের জোট সঙ্গী হয়ে আসছে। ১৯৯০ সালে তামিলনাড়ুতে আরও অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। যেমন— মারুমালারছি দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম (MDMK), পাট্টালী মাক্কাল কাছি (PMK) এবং দেশীয় মোরপোক্কু দ্রাবিড় কাজাগাম (DMDK) ইত্যাদি। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মূল আদর্শ হলো তামিলনাড়ুর জাত্যাভিমান আন্দোলনকে আরও বেশি সক্রিয় ও সুসংগঠিত করা। প্রাথমিক পর্যায়ে তামিলনাড়ুর এই আঞ্চলিক আন্দোলন জাতির পক্ষে হুমকিস্বরূপ মনে হলেও বাস্তবে এটি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক সুদৃঢ় মেলবন্ধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হয়।

DELHI EDITION

Regd. No. L. 1712.

The Hindustan Times

LARGEST CIRCULATION IN NORTHERN, NORTH-WESTERN AND CENTRAL INDIA

VOL. XXIV. NO. 295 NEW DELHI: TUESDAY, OCTOBER 28, 1947. PRICE TWO ANNAS

KASHMIR ACCEDES TO INDIA

PLEBISCITE SOON ON RULER'S DECISION

Troops And Arms Flown To Srinagar

CONTACT WITH RAIDERS NEAR BARAMULA

MORE REINFORCEMENTS BEING DISPATCHED

SHEIKH ABDULLA TO FORM INTERIM GOVT.

UNION TROOPS RUSHED FOR PROTECTION OF STATE

(By Our Special Representative)

Credit: Hindustan Times

শেখ মহম্মদ আবদুল্লা (১৯০৫-১৯৮২)
জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যতম নেতা; জম্মু ও কাশ্মীরে স্বায়ত্ত শাসন ও ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা, রাজন্য শাসনের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় আন্দোলনের নেতা, মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণার কারণে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেন। ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতা, ১৯৪৭ সালে ভারতের সাথে যুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ এবং ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত জেলবন্দি, পরে আবার ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কারাবন্দি থাকেন, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে চুক্তির পর ১৯৭৪ সালে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হোন।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী বীরত্বের সাথে অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করে। মহারাজা হরি সিং ভারতের সাথে জম্মু ও কাশ্মীরের সংযুক্তিকরণের চুক্তিপত্রে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। চুক্তিতে বলা হয় জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে গণভোটের মাধ্যমে সেখানকার ভবিষ্যত নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হবে। ১৯৪৮ সালে শেখ আবদুল্লা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হন। (রাজ্যের প্রধান শাসককে তখন প্রধানমন্ত্রী বলা হত)। চুক্তিতে ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের স্বতন্ত্র অবস্থান স্বীকার করে নিয়েছেন।

বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধ (External and Internal disputes)

তখন থেকেই জম্মু ও কাশ্মীর নানাহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কারণে সর্বদা সংঘাত, বিতর্ক ও সংঘর্ষে জর্জরিত। পাকিস্তান সবসময় জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকাকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে আসছে। আমরা দেখেছি ১৯৪৭ সালে দেশভাগের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তানের প্ররোচনা ও সেনা সহায়তায় একদল উপজাতি অনুপ্রবেশকারী জম্মু ও কাশ্মীরে সশস্ত্র অভিযান চালায় এবং ফলস্বরূপ এই রাজ্যের একটা অংশ পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে চাল যায়। ভারত এই ঘটনাকে অবৈধ ও অন্যায় বলে দাবি করলে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর অঞ্চলকে 'আজাদ কাশ্মীর' বলে ঘোষণা করে।

১৯৪৭ সাল থেকেই কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবস্থান ও মর্যাদার প্রশ্নে ভারত সরকারের সাথে কাশ্মীরী জনগণের একটা বিরোধ রয়েছে। তোমরা জান যে, ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নং ধারায় কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়েছে। গত বছর একাদশ শ্রেণিতে তোমরা ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৭১ নং ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিশেষ শর্তগুলো সম্পর্কে জেনেছ। ৩৭০ নং ধারায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য ও অধিক স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান রয়েছে। শর্তানুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের সকল ধারা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভারতীয় সংসদে গৃহীত আইন 'রাজ্যের সম্মতিতেই শুধুমাত্র কাশ্মীরে প্রযোজ্য হতে পারে।

কাশ্মীর রাজ্যের এই বিশেষ মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র দেশে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বাইরে অনেকে মনে করেন যে সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা বর্ণিত এই বিশেষ মর্যাদাদান ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সাথে সম্পূর্ণ সংহতিমূলক নয়। সুতরাং তারা সংবিধানের ৩৭০ নং ধারাকে বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরকে অন্যান্য রাজ্যের সাতে সমমর্যাদা সম্পন্ন করার দাবি করেন।

অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরি জনগণ মনে করেন যে, সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা কাশ্মীরের মর্যাদা ও স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গো তারা তিনটি জোরালো ক্ষোভ ও অভিযোগ উপস্থাপন করেন। তাদের প্রথম অভিযোগ হলো, পাকিস্তানের অনুপ্রবেশকারীদের পরাজয়ে পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ভারত সরকার কর্তৃক গণভোটের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা রক্ষিত হয়নি। তারা 'গণভোটের' দাবি করতে থাকে। দ্বিতীয়ত, ৩৭০ নং ধারায় কাশ্মীর রাজ্যকে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বাতন্ত্রতা দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবে কার্যকরী হতে দেখা যায় না। এই ক্ষোভের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরি জনগণ পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দাবি করতে থাকে। তৃতীয়ত, অভিযোগ হল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে এরূপ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পরিলক্ষিত হয় না।

চলো ছায়াছবিটি দেখি

রোজা

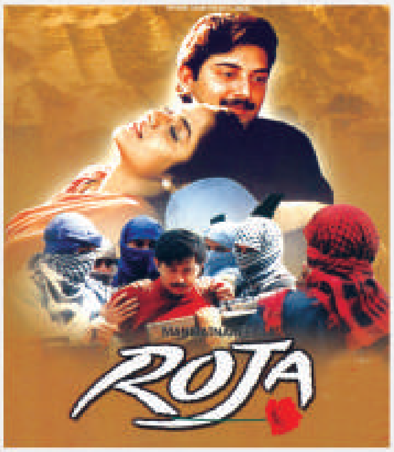

একটি তামিল সিনেমায় রোজা নামের মমতাময়ী ও প্রমেময়ী এক নববিবাহিত রমণীর মনের গভীর যন্ত্রণা ও আশঙ্কার দৃশ্য প্রকাশ হয়েছে যখন তার স্বামীকে উগ্রপন্থীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। রোজার স্বামী ঋষি শত্রুপক্ষের গোপন বার্তার অর্থ উদ্ধারের কাজে কাশ্মীরে কর্মরত ছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালোবাসা দেখে উগ্রপন্থীরা স্বামীকে অপহরণ করে এবং তাদের এক জেলবন্দি নেতাকে মুক্ত করার বিনিময়ে ঋষিকে ছেড়ে দেওয়ার শর্ত আরোপ করে।

রোজার জীবনে দুঃখ, যন্ত্রণা এবং গভীর আশঙ্কার ছায়া নেমে আসে। সে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সরকারি অফিস ও রাজনৈতিক নেতার কাছে ধর্না দিতে থাকে। গল্পটি রচিত হয় ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। ছবিটি সমগ্র ভারতবর্ষে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং হিন্দি ও অন্যান্য ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়।

সাল : ১৯৯২
ডিরেক্টর : মনিরত্নম
চিত্রনাট্য : মনিরত্নম
অভিনয়ে (হিন্দি অনুবাদ) : মধু, অরিন্দম স্বামী, পঙ্কজ কাপুর, জনগরাজ।

১৯৪৮ সালের পর রাজনৈতিক অবস্থা (Politics since 1948)

রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হবার পর শেখ আবদুল্লা জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ জনগণের স্বার্থে স্থানীয় ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার ও অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু কাশ্মীরের নিজস্ব স্বাধীকার ও স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আবদুল্লা সরকারের মত বিরোধ বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায় ১৯৫৩ সালে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে দীর্ঘদিন কারাবন্দি করে রাখা হয়। কাশ্মীরের পরবর্তী নেতৃবৃন্দ শেখ আবদুল্লার মতো এতটা জনপ্রিয় ছিলেন না বলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়েই তাদের চলতে হয়। রাজ্যের বিভিন্ন নির্বাচনে প্রায়শই শাসকদলের বিরুদ্ধে অসদুপায় অবলম্বন ও রিগিং এর মারাত্মক অভিযোগ উঠে।

১৯৫৩ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যত এই দীর্ঘ সময়ে রাজ্যের রাজনীতিতে কংগ্রেস দলেরই বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে বেড়িয়ে এসে (শেখ আবদুল্লা ব্যতিত) দলছুট একটা অংশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস দলের প্রত্যক্ষ সমর্থনে কিছুদিন রাজ্যের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে এবং পরবর্তীতে এরা কংগ্রেস দলের সাথে মিশে যায়। এই ভাবে কংগ্রেস দল রাজ্য সরকারকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়। এই সময়ের মধ্যে শেখ আবদুল্লা ও ভারত সরকারের মধ্যে একটা সন্তোষজনক সমাধানের জন্য বেশ কয়েকবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অবশেষে ১৯৭৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে শেখ আবদুল্লার মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং শেখ আবদুল্লা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

The Times of India

Published simultaneously in Bombay, Delhi and Calcutta.

NO. 221. VOL. CXV. BOMBAY: MONDAY, AUGUST 10, 1953 2½ ANNAS

SHEIKH ABDULLAH ARRESTED

STRICT SECURITY ARRANGEMENTS

Permits Issued Invalidated

CHARGES OF CORRUPTION AND MALADMINISTRATION

Bakshi Ghulam Mohammed Sworn In As Prime Minister

POLICE OPEN FIRE ON VIOLENT DEMONSTRATORS

"The Times of India" News Service

SRINAGAR, August 9.

THE arrest of Sheikh Mohammad Abdullah, the 48-year-old Prime Minister of Kashmir, at his week-end retreat at Gulmarg today, followed swiftly upon his dramatic removal from office late last night by the Sadar-i-Riyasat as his Cabinet "had lost the confidence of the people."

Grave Threat To Freedom

PREMIER'S CALL

Kashmir Faces Crisis

CALM U.S. RECEPTION TO H-BOMB CLAIM

Serious Consideration Of M. Malenkov's Speech

"Application Of Stalinist Line"

REACTIONS IN LONDON

SOBER SATISFACTION IN DELHI

"Timely Action By The Sadar-i-Riyasat"

THE "LION" IS ANGRY

Credit: The Times of India

http://govande.sulekha.com

পদে নির্বাচিত হন। তিনি ন্যাশনাল কনফারেন্সকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং ১৯৭৭ সালে বিধানসভার নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। শেখ আবদুল্লা ১৯৮২ সালে মৃত্যু বরণ করলে তার পুত্র ফারুক আবদুল্লা ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পরে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কাশ্মীরের রাজ্যপাল তাকে পদচ্যুত করলে ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে বেড়িয়ে আসা দলছুট একটা অংশ কেন্দ্রীয় সহায়তায় অল্প কিছুদিন কাশ্মীরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে ফারুক আবদুল্লা সরকারের অপসারণের পর কাশ্মীরি জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ইন্দিরা গান্ধি ও শেখ আবদুল্লার মধ্যে চুক্তির পরবর্তী পর্যায়ে কাশ্মীরে যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তা বিনষ্ট হয়। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মনে করে রাজ্য রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের এই আশঙ্কা ও ক্ষোভ আরও বেশি বৃদ্ধি পায় যখন ১৯৮৬ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন কংগ্রেস দলের সাথে ন্যাশনাল কনফারেন্সের একটি নির্বাচনী জোট গড়ে উঠে।

কাশ্মীরের শান্তি

বিদ্রোহ এবং তার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ (Insurgency and after)

এই পরিস্থিতির মধ্যেই কাশ্মীরে ১৯৮৭ সালে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন দপ্তরের সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেস জোট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং ফারুক আবদুল্লা মুখ্যমন্ত্রী পদে পুনরায় ফিরে আসেন। কিন্তু একটা বিরাট সংখ্যক জনগণের মনে হয়েছিল যে এই ফলাফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের প্রতিফলন ঘটেনি এবং সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ব্যাপক রিগিং করা হয়েছে। এছাড়াও ১৯৮০ সালের পূর্ব থেকেই রাজ্যের জনগণের মধ্যে অকর্মণ্য ও দুর্নীতিবাজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্রমশ বিনষ্ট হতে থাকলে রাজ্যের জনগণ আরও বেশি বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কাশ্মীরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোলাটে হতে থাকে এবং একটা মারাত্মক বিদ্রোহের জন্ম দেয়।

১৯৮৯ সালে স্বাধীন কাশ্মীরের দাবিতে সমগ্র রাজ্যে উগ্রপন্থী আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। এই উগ্রবাদী আন্দোলন পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সব রকমের নৈতিক ও সামরিক সাহায্য লাভ করে। এমতাবস্তায় বহু বছর ধরে এই রাজ্য রাষ্ট্রপতি শাসনাধীন সামরিক নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৯০ সাল থেকে সুদীর্ঘকাল কাশ্মীরের জনগণ সশস্ত্র বিদ্রোহীদের হিংস্রতা ও সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুরতার সাক্ষী। ১৯৯৬ সালে ফারুক আবদুল্লার নেতৃত্বে ন্যাশনাল কনফারেন্স দল জম্মু ও কাশ্মীরের স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে বিধানসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষমতা লাভ করে। ২০০২ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ একটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করে। ন্যাশনাল কনফারেন্স দল রাজ্যের ক্ষমতা দখলে ব্যর্থ হয় এবং পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক পার্টি (PDP) ও কংগ্রেস দলের জোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়।

> “দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে দেওয়ার পর (১৯৮৪ সাল) কাশ্মীরি জনগণ বিশ্বাস করতে থাকে যে ভারত সরকার কখনোই স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেবে না।”
>
> **বি. কে. নেহরু**
> ফারুক আবদুল্লা সরকারকে ভেঙে দেওয়ার পূর্বে কাশ্মীরের রাজ্যপাল।

বিচ্ছিন্নতাবাদ ও পরের ঘটনাসমূহ (Separatism and beyond)

১৯৮৯ সাল থেকেই রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি বিভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ছড়িয়ে পরতে থাকে। তাদের অন্যতম দাবি ছিল ভারত ও পাকিস্তান থেকে মুক্ত একটি সম্পূর্ণ ‘স্বাধীন কাশ্মীর’। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটা

অংশ কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করতেও চাইত। অন্যদিকে তৃতীয় আর একটি অংশ চাইত কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আরও বেশি স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার নিয়ে অবস্থান করুক। আবার কাশ্মীরের স্বায়ত্ত শাসনের দাবি জম্মু ও লাদাক অঞ্চলের অধিবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে উদ্বুদ্ধ করে। এই দুই অঞ্চলের জনসাধারণ সরকারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক অবহেলা ও পাশ্চাদ্‌পদ করে রাখার অভিয়োগ করতে থাকে। ফলে রাজ্যের স্বায়ত্ত শাসনের মধ্যে রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের স্বায়ত্ত শাসনের দাবিও জোরালো হতে থাকে।

উগ্রবাদীদের প্রতি গণসমর্থন ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং জনগণ শান্তি স্থাপনে বিশেষ তৎপরতা শুরু করে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের সাথে আলাপ আলোচনার দরজা খুলে দেয়। স্বাধীন রাজ্যের দাবি পরিত্যাগ করে বেশিরভাগ বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী দল কাশ্মীরকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে ভারত সরকারের সাথে আলোচনার টেবিলে বসতে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

জম্মু ও কাশ্মীর বহু বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটা শুধু বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি ও উপজাতির বৈচিত্র্য নয়, এখানে রাজনৈতিক প্রত্যাশা ও দাবির বিভিন্নতাও রয়েছে। যদিও এই সমস্ত পার্থক্য ও বৈচিত্র্য এবং নিরন্তর রাজনৈতিক সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও জম্মু ও কাশ্মীরের বৃহৎ অংশ এখনো তাদের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মাস্টার তারা সিং (১৮৮৫-১৯৬৭)
বিখ্যাত শিখ গুরু এবং রাজনৈতিক নেতা। শিরোমণি গুরুদোয়ারার প্রবন্ধক কমিটির (SGPC) প্রথম সারির নেতা; আকালি আন্দোলনের সমর্থক ও নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক কিন্তু কংগ্রেসের মুসলিম তোষণের সমালোচক ও বিরোধী। স্বাধীনতার পরে তিনি পৃথক পাঞ্জাব রাজ্যের বরিষ্ঠ এডভোকেট ছিলেন।

পাঞ্জাব (Panjab)

১৯৮০'র দশকে পাঞ্জাব রাজ্যের প্রভূত উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়। অবিভক্ত পাঞ্জাবের সামাজিক বন্ধন ও রাজনৈতিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে প্রথমে দেশভাগ এবং পরে হরিয়ানা ও হিমাচল— এ দুটি প্রদেশ গঠনের পর। ১৯৫০'র দশকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন হলেও পাঞ্জাবী ভাষীদের পৃথক রাজ্য গঠনের জন্য ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। শিখ ধর্মাবলম্বীদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আকালি দল ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'পাঞ্জাবী সুবা' গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। শিখ ধর্মাবলম্বীগণ বর্তমানে পৃথক পাঞ্জাব রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট (Political context)

পাঞ্জাব রাজ্যের পুনর্গঠনের পর আকালি দল প্রথমে ১৯৬৭ এবং পরে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসে। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের জোট সরকার গঠন করতে হয়। আকালি দল উপলব্ধি করতে পারে যে রাজ্যের সীমানার ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠন করা সত্ত্বেও তাদের রাজনৈতিক অবস্থান অনিশ্চিত। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের নির্বাচিত আকালি সরকারকে মধ্যবর্তী সময়ে বরখাস্ত করে দেয়। দ্বিতীয়ত, তারা হিন্দুদের কাছ থেকে ব্যপক সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হয় এবং তৃতীয়ত, অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতো শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতিভিত্তিক অনেক ভেদাভেদ ছিল। হিন্দু ও শিখ উভয় সম্প্রদায়ের দলিতদের কাছে কংগ্রেস দল আকালি দলের তুলনায় অধিক জনপ্রিয় ছিল।

এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ১৯৭০'র দশকে আকালি দলের একটা অংশ এই অঞ্চলের রাজনৈতিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবি উত্থাপন করে। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত আনন্দপুর সাহিব সম্মেলনে

গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই দাবি উত্থাপিত হয়। আনন্দপুর সাহিব সম্মেলনের অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠা ও কেন্দ্র রাজ্যের সম্পর্কের পুনর্মুল্যায়ন করা। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে শিখ ধর্মাবলম্বীদের নিজস্ব সম্প্রদায় ও জাত্যাভিমানের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল এ অঞ্চলের 'বোলবালা' অর্থাৎ শিখদের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যদিও এরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা কিন্তু বাস্তবে এটি স্বতন্ত্র শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে পরিণত হয়।

যদিও এই দাবি সংখ্যাগরিষ্ঠ শিখ ধর্মাবল্বীদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ১৯৮০ সালে নির্বাচিত আকালি সরকারকে বরখাস্ত করার কয়েক বছর পর আকালি দল পাঞ্জাব ও তার প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর মধ্যে জলবণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। এমতাবস্থায় কয়েকজন ধর্মীয় নেতা শিখদের জন্য নিজস্ব স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করে, অন্যদিকে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক স্বাধীন 'খালিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে।

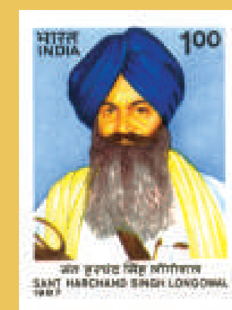

সন্ত হরচাঁদ সিং লাঙ্গোয়াল (১৯৩২-১৯৮৫)

শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু ও রাজনৈতিক নেতা, ১৯৬০'র দশকের মাঝামাঝি আকালি নেতা হিসেবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন; ১৯৮০ সালে আকালি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আকালিদের অন্যতম প্রধান দাবির বিষয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সাথে চুক্তি সম্পাদিত করেন। অপরিচিত শিখ যুবক দ্বারা নিহত হন।

সহিংস পরিক্রমা (Cycle of Violence)

কিছুদিনের মধ্যেই আকালি আন্দোলনের নেতৃত্ব উদারবাদীদের হাত থেকে উগ্রবাদী নেতাদের হাতে চলে যায় এবং আন্দোলন ধীরে ধীরে সহিংস ও সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়। অমৃতসরে শিখদের পবিত্র 'স্বর্ণ মন্দির'-কে প্রধান দপ্তর ও দুর্গ বানিয়ে উগ্রবাদীরা তাদের সহিংস ক্রিয়াকলাপ চালাতে থাকে। ১৯৮৪ সালে স্বর্ণ মন্দিরকে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 'অপারেশন ব্লু স্টার' নামে একটি সামরিক অভিযান চালায়। এই সামরিক অভিযানে স্বর্ণ মন্দিরকে সশস্ত্র উগ্রবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করা গেলেও মন্দিরের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের কিছু ক্ষতি হয়। এই ঘটনায় শিখ ধর্মাবলম্বীদের মনে বিশেষ ক্ষোভের সঞ্চার করে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরের অধিকাংশ শিখগণ এই সামরিক অভিযানকে নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মর্যাদার উপর আক্রমণ বলে মনে করতে থাকে। ফলে শিখ যুবকগণ নতুন করে হিংস্র ও সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পরে।

পরবর্তী সময়ে বেদনাদায়ক কয়েকটি ঘটনা পাঞ্জাব সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। ১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি নিজ বাড়িতেই দেহরক্ষীদের হাতে নিহত হন। হত্যাকারী দুজনই ছিল শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তারা এই হত্যাকে স্বর্ণ মন্দিরে সামরিক অভিযান 'অপারেশন ব্লু স্টার' এর প্রতিশোধ বলে ঘোষণা করে। যদিও এই হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ভারতবাসী ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং দিল্লি ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে শিখ বিরোধী সহিংস কর্মকাণ্ড শুরু হয়। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে শিখদের বিরুদ্ধে এ ধরনের হিংস্র তাণ্ডব চলতে থাকে। রাজধানী দিল্লিতে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে দুই হাজারেরও বেশি শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ খুন হন। পাশাপাশি

नईदुनिया

र्ण मंदिर पर सेना का कब्जा : भिंडरांवाले का पता नहीं

डाई में ५९ सैनिकों सहित ३२५ मरे, अकाल तख्त को क्षति

पंजाब के ३८ गुरुद्वारों, ५ मंदिरों व १ मस्जिद में एक साथ सेना का प्रवेश,

सेना पर राकेट व मिसाइलों से प्रहार, लोंगोवाल व टोहरा सुरक्षित

THE HINDUSTAN TIMES

ARMY CONTROLS TEMPLE

250 terrorists and 59 jawans killed

Last bastion of resistance crumbles: 700 arrested

Jammu seals border

THE TIMES OF IND

SURRENDER AT GOLDEN TEMPLE

No damage caused to Harmandir Sahib

58 armymen and 250 terrorists killed

> এমন স্বাক্ষী আছে যা থেকে যানা যায় যে ১৯৮৪ সালে ৩১ অক্টোবর কোনো এক ব্যক্তির উপস্থিতিতে শিখদের হত্যা ও তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে, দোকানপাট লুঠ করার জন্য সংঘবদ্ধ দাঙ্গাকারীদের নির্দেশদান করা হচ্ছে। এরূপ ৮টি মিটিং করা হয়। এই সকল শিখ বিরোধী আক্রমণ ছিল সুপরিকল্পিত, আক্রমণকারীদের কোন পুলিশি ভয় ছিল না কারণ দাঙ্গাকারীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে এই বলে যে নির্দিষ্ট দাঙ্গা অঞ্চলে কোন পুলিশি ব্যবস্থা থাকবে না।

জাস্টিস নানাবতী
কমিশন অব এনকুয়ারি,
রিপোর্ট, ভলিয়্যুম-১, ২০০৫

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে কানপুর, বোকারো এবং ছাস (Chas) এ শতশত শিখকে নির্বাচারে হত্যা করা হয়। এই সকল নিষ্ঠুর দাঙ্গায় বহু শিখ পরিবার তাদের পুরুষ সদস্যদের হারিয়ে। একদিকে স্বজন হারানোর বেদনা ও অন্যদিকে আর্থিক ক্ষতি তাদেরকে দিশাহারা করে তোলে। এবিষয়ে শিখ সম্প্রদায়ের প্রধান অভিযোগ হল সরকার এই শিখ বিরোধী দাঙ্গা বন্ধ করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট বিলম্ব করে এবং দাঙ্গায় অভিযুক্ত অপরাধীদের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধানে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর ২০০৫ সালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং শিখ বিরোধী দাঙ্গার ঘটনার জন্য জাতির কাছে দুঃখ প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

Credit : Raghu Rai

মহিলাগণ ইন্দিরা গান্ধির খুনের দৃশ্য সম্বলিত দেওয়াল চিত্রটি দেখছেন।

Special Edition
THE TIMES OF INDIA
INDIRA GANDHI SHOT AT
CONDITION CRITICAL
Two shot dead
Blood transfusion

Credit : Times of India

ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের দিন টাইমস অব ইন্ডিয়া মধ্যরাত্রিতে পত্রিকার একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে।

> "১৯৮৪ সালে যা ঘটেছে তারজন্য শুধু শিখ সম্প্রদায় নয়, সমগ্র জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। কোন প্রকার মিথ্যা আত্ম অহংকার নিয়ে আমি এখানে উপস্থিত হইনি। এই লজ্জাজনক ঘটনার জন্য আমি ভারত সরকার এবং সমগ্র জাতীর পক্ষ থেকে মাথানত করে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিন্তু মহাশয়গণ, ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি খারাপ-ভালো এমন অসংখ্য ঘটনা নিয়ে এগিয়ে চলছে। অতীত আমাদের সাথে আছে। আমরা দুঃখজনক অতীতকে কখনো ফিরিয়ে আনতে চাইনা। মানুষ হিসেবে আমাদের যে ইচ্ছাশক্তি ও দক্ষতা রয়েছে তা দিয়ে আমরা সকলের জন্য একটা সুখী ও সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারি।"
>
> প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং রাজ্যসভায় আলোচনার অংশবিশেষ। ১১ আগস্ট, ২০০৫

শান্তির পথ (Road to peace)

১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নরমপন্থী আকালি নেতাদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। তৎকালীন আকালিদলের সভাপতি হরচাঁদ সিং লাঙ্গোয়াল এর সাথে ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি রাজীব লাঙ্গোয়াল চুক্তি বা পাঞ্জাব চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। চুক্তিতে চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাবের কাছে হস্তান্তর করার বিষয়ে ঐক্যমত হয়। এছাড়াও পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে একটি পৃথক কমিশন গঠন করা এবং পাঞ্জাব হরিয়ানা ও রাজস্থানের মধ্যে নদীর জলবণ্টন বিষয়ে একটি ট্রাইবুনাল গঠন করার কথা বলা হয়। চুক্তির মধ্যে আরও ছিল পাঞ্জাবে উগ্রপন্থার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং পাঞ্জাবে বিশেষ সামরিক আইন প্রয়োগের জন্য নিযুক্ত সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করা।

যদিও খুব সহজে এবং তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। সহিংস কার্যকলাপ প্রায় এক দশক ধরে চলতে থাকে। একদিকে যেমন উগ্রবাদীদের সশস্ত্র কার্যকলাপ চলতে থাকে অন্যদিকে তেমনি পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠে। রাজনীতিগতভাবে আকালি দলে বিভাজন সৃষ্টি হয়। রাজ্যের যাবতীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাতিল করে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে। রাজ্যের এই অস্থির পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা খুব সহজ কাজ ছিল না। ১৯৯২ সালে পাঞ্জাবের নির্বাচনে মাত্র ২৪ শতাংশ নাগরিক ভোটদানে অংশগ্রহণ করে।

নিরাপত্তা বাহিনীর অক্লান্ত প্রচেস্টায় পাঞ্জাবের সহিংসতা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু চরমপন্থীদের এই সহিংসতা ইতোমধ্যে পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে, অবশেষে ১৯৯০-এর মাঝামাঝি পাঞ্জাবে শান্তি ফিরে আসে। ১৯৯৭ সালে আকালি দল (বাদল গোষ্ঠী) ও বিজেপি দলের জোট বিধানসভার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে সহিংস সংগ্রাম যুগের অবসান ঘটে। রাজ্য পুনরায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল স্রোতে সামিল হয়। জনগণের মধ্যে ধর্মীয় পরিচিতি ও অনুভূতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করলেও রাজ্য রাজনীতিতে পুনরায় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ফিরে আসে।

উত্তর পূর্বাঞ্চল (The North-East)

১৯৮০ সালে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আঞ্চলিকতাবাদ এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছায়। এই অঞ্চলে সাতটি রাজ্যের অবস্থান, তাই একে সাত বোনের (Seven Sister) অঞ্চল বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ অঞ্চলে ভারতের মোট সংখ্যার মাত্র চার (৪) শতাংশ জনগণের বসবাস কিন্তু এর ভৌগোলিক সীমানা জনসংখ্যার ভিত্তিতে অন্য অঞ্চলের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। মাত্র ২২ কিলোমিটারের একটি ছোট্ট ভূখণ্ড দ্বারা এ অঞ্চলটি অবশিষ্ট ভারতের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে এ অঞ্চলের বেশিরভাগ সীমানা রয়েছে– চিন, মায়ানমার ও বাংলাদেশের সাথে যুক্ত। তাই এ অঞ্চলকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার বলা হয়।

১৯৪৭ সাল থেকেই এই অঞ্চল অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী। একদা রাজন্যশাসিত স্বাধীন রাজ্য ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মেঘালয় স্বাধীনতার পর ভারতের সাথে যুক্ত হয়। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিভিন্ন সময়ে বহু রাজনৈতিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে চলতে হয়েছে। ১৯৬৩ সালে নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হয়, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং মেঘালয় পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে ১৯৭২ সালে এবং মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে ঘোষিত হয় ১৯৮৭ সালে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক হয়ে পরে ফলে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও উন্নয়নের প্রশ্নে এ অঞ্চল ক্রমাগত অবহেলার শিকার হয়। এখানকার রাজনীতিও ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। পাশাপাশি এ অঞ্চলের বেশিরভাগ রাজ্যে পার্শ্ববর্তী দেশ ও রাজ্য থেকে আগত শরণার্থী সমস্যার কারণে জনসংখ্যার ভারসাম্যের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে।

দ্রষ্টব্য : মানচিত্রটি যথাযথভাবে স্কেলভিত্তিক নয়। সুতরাং ভারতের বাহ্যিক সীমানার মানচিত্র হিসাবে এটি যথার্থ নয়।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা জটিল সামাজিক কাঠামো এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যসমূহের তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনুন্নয়ন ইত্যাদি কারণে এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর আঞ্চলিকতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এছাড়াও সুদীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানা ও অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এখানকার রাজনীতি ক্রমশ জটিল হয়ে পরে। সে সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনীতি তিনটি প্রধান বিষয় যথা স্বায়ত্ত শাসন, বিতাড়ন এবং বহিরাগত অধিবাসীদের বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালে শুরু হওয়া স্বায়ত্ত শাসন সংক্রান্ত দাবির হাত ধরে ১৯৮০ সালে এসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবির পক্ষে আন্দোলন নাটকীয়ভাবে তীব্রতা লাভ করে।

স্বায়ত্ত শাসনের দাবি (Demands for Autonomy)

স্বাধীনতার সময় মণিপুর ও ত্রিপুরা বাদে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছিল আসাম রাজ্যের সীমানাভুক্ত। কিন্তু অসম সরকার অহমিয়া ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণার উদ্যোগ নিলে এ অঞ্চলে বসবাসরত অন্যান্য অ-অসমীয়া জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। আসাম সরকারের এই উদ্যোগের

বিরুদ্ধে সমগ্র রাজ্যে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয় এবং কোথাও কোথাও দাঙ্গা বেধে যায়। বেশিরভাগ উপজাতি সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ আসাম রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি করতে থাকে। তারা পূর্ব-ভারতীয় উপজাতি মোর্চা নামে একটি সংগঠন তৈরি করে। পরে ১৯৬০ সালে এই অঞ্চলের সকল উপজাতি সংগঠন আরো সুসংহতভাবে সর্বদলীয় পার্বত্য সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। তারা আসাম রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি উপজাতি রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার আসাম রাজ্য ভেঙে মেঘালয়, মিজোরাম ও অরুণাচল রাজ্য গঠন করে। ত্রিপুরা ও মণিপুরও ধীরে ধীরে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

১৯৭২ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শেষ হয়। কিন্তু এরপরেও এ অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বায়ত্ত শাসনের দাবির পক্ষে আন্দোলনের অবসান ঘটেনি। উদাহরণস্বরূপ আসামে বোড়ো, কার্বিস এবং ডিমাসাস প্রভৃতি সম্প্রদায় পৃথক রাজ্যের দাবি উত্থাপন করে। দাবি আদায়ের জন্য এ গোষ্ঠীগুলো একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করে অন্যদিকে তেমনি চরমপন্থী কার্যকলাপও বজায় রাখে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহ পৃথক রাজ্যের দাবি তোলে। যদিও কোন রাজ্যকে ভেঙে ক্রমাগত ছোটো থেকে আরও ছোটো রাজ্যের পুনর্গঠন করা সম্ভব নয়। এ কারণে আসামে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অধিক স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থেকে কতকগুলো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কার্বিস ও ডিমাসাসদের জন্য জেলা পরিষদের অধীন স্বায়ত্ত শাসন এবং বোড়োদের জন্য সম্প্রতি স্বশাসিত পরিষদ গঠন করা হয়।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন (Secessionist movement)

স্বায়ত্ত শাসনের দাবি পূরণ করা তুলনামূলকভাবে সহজ, কারণ বৈচিত্রময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর কথা মনে রেখে সংবিধানে বিভিন্ন প্রকার বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা তখনই জটিল আকার ধারণ করে যখন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুটি রাজ্যে এরূপ মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এদুটি রাজ্যের উদাহরণ অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা বলা যেতে পারে।

স্বাধীনতার পর মিজো পর্বতকে আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বশাসিত জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মিজোদের অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে, মিজোরা যেহেতু ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা তাই মিজো অঞ্চলকে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। ১৯৫৯ সালে মিজো অঞ্চলে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় আসাম সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে মিজোদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পরে এবং স্বাধীন মিজোরামের দাবি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ মিজোরা লালডেঙ্গার নেতৃত্বে গঠন করে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে একটি সংগঠন।

১৯৬৬ সালে এম.এন.এফ (MNF) স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শুরু হয় ভারতীয় সেনাবাহিনী ও উগ্র মিজো বিদ্রোহীদের মধ্যে দীর্ঘ দুই দশকের লড়াই। পাকিস্তানের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে মিজোরা গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে। সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরাও গেরিলা যুদ্ধের উপযুক্ত জবাব দিতে থাকে। একটা সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীকেও এ যুদ্ধে অংশ নিতে হয়। এই ঘটনায় মিজো জনগণের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তারা আরও বেশি উন্মত্ত হয়ে উঠে।

সুদীর্ঘ দুই দশকের সশস্ত্র বিদ্রোহের কারণে প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশেষে উভয় পক্ষের

আমার দাদু চোন (Chon) বলেছিল যে, দিল্লির অধিবাসীগণ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানচিত্রের তুলনায় ইউরোপের মানচিত্র সম্পর্কে অনেক বেশি জানে। উনি সঠিক বলেছেন, অন্তত স্কুল বন্ধুদের দেখে আমার সেটাই মনে হয়।

লালডেঙ্গা (১৯৩৭-১৯৯০)

মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাতা নেতা; ১৯৫৯ সালে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠেন; প্রায় দুই দশক ধরে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান।; ১৯৮৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে চুক্তিবদ্ধ হন এবং নবগঠিত মিজোরাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন।

Credit : Times of India

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পাকিস্তানের গোপন আস্তানা থেকে বেড়িয়ে এসে লালডেঙ্গা ভারত সরকারের সাথে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে রাজি হয়। রাজীব গান্ধির নেতৃত্বে মিজো সম্যসার একটি সন্তোষজনক সমাধান ঘটে। রাজীব গান্ধিও লালডেঙ্গার মধ্যে ১৯৮৬ সালে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী মিজোরামকে বিশেষ অধিকার সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। এম.এন.এফ ও উগ্রপন্থা ছেড়ে শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে আসার শর্ত মেনে নেয়। লালডেঙ্গা মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী হন। এই শান্তি চুক্তি মিজো ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ উত্তোরণ। বর্তমানে মিজোরাম এই অঞ্চলের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ রাজ্য এবং সাক্ষরতা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রভূত সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।

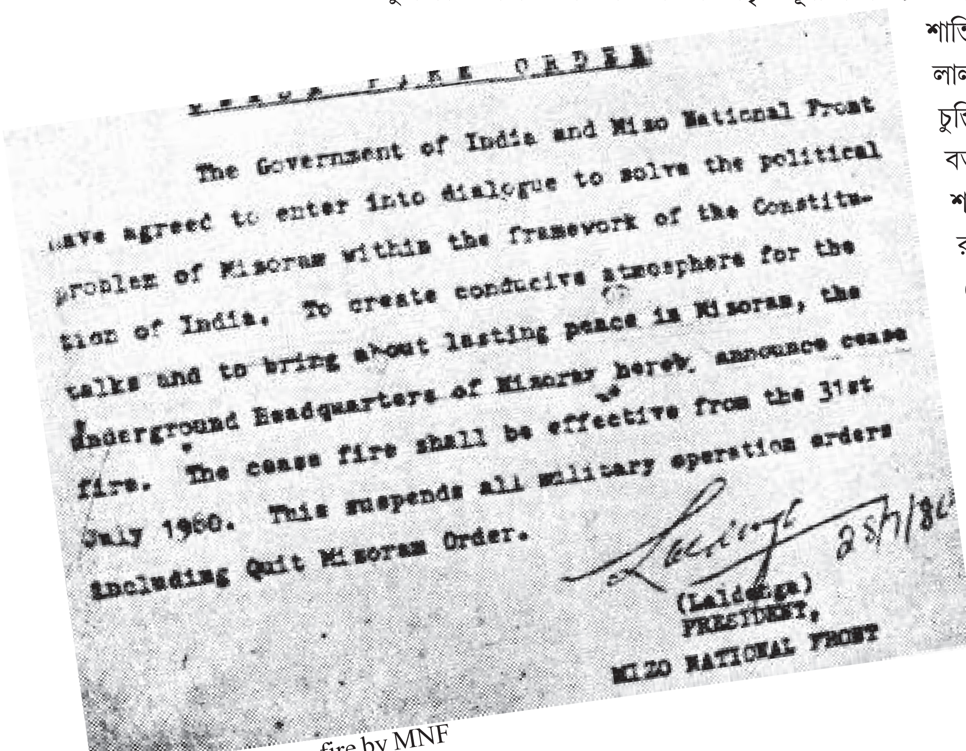

CEASE FIRE ORDER

The Government of India and Mizo National Front have agreed to enter into dialogue to solve the political problem of Mizoram within the framework of the Constitution of India. To create conducive atmosphere for the talks and to bring about lasting peace in Mizoram, the Underground Headquarters of Mizoram hereby announce cease fire. The cease fire shall be effective from the 31st July 1980. This suspends all military operation orders including Quit Mizoram Order.

2/7/80

(Laldenga)
PRESIDENT,
MIZO NATIONAL FRONT

Declaration of cease fire by MNF

নাগাল্যান্ডের ঘটনা অনেকটা মিজোরামের মতো। তবে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ত শাসনের জন্য আন্দোলন নাগাল্যান্ড সম্পর্কে অনেক আগে থেকে শুরু হলেও এখন পর্যন্ত তার পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়নি। নাগাদের বিখ্যাত নেতা অঙ্গামি জাফু ফিজো ১৯৫১ সালে নাগাল্যান্ডকে ভারতের শাসন থেকে মুক্ত একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। ফিজো সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের বহু অবেদন বারবার প্রত্যাখ্যান

করেন। নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল নাগাদের সার্বভৌমত্বের জন্য সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। দীর্ঘদিন ধরে সহিংস আন্দোলনের সাথে যুক্ত নাগা নেতাদের একটা অংশ ভারত সরকারের সাথে শান্তি চুক্তি করে কিন্তু এই শান্তিচুক্তি সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। নগা সমস্যা এখনো পূর্ণ সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে।

অঙ্গামি জাফু ফিজো (১৯০৪-১৯৯০)
নাগা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা; নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভাপতি; ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি; আত্মগোপন করে প্রথমে পাকিস্তানের আশ্রয়ে থাকেন এবং পরে জীবনের শেষ তিন দশক ইংল্যান্ডের গোপন আস্তানায় নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করেন।

বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন (Movement against outsiders)

স্বাধীনতার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন অংশ দলে দলে বহিরাগতরা শরণার্থী হিসাবে এসে বসবাস শুরু করলে স্থানীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং বহিরাগত শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। শরণার্থীরা বেশিরভাগ ভারতের অন্যকোন অঞ্চল থেকে বা অন্যদেশ থেকে এসেছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় সম্পদ এবং ভূমি দখল করে এবং কর্ম সংস্থান ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় ভাগ বসিয়ে স্থানীয়দের অধিকার সংকুচিত করছে। এই বিষয়টি নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক রাজ্যে তীব্র ও সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়।

বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো— ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত আসামে সংগঠিত অহমীয়া আন্দোলন। অহমীয়া জনগণের অভিযোগ হলো– প্রচুর পরিমাণে মুসলিম বাংলাদেশিরা আসামে এসে অবৈধভাবে বসবাস করছে। অহমীয়াদের মনে হয়েছে এই অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করতে না পারলে অহমীয়াদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হবে এবং তারা ধীরে ধীরে সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। কারণ, আসাম খনিজ তেল, কয়লা ও চা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও এখানে দারিদ্রতা ও বেকারত্ব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। তাদের মনে হয়েছে এই সকল বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের কারণে আসাম রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং স্থানীয় অহমীয়া জনগণ নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৯৭৯ সালে অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (AASU) নামে একটি ছাত্র সংগঠন বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন শুরু করে। এরা তখন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিল না। আন্দোলন মূলত ছিল অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি শরণার্থী এবং অসংখ্যা ভুয়ো ভোটারের বিরুদ্ধে। তারা দাবি করতে থাকে, ১৯৫১ সালের পর আসামে অনুপ্রবেশকারী সকল বিদেশিদের বিতাড়ন করতে হবে। এই আন্দোলন স্থানীয় জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে এবং সমগ্র আসাম জুড়ে ছড়িয়ে পরে। আন্দোলন ক্রমশ হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠলে অনেক সম্পত্তি ও বহু জীবনহানি ঘটে, অনেক বেদনাদায়ক ঘটনার সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীরা রাজ্যের অভ্যন্তরে সমস্ত ট্রেন চলাচল এবং খনিজ তেল উত্তোলন ও সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

দীর্ঘ ছয় বছর ধরে আসামে এ ধরনের অশান্ত পরিস্থিতি চলতে থাকলে রাজীব গান্ধির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার আসু ছাত্র নেতাদের সাথে সমস্যা নিরসনে আলোচনায় বসে এবং ১৯৮৫ সালে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী যে সকল বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আসামে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের চিহ্নিত করে বিতাড়ন করতে হবে। এই সাফল্যের পর আসু এবং আসাম গণসংগ্রাম পরিষদ সম্মিলিতভাবে আসম গণপরিষদ (AGP) নামে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠন করে। বিদেশি বিতাড়ন ও অহমীয়াবাসীদের জন্য একটি সুখী সমৃদ্ধ আসাম রাজ্য গড়ে তোলর প্রতিশ্রুতি দিয়ে অসম গণপরিষদ ১৯৮৫ সালে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে।

আসাম চুক্তির মাধ্যমে রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে এবং স্থানীয় রাজনীতিতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে। যদিও অবৈধ অভিবাসন সমস্যার পুরোপুরি সমাধান এখনো হয়নি। অসম ও উত্তর-পূর্বের অনেক রাজ্যের রাজনীতিতে বিদেশি বিতাড়ন সংক্রান্ত বিষয়টি এখনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করে যখন স্বভূমিতে স্থানীয় আদিবাসীরা অনুপ্রবেশকারীদের মতো সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশে আগত চাকমা শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

नईदुनिया

असम समझौता : उल्लेखनीय उपलब्धि

असम के बारे में केंद्र सरकार तथा असम के छात्र संगठनों के बीच पंद्रह तारीख को तड़के हुए समझौते से असम का छः वर्ष पुराना आंदोलन समाप्त हो गया है। असम के विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा संचालित सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान साढ़े तीन हजार से अधिक जानें गईं और अरबों रुपयों की आर्थिक हानि हुई। बारह अप्रैल १९८० को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गुआहाटी गई थीं तो छात्र नेता १९६७ को आधार वर्ष मानकर विदेशी नागरिकों की समस्या के समाधान के तैयार हो गए थे। पर प्रधानमंत्री तब १९७१ को आधार वर्ष माने जाने पर अड़ी रहीं। फलस्वरूप सरकार तथा छात्र संगठनों के बीच बातचीत टूट गई। श्रीमती गांधी ने असम समस्या को सुलझाने के लिए चार गृहमंत्रियों– (जैलसिंह, श्री आर. वेंकटरमन, श्री प्रकाशचंद सेठी तथा श्री नरसिंहराव) की सेवाओं का उपयोग किया। किंतु, अविश्वास और कठोर पैंतरों का जो वातावरण बना था, वह ऐसा नहीं था कि कोई समझौता हो पाता।

श्री राजीव गांधी के काम करने की शैली इस अर्थ में नई है कि वह सहज ही विपक्षी दल का विश्वास जीत लेती है। श्री गांधी रियायतें देने को तैयार रहते हैं, जिसके फलस्वरूप स
पक्ष भी रियायत देकर समझौता करने
हो जाता है। केंद्र सरकार के गृह सचिव
डी. प्रधान ने असम के छात्र नेताओं
बुनियादी बातचीत कर सहमति का
तैयार किया। गृहमंत्री श्री एस. बी. च
अंतिम दौर में बातचीत में भाग लिय
रुकावटों के बाद प्रधानमंत्री राजीव ग
हस्तक्षेप से छात्रों को समझौते के लिए राज
जा सका और दस सूत्री समझौते पर हस्ता
गए।

समझौते को देखने से यह स्पष्ट हो जा
कि बुनियादी मामलों में केंद्र सरकार तथा छात्र संगठनों, "आसू" तथा "अखिल असम गण संग्राम परिषद्" के नेताओं, दोनों ने एक-दूसरे को उल्लेखनीय रियायतें दी हैं। इसलिए यह मानने का कोई आधार नहीं है कि पंद्रह अगस्त का असम समझौता किसी पक्ष विशेष की जीत या किसी पक्ष विशेष की हार है। असम समझौता एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि है, जिसका श्रेय भारत के युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को जाता है। असम के दोनों छात्र संगठनों के नेता भी बधाई के पात्र हैं कि गहरे विवेक और सौहार्द का परिचय देकर वे अपना छः वर्ष पुराना आंदोलन समाप्त करने को राजी हो गए हैं। प्रधानमंत्री की कीर्ति में असम समझौते ने एक और चांद जोड़ दिया है। अभी २४ जुलाई को ही उन्होंने पंजाब की खतरनाक रूप से पेचीदा समस्या को हल कर असंभव को संभव कर दिखाया था। इस सफलता के बाईस दिन बाद ही अनंत त्रासदी के नाम से पुकारी जाने वाली असम की समस्या का समाधान खोजकर श्री राजीव गांधी ने अपूर्व समाधानकर्ता का विशेषण अर्जित कर लिया है।

समझौते के अनुसार विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए १ जनवरी १९६६ को आधार वर्ष माना गया है। इस तिथि के पहले आए विदेशियों को नियमसम्मत मान लिया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार १९६१ और १९६५ के बीच ही लगभग पाँच लाख विदेशी पूर्वी पाकिस्तान से असम राज्य में आए थे। १ जनवरी १९६६ तथा २४ मार्च १९७१ के बीच असम में
अनधिकृत रू … ने वाले विदेशियों को,
जिनकी सं
के लगभग
अनुसार प
जाएगा।
जाने की
अधिका
रूप से असम में दाखिल
(मुख्यतः बंगलादेशियों) को असम के बाहर निकाल दिया जाएगा।

समझौते के तहत
के लिए केंद्र द्वारा
प्रावधान भी समझौ

संसद के अलाव
और आम जनता ने
किया है। जैसे अकालि
समझौते के बाद राष्ट्
वैसे ही इस समझौते
महसूस की है। इन समझ
किया है कि श्री राजीव
की कोई समस्या ऐसी न
जा सके। कहा जा सकता
के समझौते ने राष्ट्र को
और प्रगति के पथ पर
हौसला दिया है। इसी भाव
कि समझौते का सब
ईमानदारी, दृढ़ता तथा सद्
किया जाए।

Cheers greet Assam pact announcement

Hindustan Times Correspondent

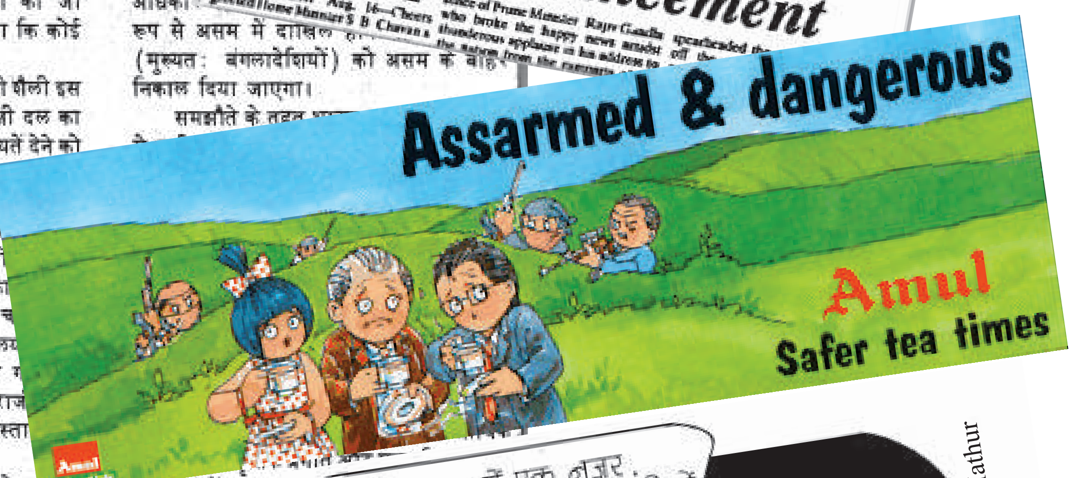

সংবাদ শেষে ভারতের পাঞ্জাব, দার্জিলিং, দিল্লি ও মিজোরাম উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহত ও আহতদের সংখ্যা উল্লেখ করা হলো।

সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি (Sikkim's merger)

স্বাধীনতার সময় সিকিম ছিল ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। অর্থাৎ সেসময় সিকিম যেমন সরাসরি ভারতের অঙ্গীভূত ছিল না অবার তেমনি এটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র্যও ছিল না। সিকিমের সামরিক নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্ক ভারত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। অন্যদিকে রাজ্যটির অভ্যন্তরীণ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন সিকিমের রাজা চোগীয়াল। এই ব্যবস্থায় চোগীয়াল রাজ্যের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়। নেপালি অধিবাসীরা ছিলেন সিকিমে সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু রাজা চোগীয়াল ছিলেন সংখ্যলঘু অভিজাত লেপচা-ভুটিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি একসময় রাজ্যে এক অস্থির পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ রাজার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভ করে।

১৯৭৪ সালে সিকিমে প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সিকিম কংগ্রেস জয়লাভ করে। তারাই ভারতের সাথে সিকিমের অন্তর্ভুক্তির উদ্যেগ গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে সিকিমের আইনসভা সিকিমকে ভারতের সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে সিকিম ভারতের সাথে পুরোপুরি মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সিকিম আইনসভার এই গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর আয়োজিত গণভোটে ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করে। ভারত সরকার সিকিমের অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় এবং সিকিম ভারতের ২২তম রাজ্য ঘোষিত হয়। রাজা চোগীয়াল ভারতের সাথে সিকিমের এই অন্তর্ভুক্তি মেনে নেয়নি। তাঁর সমর্থকদের অভিযোগ ছিল যে ভারত সরকার এক্ষেত্রে অবৈধ ষড়যন্ত্রমূলক হস্তক্ষেপ করেছে। যদিও ভারতের সাথে সিকিমের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সেখানে এখনো বিশেষ জনপ্রিয় এবং সিকিমের রাজনীতিতে এটি কখনোই বিভাজনের কারণ হয়ে উঠেনি।

কাজী লেহনদুপ দোরজি খঙসারপা (১৯০৪):
সিকিমের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা, সিকিম প্রজামণ্ডল এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরে সিকিম রাজ্য কংগ্রেস এর প্রতিষ্ঠাতা নেতা; ১৯৬২ সালে তিনি সিকিম জাতীয় কংগ্রেস দল প্রতিষ্ঠা করেন। নির্বাচনে জয়লাভের পর তিনি ভারতের সাথে সিকেমের অন্তর্ভুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

সহাবস্থান ও জাতীয় সংহতি (Accomodation and National Integration)

এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, স্বাধীনতা অর্জনের সুদীর্ঘ সাত দশক পরেও জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কীত কিছু কিছু সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান এখনো সম্ভব হয়নি। আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে স্বায়ত্ত শাসন এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে আঞ্চলিকতাবাদ কীভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে ছড়িয়ে পরেছে। ১৯৮০ এর দশক থেকে আঞ্চলিকতাবাদের এই উত্থানে সৃষ্ট রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং তা প্রশাসনের জন্য অবশিষ্ট গণতান্ত্রিক ভারতের কার্যকরী উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বৈচিত্রময় ভারতের রাজনৈতিক পরিপক্কতার পরীক্ষা বলা চলে। এই সকল উদাহরণ থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

প্রথম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো এই যে, আঞ্চলিকতাবাদ এবং স্থানীয় দাবি উত্থাপন গণতান্ত্রিক রাজনীতির অবিভাজ্য অঙ্গ। নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র দাবি উত্থাপন করা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনৈতিক স্খলন কিংবা অস্বাভাবিক আচরণ নয়। এমনকী যুক্তরাজ্যের মতো তুলনামূলক ছোটো রাষ্ট্রে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও নর্দান আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় দাবি নিয়ে আঞ্চলিকতাবাদী আন্দোলন সংঘটিত হতে দেখা যায়। স্পেন যেমন– বস্ক জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্মুখীন হয়, তেমনি শ্রীলঙ্কায় বসবাসরত তামিল জনগোষ্ঠী স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে। বস্তুত ভারতের মতো বৈচিত্রময় গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও মর্যাদাকে যথাযথ জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষা

ও মর্যদাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে নিরন্তর উদ্ভুত সমস্যার মোকাবিলা করা উচিত। কারণ জাতির গঠন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয় শিক্ষা হলো শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনা আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমনে অধিক কার্যাকরী। আশির দশকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ করলে দেখবে, পাঞ্জাবে জঙ্গিবাদের উত্থান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক উত্তেজনা, আসামে ছাত্র আন্দোলন, অগ্নিগর্ভ কাশ্মীর উপত্যাকা ইত্যাদি সমস্যাকে ভারত সরকার শুধুমাত্র আইনশৃঙ্খলাজনিত সমস্যা না ভেবে স্থানীয় আন্দোলনকারীদের সাথে শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেস্টা করেছে। ফলস্বরূপ ভারত সরকারও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পুনরায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ ফিরে আসে। মিজোরামের উদাহরণ প্রমাণ করে একটি শান্তিচুক্তি কীভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকারীদের সশস্ত্র অবস্থান থেকে শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে।

তৃতীয় শিক্ষাটি হলো ক্ষমতার অংশীদারিত্ব প্রদান। শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো প্রবর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়। রাজ্যস্তরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহ যাতে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। আবার এটা বলাও সঠিক হবেনা যে অঞ্চল বা রাজ্যগুলো নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার একমাত্র অধিকারী। কারণ বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্য মিলিতভাবে একটি জাতি বা রাষ্ট্র গঠন করে। সুতরাং, জাতির ভাগ্য নির্ধারণে অঞ্চল বা প্রদেশের মতামতকেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। জাতীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোর মতামতকে উপেক্ষা করা হলে অবিশ্বাস ও বঞ্চনার অভিযোগে আঞ্চলিক স্তরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে।

চতুর্থ যে শিক্ষা আমরা লাভ করেছি তা হলো, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে নানা বৈষম্য ও বঞ্চনার অভিযোগে স্থানীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। একথা সত্যি যে, উন্নয়নের ধারাবাহিক যাত্রা পথে ভারতের সকল অঞ্চলকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই অনুন্নত রাজ্যসমূহ এবং কিছু রাজ্যের কয়েকটি পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী বিক্ষুব্ধ হয় এবং ভারত সরকারের নীতি নির্ধারণে তাদের সমস্যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার দাবি উত্থাপন করে। কারণ তারা এজন্য ভারত সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিকেই দায়ী বলে মনে করে। যদি কিছু অঞ্চল বা রাজ্যকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে দরিদ্রদেরকে অন্য রাজ্যের উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তবে আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবেই এবং দরিদ্র অঞ্চল থেকে কর্ম প্রার্থীদের উন্নত অঞ্চলে দলে দলে অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকবে।

পরিশেষে একথা বলা যায়, বৈচিত্রময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে সংবিধান প্রণেতাদের দূরদৃষ্টি অবশ্যই বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নমনীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাজ্যের সমানাধিকার থাকলেও আঞ্চলিক প্রয়োজন ও বিশেষ পরিস্থিতিতে জম্মু ও কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও প্রথাগত আইন সংরক্ষণের জন্য উপজাতিদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অধিকার প্রদান করে, এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হয়।

ভারতীয় সংবিধানের গঠনশৈলির বিশেষত্ব হলো যে এটি অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধানের তুলনায় অনেক বেশি নমনীয় ও সংবেদনশীল। ফলে আঞ্চলিক জনগণের স্বতন্ত্র প্রত্যাশা ও স্বাধীকার দাবি ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক হবার ইচ্ছাকে কখনোই উৎসাহিত করেনি। সুতরাং আঞ্চলিকতাবাদের উত্থানকে ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে সর্বদা স্বাগত জানানো হয়েছে।

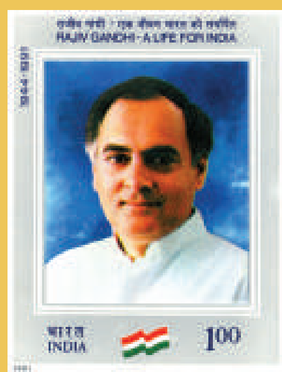

রাজীব গান্ধি (১৯৪৪-১৯৯১)

ইন্দিরা গান্ধির পুত্র; ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী; ১৯৮০ সালে ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ; পাঞ্জাব ও মিজোরামের উগ্রপন্থী বিদ্রোহীদের এবং আসামে ছাত্র আন্দোলনকারীদের সাথে শান্তিচুক্তি স্থাপন করেন। ভারতের মুক্ত অর্থনীতি ও কম্পিউটার কারিগরী ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রবর্তন করেন; শ্রীলঙ্কা সরকারের অনুরোধে সিংহলি ও তামিলদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসানকল্পে সেদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এলটিটিই সদস্যদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় তিনি নিহত হন।

গোয়ার স্বাধীনতা (Goa's liberation)

১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটলেও পর্তুগাল তাদের শাসনাধীন গোয়া, দিউ ও দমন প্রভৃতি কলোনি থেকে শাসন তুলে নিতে অস্বীকার করে। তারা যোড়শ শতক থেকে এই সকল অঞ্চলে কলোনি বিস্তার করে শাসন করে আসছে। দীর্ঘ রাজত্বকালে পর্তুগালের শাসক স্থানীয় জনগণকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, জোড়পূর্বক ধর্মান্তরীত করে এবং নানাভাবে তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত এই সকল অধীকৃত অঞ্চল থেকে শাসন তুলে নেওয়ার জন্য পর্তুগিজ সরকারকে অত্যন্ত ধর্য্যের সাথে আবেদন জানাতে থাকে। এছাড়া সেসময় গোয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়, মহারাষ্ট্রের সমাজবাদী সত্যাগ্রহীদের সমর্থনে এই আন্দোলন আরও বেশি সক্রিয় ও তীব্র হয়ে উঠে। অবশেষে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের প্রেরিত সেনাবাহিনী মাত্র দুই দিনের যুদ্ধে গোয়াকে বিদেশি মুক্ত করতে সমর্থ হয়। গোয়া, দমন ও দিউ ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়।

কিছুদিনের মধ্যে আরও একটি নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। গোয়ায় যেহেতু মারাঠী জনগণের সংখ্যা বেশি তাই গোয়াকে মহারাষ্ট্রের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যদিও বেশিরভাগ গোয়ানিজ বিশেষ করে কঙ্কনী ভাষী জনগণ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি বজায় রাখার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। তারা ইউনাটেড গোয়ান পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করে। একদিকে মহারাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত হওয়ার দাবি অন্যদিকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম— এই দুই গোষ্ঠীর ভিন্ন দাবির প্রেক্ষিতে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৭ সালে একটি গণভোটের আয়োজন করে। গণভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোয়াবাসী মহারাষ্ট্র থেকে গোয়ার পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে মত প্রদান করে। গোয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবেই থেকে যায়। পরবর্তীকালে ১৯৮৭ সালে গোয়া পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

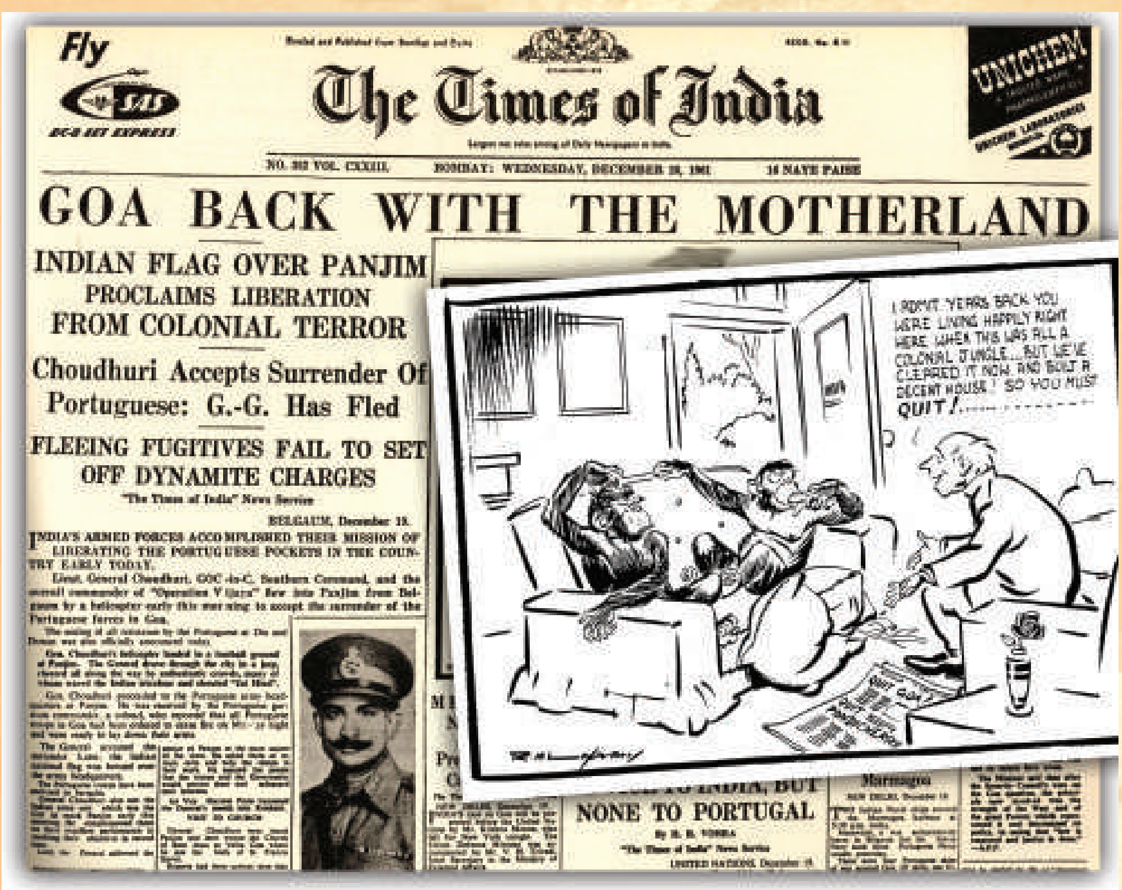
The Times of India

BOMBAY: WEDNESDAY, DECEMBER 20, 1961

GOA BACK WITH THE MOTHERLAND

INDIAN FLAG OVER PANJIM

PROCLAIMS LIBERATION FROM COLONIAL TERROR

Choudhuri Accepts Surrender Of Portuguese: G.-G. Has Fled

FLEEING FUGITIVES FAIL TO SET OFF DYNAMITE CHARGES

NONE TO PORTUGAL

Credit: R.K. Laxman in The Times of India, 21 April 1954

অনুশীলনী

1. ‘ক’ তালিকাভুক্ত নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ‘খ’ তালিকাভুক্ত দলগুলোর সাথে মিলাও।

ক	খ
আঞ্চলিক দাবিসমূহের প্রকৃতি	**রাজ্য**
(a) সামাজিক ও ধর্মীয় পরিচিতির নিরিখে পৃথক রাজ্যের দাবি	i. নাগাল্যান্ড / মিজোরাম
(b) ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে কেন্দ্রের সাথে মনোমানিল্য	ii. ঝাড়খণ্ড/ছত্রিশগড়
(c) আঞ্চলিক বৈষম্য ও বঞ্চনার প্রেক্ষিতে পৃথক রাজ্যের দাবি	iii. পাঞ্জাব
(d) উপজাতি স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন	iv. তামিলনাড়ু

2. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বতন্ত্র দাবিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আরও বেশি স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন। বিভিন্ন রঙে অঙ্কিত এই অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করে এগুলো কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য– তা উল্লেখ করো।

3. পাঞ্জাব চুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তগুলো কী কী? পাঞ্জাব ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মধ্যে এই শর্তগুলো পুনরায় কীভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে?

4. আনন্দপুর সাহিব সন্ধি চুক্তি কেন এত বেশি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল?

5. জম্মু ও কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ বিভাজনগুলো উল্লেখ করো এবং এই বিভাজন থেকে কীভাবে বহুমুখী আঞ্চলিক বা স্থানীয় দাবি উত্থাপন হতে পারে– তা ব্যাখ্যা করো।

6. কাশ্মীরের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? এদের মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যকে তুমি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করো। তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

7. ‘আসম আন্দোলন ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিফলন’— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

8. ‘সকল আঞ্চলিক আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসাবে চিহ্নিত করা যুক্তিসঙ্গত নয়।’ এই অধ্যায়ে পরিবেশিত ঘটনার উদাহরণ উল্লেখ করে উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

9. ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে উত্থাপিত ভিন্ন আঞ্চলিক দাবি ‘বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের’ নীতিকে প্রমাণিত করে। এই বক্তব্যের সাথে তুমি কি সহমত পোষণ করো? যুক্তি দাও।

10. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাজারিকার একটি বিখ্যাত গান ..... একতাবদ্ধভাবে বাস করা; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য যেন একই মায়ের গর্ভে সাতবোন..., মেঘালয় তার নিজের পথে চলে গেছে। ‘অরুণাচল নিজেকে পৃথক করে রেখেছে এবং মিজোরাম আসমের প্রবেশদ্বারে বরমালা নিয়ে অপেক্ষা

অনুশীলনী

করছে অন্য কোনো কন্যাকে বিয়ে করার জন্য।' ... ... গানের শেষে অহমিয়াদের সাথে এ অঞ্চলের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর পুনর্মিলনের গভীর প্রত্যাশার কথা বলা হয়েছে— 'কার্বি জনগোষ্ঠী এবং হারিয়ে যাওয়া ভাই-বোনেরা আমাদের অতি প্রিয় আপনজন।' — **সঞ্জীব বড়ুয়া**

(a) কবি এখানে কোন্ ঐক্যের কথা উল্লেখ করেছেন?

(b) বৃহৎ আসম রাজ্যেকে ভেঙে কেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পৃথকভাবে অনেকগুলো রাজ্য গঠন করতে হয়েছে।

(c) তুমি কি মনে করো একতার এই ধারণা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য কেন?

উনবিংশ শতকের নব্বুইয়ের দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উত্থান-পতনের ঘটনাবলি 1990 সালে অঙ্কিত এই কার্টুনে বর্ণিত উঁচু চক্রীতে (roller coaster) আরোহণ অবরোহণের মতই দেখা যায়। এই উঁচু চক্রীতে আরোহণকারীরা হলেন রাজীব গান্ধী, ভি পি সিং, এল কে আদবানি, চন্দ্রশেখর, জ্যোতি বসু, এন টি রামারাও, দেবীলাল, পি কে মহান্ত এবং কে করুণানিধি।

এই অধ্যায়ে (In this chapter)…

শেষের এই অধ্যায়ে আমরা বিগত দুই দশকের ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত রাজনীতির অপ্রত্যাশিত ফলাফলের কারণে এই পর্বের ঘটনাবলি জটিল আকার ধারণ করেছে। রাজনীতির এই নতুন পর্ব সম্পর্কে পূর্বানুমান করা যেমন কঠিন, তেমনি তা অনুধাবন করা আরো বেশি কঠিন। এই পর্বের ঘটনাবলির সাথে গভীর বিবাদ-বিসম্বাদের ধারণা জড়িত থাকায় তা বিতর্কিত হয়েছে এবং ঘটনাবলির সন্নিকটে পৌঁছুতে পারলেও আমরা তার স্বরূপ উৎঘাটনে ব্যর্থ। তথাপি আমরা এই পর্বের রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে কয়েকটি মূল প্রশ্ন তুলে ধরতে পারি।

- আমাদের গণতন্ত্রে জোটবদ্ধ রাজনীতির উত্থানের তাৎপর্যসমূহ কী কী?
- 'মণ্ডলীকরণ' (Mandalisation) কী? ইহা কি উপায়ে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রকৃতির পরিবর্তন করবে?
- রাজনৈতিক প্রবাহমানতার দিক থেকে রাম জন্মভূমি আন্দোলন এবং অযোধ্যা ধ্বংসের পরম্পরা কী ছিল?
- ঐক্যমতের ভিত্তিতে গড়ে উঠা নতুন নীতিমালা রাজনৈতিক বিকল্প নির্বাচনের চরিত্র পরিবর্তনে কী কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

অধ্যায়টি এইসকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে না। বইটি পড়ার সময় অধ্যায়টি শুধুমাত্র তোমাকে কতকগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য এবং কৌশল প্রদান করবে যাতে তুমি এই সকল প্রশ্নাবলি উত্থাপন করতে পার এবং সেগুলোর উত্তর প্রদান করতে পার। এই সমস্ত প্রশ্নাবলি রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল বলেই কেবল সেগুলোর উত্থাপন থেকে আমরা বিরত হতে পারি না; স্বাধীনতার সময় থেকে ভারতীয় রাজনীতির সর্বাত্মক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বর্তমান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্যই তা প্রয়োজন।

অধ্যায় 9

ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রতিক ঘটনাবলি
(Recent Developments in Indian Politics)

১৯৯০ এর দশকের প্রেক্ষিত
(Context of the 1990s)

শেষের অধ্যায়ে তুমি পড়েছ যে ইন্দিরা গান্ধির হত্যার পর রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। 1984 সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজীব গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়। আশির দশকের শেষের দিকে দেশে পাঁচটি পরিবর্তন দেখা যায় যা আমাদের রাজনীতিতে এক দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন নিয়ে আসে।

প্রথমত, এই পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল 1989 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দলের পরাজয়। 1984 সালের নির্বাচনে যে দল 415টি আসনে জয়ী হয়েছিল, এই নির্বাচনে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র 197টি আসনে। কংগ্রেস দল তার শক্তি বৃদ্ধি করে 1991 সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু 1989 সালের নির্বাচন রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের আখ্যায়িত 'কংগ্রেসি ব্যবস্থার' (Congress System) যবনিকাপাত ঘটায়। নিশ্চিত করে বলা যায়, কংগ্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ দল হিসাবে বিরাজমান ছিল এবং 1989 সালের পরেও অন্য যে কোনও দলের চেয়ে বেশি সময় ধরে দেশ শাসন করে। কিন্তু দলীয় ব্যবস্থায় কংগ্রেস দল পূর্বে উপভোগ করা আধিপত্য হারিয়ে ফেলে।

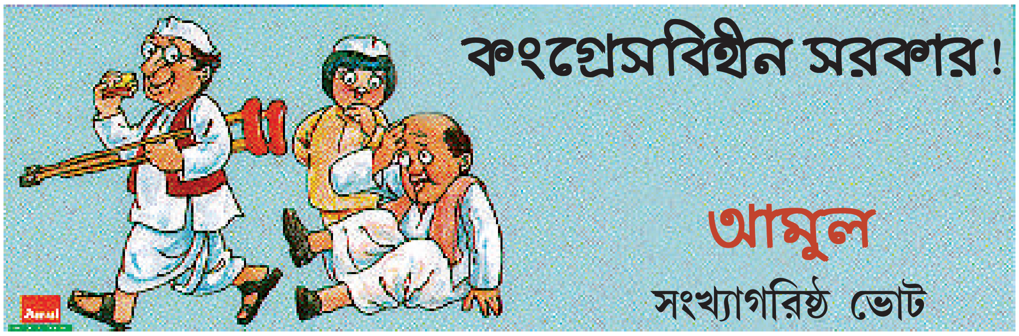

দেবগৌড়ার সংযুক্ত মোর্চা সরকার (ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট) থেকে কংগ্রেস নেতা সিতারাম কেশরীর সমর্থন প্রত্যাহার।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল জাতীয় রাজনীতিতে 'মণ্ডল ইস্যু' এর ('Mandal issue') উত্থান। 1990 সালে নতুন জাতীয় মোর্চা (ন্যাশনাল ফ্রন্ট) সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির জন্য সংরক্ষণকল্পে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ঘটনা দেশের বিভিন্ন অংশে সহিংস 'মণ্ডল বিরোধী' প্রতিরোধের সৃষ্টি করে। ও.বি.সি. সংরক্ষণের পক্ষে সমর্থনকারী এবং বিরোধীদের মধ্যেকার এই বিবাদ 'মণ্ডল ইস্যু' ('Mandal issue') নামে পরিচিত এবং তা 1989 সাল থেকে রাজনীতির পরিশীলিতকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

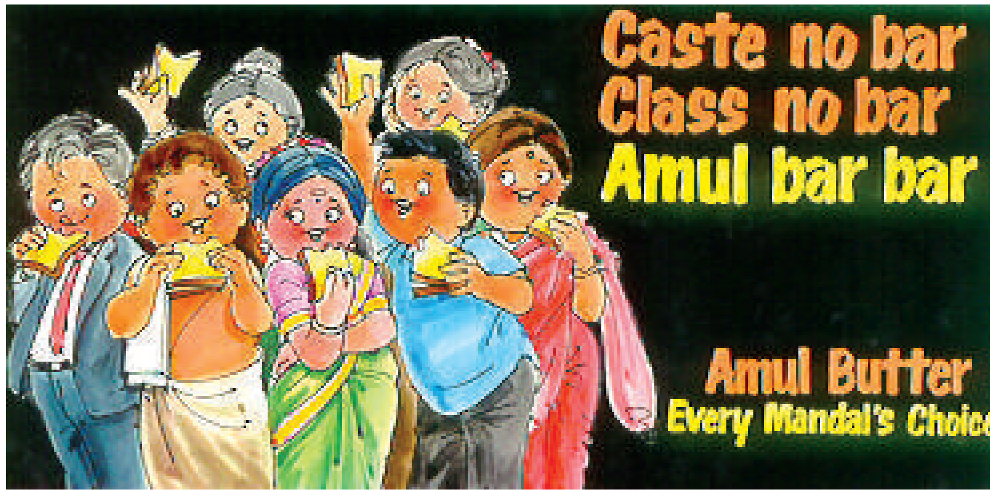

মণ্ডলীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

তৃতীয়ত, বিভিন্ন সরকার কর্তৃক অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির আমূল পরিবর্তন এক বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটা 'কাঠামোগত অভিযোজনমূলক কর্মসূচি' (Structural adjustment programme) বা 'নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার' নামে পরিচিত। রাজীব গান্ধি কর্তৃক শুরু হওয়া এইসকল পরিবর্তনসমূহ প্রথমে স্পষ্ট হয় 1991 সালে এবং স্বাধীনতার সময়কাল থেকে চলে আসা ভারতীয় অর্থনীতির গতিপথের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। এই সকল নীতি বিভিন্ন আন্দোলন এবং সংগঠন কর্তৃক বহুলভাবে সমালোচিত হয়। তা সত্ত্বেও এই সময়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিভিন্ন সরকার এই নীতিসমূহের অনুসরণ অব্যাহত রাখে।

Credit: R. K. Laxman in the Times of India

'নতুন অর্থনৈতিক নীতির (New economic policy) প্রারম্ভিক স্তরে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এর সাথে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং

চতুর্থত, 1992 সালের ডিসেম্বর মাসে অযোধ্যায় (বাবরি মসজিদ) বিবাদমান কাঠামোর ভাঙ্গন বহুবিধ ঘটনার জন্ম দিয়েছিল। এই ঘটনা দেশের রাজনীতিতে পরিবর্তন ডেকে আনে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিতর্কের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এই সকল পরিবর্তন বি.জে.পির উত্থান এবং ‘হিন্দুত্ববাদ’ এর রাজনীতির সাথে জড়িত।

সাম্প্রদায়িকতার উত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

সবশেষে, 1991 সালের যে মাসে রাজীব গান্ধীর হত্যা কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন সূচিত করে। তামিলনাড়ুতে নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন সময়ে তিনি এল.টি.টি.ই এর সাথে জড়িত এক সিংহলি তামিল কর্তৃক নিহত হন। 1991 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস একক বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর দল নরসীমা রাওকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করে।

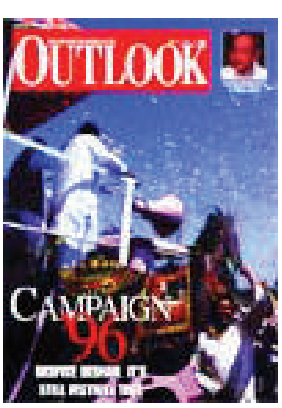

1 মে 1996

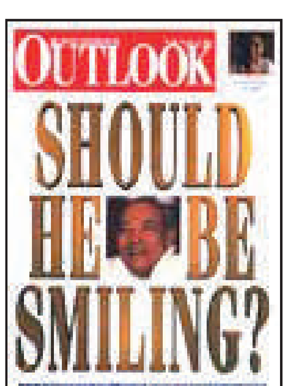

25 অক্টোবর 1995

20 আগস্ট 2001

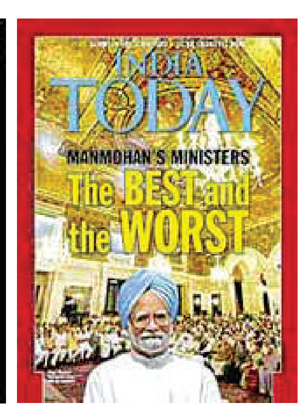

25 অক্টোবর 2004

কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন শিরোনাম

জোটবদ্ধতার যুগ (Era of Coalitions)

1989 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দলের পরাজয় ঘটলেও অন্য কোনও দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। লোকসভাতে কংগ্রেস বৃহত্তম দল হিসাবে অবস্থান করলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। তাই দল বিরোধী আসনে বসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাতীয় মোর্চা (ন্যাশানাল ফ্রন্ট, জনতা দল এবং অন্যান্য কয়েকটি আঞ্চলিক দলের জোট) দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী বি.জে.পি এবং বাম মোর্চার সমর্থন লাভ করে। এর ভিত্তিতে জাতীয় মোর্চা (ন্যাশনাল ফ্রন্ট) একটি জোট সরকার গঠন করে। কিন্তু বি.জে.পি এবং বাম মোর্চা এই সরকারে যোগদান করেনি।

Credit: Sudhir Tailang/HT Book of Cartoons

ভি.পি. সিং এর নেতৃত্বাধীন জাতীয় মোর্চা সরকার (ন্যাশানাল ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট) বাম (জ্যোতি বসুর প্রতিনিধিত্বে) এবং বি.জে.পির (এল.কে আদবানির প্রতিনিধিত্বে) সমর্থন লাভ করে।

কংগ্রেসের পতন (Decline of Congress)

কংগ্রেস দলের পরাজয় ভারতীয় দল ব্যবস্থায় কংগ্রেসি আধিপত্যের অবসান ঘটায়। পঞ্চম অধ্যায়ে কংগ্রেসি ব্যবস্থার (Congress System) পুনরুত্থানের আলোচনা কি তুমি মনে রেখেছো? গত ষাটের দশকে কংগ্রেস দলের আধিপত্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস রাজনীতিতে তার পূর্বতন আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। নব্বুইয়ের দশকেও কংগ্রেসের আধিপত্য বিস্তারকারী অবস্থান অন্য আরেকটি দিক থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। যাই হোক, এর অর্থ এই নয় যে অন্য কোনও একক দলের আবির্ভাব এই শূন্যতা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

এইভাবেই বহুদলীয় ব্যবস্থার যুগের সূচনা হয়। নিশ্চিত করে বলা যায় যে আমাদের দেশের নির্বাচনে সবসময়ই বেশি মাত্রায় রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে। আমাদের পার্লামেন্টে সবসময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল। 1989 সালের পর দেখা গিয়েছিল যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এমন আবির্ভাব ঘটেছিল যেখানে একটি বা দুটি দল বেশিরভাগ ভোট বা আসন লাভ করতে পারেনি। অন্যভাবে বলা যায় যে 1989 সাল থেকে 2014 সাল পর্যন্ত কোনও একক দলই লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে পারেনি। এই অবস্থা কেন্দ্রে জোটবদ্ধ রাজনীতির যুগের সূচনা করে, যেখানে আঞ্চলিক দলসমূহ শাসক জোট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চলো পুনরায় গবেষণা করি

উনবিংশ শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে সংগঠিত হওয়া ঘটনাবলির স্মৃতি সম্পর্কে তুমি তোমার পিতামাতার সাথে কথা বল। জিজ্ঞেস কর যে তাদের অনুভবে এই পর্বের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলি কোন্‌গুলো ছিল। একসাথে দলবদ্ধভাবে বস এবং তোমাদের পিতামাতার উল্লেখ করা ঘটনাবলীর একটি সর্বাত্মক তালিকা প্রস্তুত কর, দেখ কোন্ ঘটনাগুলো সবচেয়ে বেশি করে উল্লেখিত হয়েছে এবং এই অধ্যায়ে উল্লেখিত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলির সাথে তুলনা কর। এই ঘটনাসমূহের মধ্যে কতকগুলো ঘটনা কেন কিছু সংখ্যক লোকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদের কাছে কেনই বা গুরুত্বপূর্ণ নয়— সে সম্পর্কেও আলোচনা করতে পার।

জোটবদ্ধ রাজনীতি (Alliance politics)

নব্বুইয়ের দশকে দলিত শ্রেণি এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণির (ও.বি.সি) নেতৃত্বে শক্তিশালী দল এবং আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। এই দলসমূহের অনেকগুলো শক্তিশালী আঞ্চলিক আঙ্কার প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই দলসমূহ 1996 সালে ক্ষমতায় আসা সংযুক্ত মোর্চা সরকারে (ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জনতাদল সহ অন্যান্য আঞ্চলিক দলের উপস্থিতি থাকার জন্য সংযুক্ত মোর্চা (ইউনাইটেড ফ্রন্ট) 1989 সালের জাতীয় মোর্চার (ন্যাশানাল ফ্রন্ট) সমরূপ ছিল। এই সময় বি.জে.পি সরকারকে সমর্থন করেনি। সংযুক্ত মোর্চা সরকার কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করে। এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান যে রাজনৈতিক সমীকরণ কতটা অস্থায়ী। কংগ্রেসকে ক্ষমতার বাইরে রাখার জন্য 1989 সালে বাম এবং বি.জে.পি উভয়ই জাতীয় মোর্চা (ন্যাশানাল ফ্রন্ট)-কে সমর্থন করে। 1996 সালে অ-কংগ্রেসি সরকারের প্রতি বাম দলগুলো সমর্থন জারি রাখে। একই সময় কংগ্রেস দলও অ-কংগ্রেসি সরকারের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। কারণ কংগ্রেস এবং বাম উভয়ই বি.জে.পিকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে চেয়েছিল।

কিন্তু, 1991 সাল এবং 1996 সালের নির্বাচনে বি.জে.পি তার অবস্থান শক্ত করলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। 1996 সালের নির্বাচনে বি.জে.পি বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু বেশিরভাগ দল তার নীতির বিরোধিতা করায় বি.জে.পি সরকার লোকসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। সবশেষে, বি.জে.পি 1998 সালের মে মাস থেকে 1999 সালের

জুন মাস পর্যন্ত জোট সরকার গঠন করে ক্ষমতায় আসে এবং 1999 সালের অক্টোবরে পুনঃনির্বাচিত হয়। দুইবারের এন.ডি.এ (NDA) সরকারের সময়ই অটল বিহারী রাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং 1999 সালে তাঁর সরকার পূর্ণ মেয়াদ পূরণ করে।

Credit: Ajit Ninan/India Today

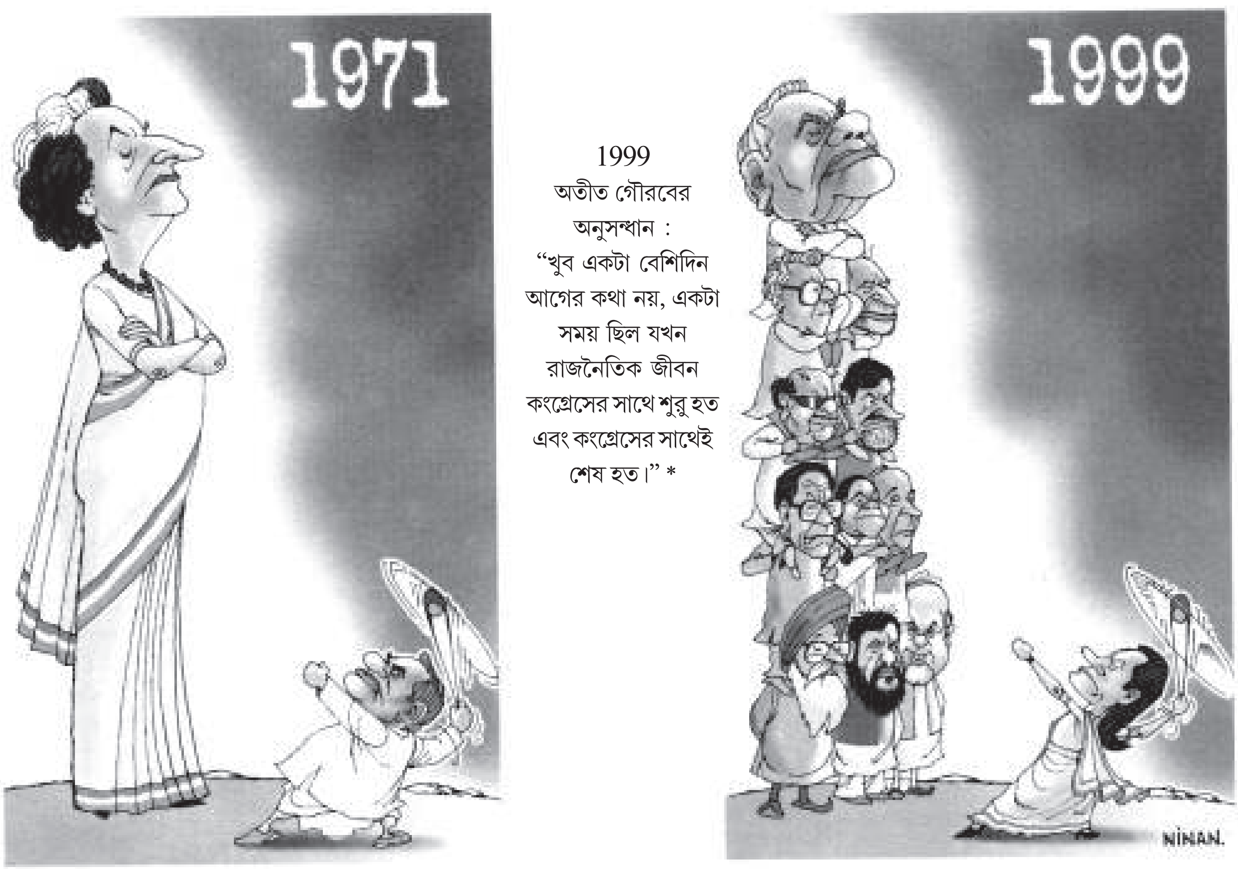

1999
অতীত গৌরবের অনুসন্ধান : "খুব একটা বেশিদিন আগের কথা নয়, একটা সময় ছিল যখন রাজনৈতিক জীবন কংগ্রেসের সাথে শুরু হত এবং কংগ্রেসের সাথেই শেষ হত।" *

একজন কার্টুন শিল্পীর চিত্রে একক পার্টির একাধিপত্য থেকে বহুদলীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তন।

এইভাবেই 1989 সালের নির্বাচনের সাথে সাথে ভারতীয় রাজনীতিতে জোটবদ্ধ রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে। তখন থেকে কেন্দ্রে এগারবার জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। এদের প্রত্যেকটিই ছিল জোট সরকার বা অন্যান্য দলের সমর্থনে গঠিত সংখ্যালঘু সরকার। এই নতুন পর্যায়ে শুধুমাত্র বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের অংশগ্রহণ বা সমর্থনে কোনও সরকার গঠন করা যেত। এই প্রবণতা 1989 সালের জাতীয় মোর্চা (ন্যাশনাল ফ্রন্ট), 1996 সাল এবং 1997 সালের সংযুক্ত মোর্চা (ইউনাইটেড ফ্রন্ট), 1997 সালের এন.ডি.এ, 1998 সালের বি.জে.পি নেতৃত্বাধীন জোট, 1999 সালের এন.ডি.এ., 2004 সাল এবং 2009 সালের ইউ.পি.এ সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। যাই হোক, 2014 সালে এই প্রবণতার অবসান ঘটে।

চলো, আমরা এখন পর্যন্ত যা জেনেছি তার সাথে এই ঘটনাবলির যোগসূত্র স্থাপন করি। জোটবদ্ধ রাজনীতিকে বিগত কয়েক দশকের নীরব পরিবর্তনের দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে পূর্বে কংগ্রেস দল নিজেই ছিল বহুমুখী স্বার্থ, আলাদা আলাদা সামাজিক বিন্যাস এবং গোষ্ঠীর একটি 'জোট' (Coalition) এটাই 'কংগ্রেসি ব্যবস্থার' (Congress System) জন্ম দেয়।

1989 সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারসমূহ

ভি. পি. সিং

চন্দ্রশেখর

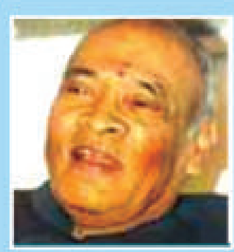

পি. ভি. নরসীমা রাও

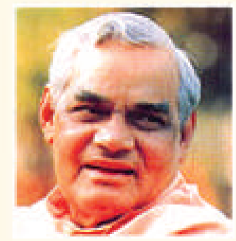

এ. বি. বাজপেয়ী

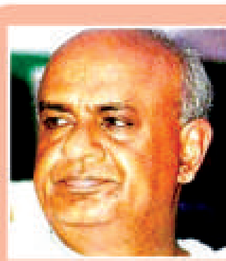

এইচ. ডি. দেবে গৌড়া

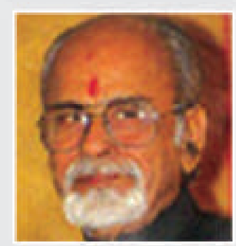

আই. কে. গুজরাল

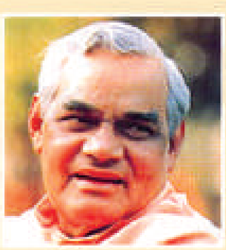

এইচ. ডি. দেবে গৌড়া

মনমোহন সিং

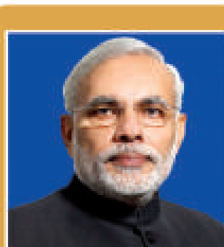

নরেন্দ্র মোদী

সময়কাল	সরকারে জোট/দল সমূহ
ডিসেম্বর 1989 নভেম্বর 1990	জাতীয় মোর্চা (এন.এফ) বি.জে.পি এবং বাম মোর্চার সমর্থিত
নভেম্বর 1990 জুন 1991	সমাজবাদী জনতা দলের নেতৃত্বে, কংগ্রেসের সমর্থনে জাতীয় মোর্চার অংশ বিশেষ
জুন 1991 মে 1996	এ.আই.এ.ডি.এম.কে এবং অন্যান্য ছোট আঞ্চলিক দলের সমর্থনে কংগ্রেস দল
মে 1996 জুন 1996	বি.জে.পি সংখ্যালঘু সরকার
জুন 1996 এপ্রিল 1997	কংগ্রেসের সমর্থনে সংযুক্ত মোর্চা
এপ্রিল 1997 মার্চ 1998	কংগ্রেসের সমর্থনে সংযুক্ত মোর্চা
মার্চ 1998 অক্টোবর 1999 মে 2004	বি.জে.পির নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা
মে 2004 মে 2014	কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংযুক্ত প্রগতিশিল মোর্চা
মে 2014 থেকে	বি.জে.পির নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা

সাম্প্রতিক এবং পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য দেখ; http://pmindia.gov.in/en

Note : সরকারের মূল নীতি, সম্পাদিত কার্যাবলি এবং বিবাদমান বিষয়াবলি সম্পর্কে অধিকতর তথ্যাবলি সংগ্রহ করতে তোমার জন্য খালি জায়গা রাখা হয়েছে।

আমরা পঞ্চম অধ্যায়েও দেখেছি যে, বিশেষত ঊনবিংশ শতকের ষাটের দশকে বিভিন্ন শ্রেণি কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করছে এবং তারা নিজেরাই পৃথক রাজনৈতিক দল গড়ে তুলেছে। 1977 সালের পর আমরা বহু আঞ্চলিক দলের উত্থান লক্ষ্য করেছি। এই সমস্ত ঘটনাবলি কংগ্রেস দলকে দুর্বল করলেও অন্য কোনও একক দলকে কংগ্রেসকে উৎখাতের জন্য সক্ষম করে তোলেনি।

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির রাজনৈতিক উত্থান (Political Rise of Other Backward Classes)

এই পর্বের একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ছিল রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির উত্থান। তুমি ইতোমধ্যেই 'ও.বি.সি' শব্দের অর্থ জেনেছো। এই প্রশাসনিক শ্রেণি বিভাজন 'অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণি'-কেই বোঝায়। এস.সি এবং এস.টি বাদে শিক্ষাগত এবং সামাজিক পশ্চাদপদতায় জর্জরিত অন্যান্য সম্প্রদায়ই হল এইসকল সম্প্রদায়। তাদেরকে পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণি হিসাবেও অভিহিত করা হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে 'পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণি' সমূহের ব্যাপক অংশের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থনের অবসান ঘটেছিল। এই অবস্থা অ-কংগ্রেসি দলগুলোকে এইসকল সম্প্রদায়সমূহের সমর্থন আদায়ের সুযোগ করে দেয়। তুমি মনে করতে পারবে যে 1977 সালের জনতা দলের সরকারের মধ্যে দিয়েই জাতীয় স্তরে এই সমস্ত দলের প্রথম রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছিল। ভারতীয় ক্রান্তি দল এবং সংযুক্ত সমাজতান্ত্রিক দলের মতো জনতা দল গঠনকারী অনেক দলেরই শক্তিশালী ভিত ছিল অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির কিছু অংশের সমর্থন।

'মণ্ডল' বাস্তবায়ন ('Mandal' implemented)

ঊনবিংশ শতকের আশির দশকে জনতা দল ও.বি.সি সম্প্রদায়ের জোরালো সমর্থনের ভিত্তিতে সমরাজনীতিক আদর্শযুক্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠী গঠনে তৎপর হয়েছিল। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় মোর্চা (ন্যাশানাল ফ্রন্ট) সরকারের সিদ্ধান্ত 'অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির' রাজনীতি পরিশীলিতকরণে সহায়ক

হয়েছিল। চাকুরিতে সংরক্ষণের পক্ষে এবং বিপক্ষে জাতীয় বিতর্ক ও.বি.সি সম্প্রদায়কে তাদের স্বার্থ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করে তুলে। ও.বি.সি সম্প্রদায়কে যারা রাজনীতিতে টেনে আনতে চেয়েছিলেন এই ঘটনা তাদের খুবই সহায়ক হয়েছিল। শিক্ষা এবং চাকুরিতে ও.বি.সি সম্প্রদায়কে অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এই পর্যায়ে বহু দলের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং পাশাপাশি তারা ও.বি.সি সম্প্রদায়কে ক্ষমতার শরিক করার দাবিও উত্থাপন করেছিল। এই দলসমূহ দাবি করেছিল যে ভারতীয় সমাজের একটি বড় অংশই যেহেতু ও.বি.সি সম্প্রদায়, প্রশাসনে তাদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন এবং রাজনীতিতে তাদের যথাযত অংশীদরিত্ব থাকা প্রয়োজন।

মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের বাস্তবায়নের প্রতিবাদে ধর্ণা এবং রাজনৈতিক চাপান-উতোর

মণ্ডল কমিশন

ঊনবিংশ শতকের ষাটের দশক থেকেই দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ও.বি.সি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে এই নীতির সংস্থান ছিল না। 1977-79 সালে জনতা দলের সরকারের আমলে উত্তর ভারতের পাশাপাশি জাতীয় স্তরেও পশ্চাদপদ শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের পক্ষে জোরালো দাবি উত্থাপিত হয়। এই ক্ষেত্রে অগ্রদূত ছিলেন বিহারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী করপুরী ঠাকুর। তার সরকার বিহারে ও.বি.সি সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের জন্য এক নতুন নীতি চালু করে। এটা অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় সরকার 1978 সালে পশ্চাদপদ শ্রেণির অবস্থার অনুসন্ধান এবং উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশকল্পে একটি কমিশন গঠন করে। স্বাধীনতার সময় থেকে দ্বিতীয়বার সরকার এমন একটি কমিশন গঠন করে। তাই এই কমিশন 'দ্বিতীয় পশ্চাদপদ শ্রেণির কমিশন নামে পরিচিত। সভাপতি বিন্দেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডলের নামানুসারে এই কমিশন 'মণ্ডল কমিশন' নামেই বহুল পরিচিত।

বি.পি. মণ্ডল (1918-1982) : 1967-1970 এবং 1977-1979 সালে লোকসভার সদস্য; অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সুপারিশকারী 'দ্বিতীয় পশ্চাদপদ শ্রেণির কমিশনের' চেয়ারম্যান; বিহারের একজন সমাজতান্ত্রিক নেতা; 1968 সালে দেড় মাসের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী; 1977 সালে জনতা দলে যোগদান।

ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষাগত এবং সামাজিক পশ্চাদপদতার মাত্রা তদন্ত করা এবং এই সমস্ত 'পশ্চাদপদ শ্রেণি' চিহ্নিতকরণের উপায় সুপারিশের জন্য মণ্ডল কমিশন গঠিত হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল যে এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তাদের পশ্চাদগামীতা দূর হবে। এই কমিশন 1980 সালে তার সুপারিশ প্রদান করে। তখন জনতা সরকারের পতন হয়েছিল। কমিশন সুপারিশ করে যে 'পশ্চাদপদ শ্রেণিসমূহ'-কে পশ্চাদপদ বর্ণের নিরীক্ষে বুঝতে হবে, যেমনভাবে তপশিলী জাতি ছাড়া অন্যান্য বর্ণসমূহকেও বর্ণের ক্রমোচ্চ বিভাজনে নিম্নস্থানে পরিগণিত করা হয়। কমিশন সমীক্ষার নিরীক্ষে দেখেছিল যে এইসব পশ্চাদপদ শ্রেণির লোকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি চাকুরিতে অংশগ্রহণের হার খুবই কম। তাই কমিশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি চাকুরিতে এইসব শ্রেণির জন্য 27 শতাংশ আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করে। মণ্ডল কমিশন অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির জন্য ভূমি সংস্কারের মানোন্নয়নের মত আরো বহুমুখী সুপারিশ করে।

1990 সালের আগস্ট মাসে জাতীয় মোর্চা সরকার (ন্যাশনাল ফ্রন্ট) কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার অধিনস্ত সংস্থার চাকুরিতে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির জন্য সংরক্ষণকল্পে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে গণধর্ণা এবং সহিংস প্রতিরোদের সৃষ্টি করে। এই সিদ্ধান্তও সুপ্রিমকোর্টে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় এবং মামলাকারীদের মধ্যে একজনের নামানুসারে 'ইন্দিরা সাহানী মামলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। 1992 সালে সুপ্রিমকোর্ট সরকারের সিদ্ধান্তকে স্থগিত ঘোষণা করে নির্দেশ প্রদান করে। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে কিছু মতভেদ ছিল। কিন্তু, এখন ও.বি.সি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের নীতি দেশের সকল বড় রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভ করেছে।

রাজনৈতিক কলহ (Political fallouts)

ঊনবিংশ শতকের আশির দশকে দলিত শ্রেণির রাজনৈতিক সংগঠনের উত্থান ঘটেছিল। 1978 সালে পশ্চাদপদ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মচারী সংগঠন (বেকওয়ার্ড এন্ড মাইনরিটি কমিউনিটিস এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, BAMCEF) গঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনটি সরকারি কর্মচারীদের শুধুমাত্র একটি সাধারণ পেশাগত সংগঠনই ছিল না, ইহা বহুজন— এস.সি, এস.টি, ও.বি.সি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একটি জোরালো পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। এর মধ্য থেকেই পরে 'দলিত শোষিত সমাজ সংঘর্ষ সমিতি' এবং পরে কাশীরামের নেতৃত্বে বহুজন সমাজ পার্টির (বি.এস.পি) আবির্ভাব ঘটেছিল। পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশে মূলত দলিত ভোটারের সমর্থনের ভিত্তিতে একটি ছোট দল হিসাবেই বি.এস.পি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 1989 সাল এবং 1991 সালের নির্বাচনে এই দল উত্তর প্রদেশে জয়লাভ করে। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রথম দলিত ভোটারদের সমর্থনের ভিত্তিতে কোনো রাজনৈতিক দল সফলতা লাভ করে।

বস্তুত, কাশীরামের নেতৃত্বে বি.এস.পি প্রয়োগবাদী রাজনীতির উপর ভিত্তি করে আত্মপ্রকাশ করে। বহুজন (এস.সি.এস.টি, ও.বি.সি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের) সংখ্যাধিক্যতা এবং তাদের সদস্যদের মধ্যে ইতিবাচক রাজনৈতিক দৃঢ়তাজনিত মনোবলই ছিল বি.এস.পির শক্তির মূল উৎস। তখন থেকে বিস.এস.পি রাজ্যে একটি বড় 'রাজনৈতিক খেলোয়াড়' (Political Player) হিসাবে গড়ে উঠে এবং সরকারে একাধিকবার ক্ষমতাসীন হয়। এখনও বি.এস.পির জোড়ালো সমর্থনের ভিত্তি দলিত ভোটার, কিন্তু এখন তার সমর্থনের ভিত্তি অন্যান্য সামাজিক শ্রেণিসমূহের মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অংশে দলিত রাজনীতি এবং ও.বি.সি. স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়েছে এবং প্রায়শই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

কাশী রাম (1934-2006) : বহুজন ক্ষমতায়নের উদ্যোক্তা এবং বহুজন সমাজ পার্টির (বি.এস.পি) প্রতিষ্ঠাতা; সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি ত্যাগ; বি.এ.এম.সি.ই.এফ (BAMCEF), ডি.এস-চার (DS-4) এবং সবশেষে 1984 সালে বি.এস.পির প্রতিষ্ঠাতা; সুদক্ষ রাজনৈতিক কৌশলবিদ্, তিনি সামাজিক ক্ষমতা আনয়নের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতাকে মূল চাবিকাঠি হিসাবে বিবেচনা করেছেন; উত্তর ভারতীয় রাজ্যসমূহে দলিত পুনরুজ্জীবনের হোতা।

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র
(Communalism, Secularism, Democracy)

এই পর্বের অন্য দীর্ঘস্থায়ী ঘটনা হল ধর্মীয় পরিচিতিমূলক রাজনীতির উত্থান, যা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র সম্পর্কে বিতর্কের জন্ম দেয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে জরুরি অবস্থার পর ভারতীয় জনসংঘ জনতা দলে মিশে যায়। জনতা দলের পতন এবং ভাঙ্গানের পর পূর্বতন জনসংঘের সমর্থকরা 1980 সালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বি.জে.পি) গঠন করে। প্রথম থেকেই জনসংঘের চেয়ে বি.জে.পি একটি ব্যাপক রাজনৈতিক ভিত্তি অনুসরণ করে। এই দল 'গান্ধিবাদী সমাজবাদ' (Gandhian Socialism)-কে তার মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু 1980 এবং 1984 সারে নির্বাচনে এই দল খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। 1986 সালের পর এই দল হিন্দু জাতীয়তাবাদকে তার মতাদর্শ হিসাবে গুরুত্ব আরোপ করে। বি.জে.পি 'হিন্দুত্ব' (Hindutva) কে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে হিন্দুদের সচেতন করার কৌশল অনুসরণ করে।

আক্ষরিক অর্থে 'হিন্দুত্ব' (Hindutva) মানে 'হিন্দুবোধ' (Hinduness) এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে ভি.পি সাভারকার (তাঁর ধর্ম হিন্দু অনুসারে) কর্তৃক তা উদ্ভাবিত হয়েছিল। এর মূল অর্থ হচ্ছে ভারতীয় জাতির সদস্য হিসাবে ভারতকে সকলে শুধুমাত্র তাদের 'পৈতৃকভূমি' হিসাবেই গ্রহণ করবে না, বরং তাদের পূণ্যভূমি হিসাবেও গ্রহণ করবে। 'হিন্দুত্ববাদে' বিশ্ববাসীরা যুক্তি দেখান যে শুধুমাত্র শক্তিশালী এবং অখণ্ড জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতেই শক্তিশালী জাতি গড়ে তোলা যায়। তারা আরো বিশ্বাস করেন যে ভারতে একমাত্র হিন্দু সংস্কৃতিই এই ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

'হিন্দুত্ববাদী' দল হিসাবে 1986 সাল নাগাদ বি.জে.পির রাজনীতির দুটি কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল। প্রথমটি ছিল 1985 সালের শাহ বানু মামলা। এই মামলায় একজন 62 বছরের ডিভোর্সি বৃদ্ধা মুসলিম মহিলা তার পূর্বতন স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণের মামলা দায়ের করে। সুপ্রিমকোর্ট তার পক্ষে রায় দান করে। গোড়া মুসলিমরা সুপ্রীমকোর্টের এই আদেশকে 'মুসলিম পারসনাল ল' (Muslim Personal Low) এ হস্তক্ষেপ হিসাবে দেখেছিল। কতিপয় মুসলিম নেতার দাবির ভিত্তিতে সরকার 'মুসলিম উইমেন অ্যাক্ট' (প্রটেকশান অব্ রাইটস অন ডিভোর্স) অ্যাক্ট, 1986 পাস করে যা সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বাতিল বলে ঘোষণা করে। সরকারের এই কাজকে অনেক মহিলা সংগঠন, বহু মুসলমান দল এবং বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী মহল বিরোধিতা করে। বি.জে.পি কংগ্রেস সরকারের এই কাজকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি 'অপ্রয়োজনীয় ছাড়' (Unnecessary Concession) এবং 'তোষণ' (appasement) হিসাবে সমালোচনা করে।

অযোধ্যা বিবাদ (Ayodhya dispute)

দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল 1986 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'ফৈজাবাদ জেলা আদালতের আদেশনামা। আদালত আদেশ দিয়েছিল যে বাবরি মসজিদের প্রাঙ্গণে হিন্দুদের বিবেচিত মন্দিরের স্থান প্রার্থনার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। অযোধ্যাতে বহু দশক ধরে বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি বিবাদ চলছিল। বাবরি মসজিদ ছিল মোঘল সম্রাট বাবরের সেনাধ্যক্ষ মির বাকী কর্তৃক নির্মিত যোড়শ শতকের একটি মসজিদ। কিছু সংখ্যক হিন্দু বিশ্বাস করেন যে ইহা ভগবান রামের জন্মভূমি হিসাবে বিশ্বাসকৃত মন্দির ভেঙে তৈরি করা হয়েছে। এই বিবাদ নিয়ে বহু দশক ধরে আদালতে মামলা চলছিল। এই মসজিদটি 1940 সাল থেকে আদালতের

বিবেচনাধীন বিষয় বলে বন্ধ ছিল।

বাবরি মসজিদের দরজা উন্মুক্ত হলে উভয়পক্ষেই তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। এই প্রশ্নে বহু হিন্দু এবং মুসলমান সংগঠন তাদের সম্প্রদায়কে তৎপর করতে চেষ্টা করে। এই আঞ্চলিক বিবাদ হঠাৎ একটি বৃহত্তর জাতীয় প্রশ্নে রূপান্তরিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বি.জে.পি এই ঘটনাকে বড় নির্বাচনী এবং রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করে। আর.এস.এস (RSS) এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP) এর মত অন্যান্য আরো বহু সংগঠনের সাথে বি.জে.পি একগুচ্ছ প্রতিকী এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে। এই বিশাল কর্মকাণ্ড এক ঘোলাটে পরিবেশের জন্ম দেয় এবং বহু সাম্প্রদায়িক হানাহানির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বি.জে.পি গণ-সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে গুজরাটের সোমনাথ থেকে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা পর্যন্ত 'রথযাত্রা' (Rathyatra) নামে এক বিশাল র‍্যালির আয়োজন করে।

ধ্বংস এবং তার পরের ঘটনা (Demolition and after)

1992 সালের ডিসেম্বরে মন্দির নির্মাণের সমর্থনকারী সংগঠনসমূহ রাম মন্দির নির্মাণের জন্য পুণ্যার্থী কর্তৃক স্বেচ্ছামূলক সেবা অর্থে 'করসেবা' (Karseva) গঠন করে। এই পরিস্থিতি সারা দেশে বিশেষত অযোধ্যাতে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সুপ্রীমকোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ প্রদান করে যে বিবাদমান স্থানকে বিপজ্জনক করা যাবে না। যাই হোক, 1992 সালের 6ই ডিসেম্বর সারা দেশ থেকে হাজার হাজার লোক অযোধ্যাতে জমায়েত হয় এবং মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেয়। এই খবর দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিবাদের জন্ম দেয়। মুম্বাইয়ের সহিংস আন্দোলন পুনরায় 1993 সালের জানুয়ারিতে দেখা যায় এবং দুই সপ্তাহ ধরে অব্যাহত থাকে।

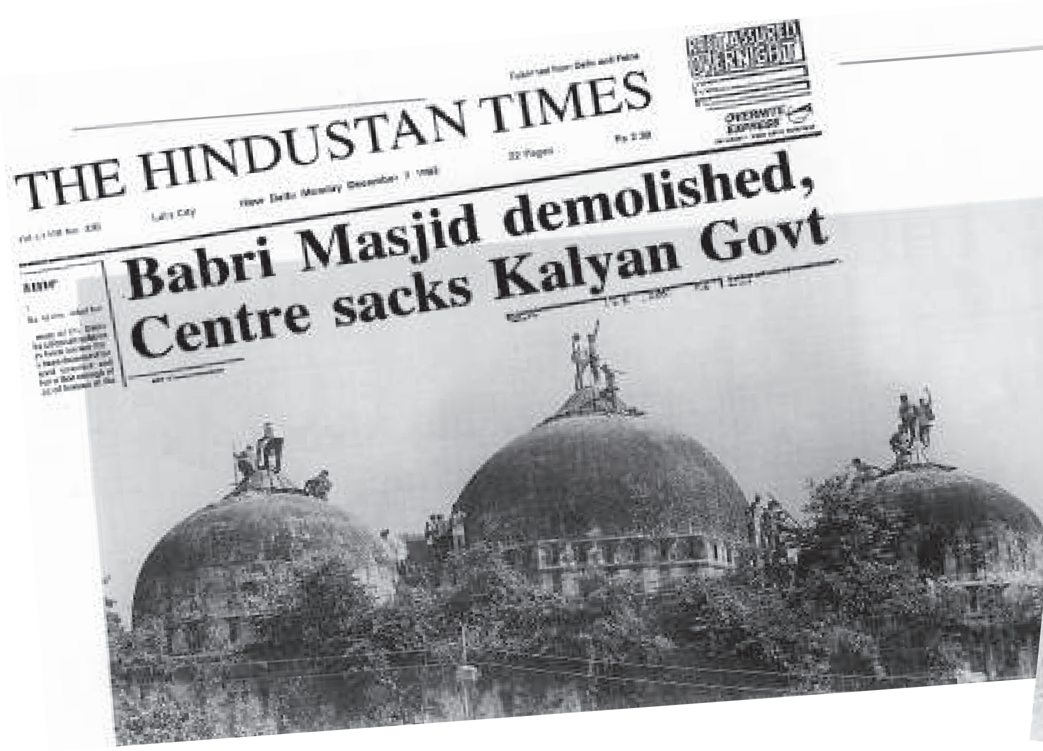
THE HINDUSTAN TIMES

Babri Masjid demolished, Centre sacks Kalyan Govt

नईदुनिया

बाबरी मस्जिद पूर्णत: ध्वस्त

मुख्यमंत्री बर्खास्त, उ.प्र. विधानसभा भंग, राष्ट्रपति शासन लागू

Ayodhya BJP's worst miscalculation: Vajpayee

Had warned Advani, but no place for moderates, laments veteran

Demolition no cause for remorse: Advani

Special Correspondent

New Delhi

doned, dilapidated structure as a mosque." According to him, the description of such a structure as a mosque was an example of the distortion of secularism.

According to Mr Advani, the pulling down of the structure was particularly unfortunate and the BJP was taken aback by it since it was not part of its scheme of things. "We are sorry for the incident since demolition was not on our agenda," Mr Advani clarified. He went on to add that he did

Violent reaction world over

DEC 7. — Muslims angry at the demolition of the Babari Masjid today attacked temples in Pakistan, Bangladesh, and England, set fire to an Indian Airlines office and damaged the Indian High Commission in Dhaka as the 50-member Organization of Islamic Countries condemned the Ayodhya incident as "shameful", reports PTI.

Six temples in Pakistan and

office and attacked the Indian High Commission, its library, temples and shops and commercial establishments owned by the Hindus.

PTI's Sujit Chatterjee said from Islamabad that Government offices and business establishments would remain closed tomorrow.

A PTI report from Islamabad said, a special meeting of the Federal Cabinet, chaired by the Prime Minister, Mr Nawaz Sharif, this morning expressed "deep anguish and grave concern" over the Ayodhya incidents and hoped that "the Government and the people of India will realize the grave implications of the unprecedented fanaticism".

Radio Pakistan said Pakistan would appeal to the UN and the OIC to exert their influence

mediately there a damages nearby The in the thou Indians UAE. They of the popu

সৌজন্য (ঘড়ির দিক অনুসারে) : দি পাইয়নিয়ার, দি পাইয়নিয়ার, দি পাইয়নিয়ার এবং দি স্টেটস্‌ম্যান।

অযোধ্যার ঘটনাসমূহ অন্যান্য বহু ঘটনার জন্ম দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার বি.জে.পি শাসিত রাজ্য সরকারকে অপসারণ করে। পাশাপাশি বি.জে.পি শাসনাধীন অন্যান্য রাজ্যসমূহকে রাষ্ট্রপতি শাসনাধীনে আনা হয়। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আদালত অবমাননার একটি মামলা দায়ের করা হয়। কারণ তিনি বিবাদমান কাঠামোকে রক্ষা করবেন বলে মুচলেকা দিয়েছিলেন। অযোধ্যা ঘটনাবলি প্রসঙ্গে বি.জে.পি অফিসিয়ালি উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় সরকার মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করে। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনাকে নিন্দা করে এবং এই ঘটনা ধর্মনিরপেক্ষ নীতির পরিপন্থী বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনা ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয় এবং ভারত বিভাজনের পর তৎক্ষণাৎ জন্ম নেওয়া একরাশ প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। ভারত কি এমন এক রাষ্ট্র হতে চলেছে যেখানে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংখ্যালঘু অংশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে? বা ভারত কি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়দের আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার এবং সমান নাগরিক অধিকারের ধারা অব্যাহত রাখবে?

এই সময় নির্বাচনী উদ্দেশ্যপূরণের জন্য ধর্মীয় অনুভূতির ব্যবহার এক বিতর্কের সৃষ্টি করে। ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনীতি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় যে কোনো দলে যোগদানের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং এখানে সম্প্রদায়ভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকবে না। 1984 সাল নাগাদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রিতির এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ বহুমুখী চ্যালেঞ্জের

সম্মুখীন হয়। আমরা অষ্টম অধ্যায়ে পড়েছি যে 1984 সালে এটা দেখা দেয় শিখ-বিরোধী দাঙ্গা রূপে। 2002 সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গুজরাটে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একই ধরনের সহিংসতা দেখা দেয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি এমন সহিংসতা এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা গণতন্ত্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

"এই কার্যক্রম 1992 সালের 6 ডিসেম্বর অযোধ্যার বিবাদমান কাঠামো 'রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ' নির্মূলীকরণের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিচ্ছবি। হাজার হাজার নিরপরাধ নাগরিকের জীবনহানি, বহুল পরিমাণে সম্পদের বিনষ্টীকরণ এবং সবচেয়ে বড় কথা ভারতে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা, বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষকারী এই মহান ভূমির প্রতিচ্ছবি আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষুণ্ণ হয়।

দুঃখের বিষয় যে রাজনৈতিক দলের একজন নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রীকে আদালত অবমাননার অপরাধে অভিযুক্ত হতে হয়। আইনের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থেই এটা করতে হয়। আদালত অবমাননার অপরাধেই আমরা তাকে অভিযুক্ত করি। যেহেতু এই আদালত অবমাননা আমাদের জাতির ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির মূলে আঘাত হননকারী বৃহত্তর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল, তাই আমরা তাকে দৃষ্টান্তকারী একদিনের কয়েদের বিধান প্রদান করি।"

জাতীয় সংহতি পরিষদের (National Intrgration Council) কাছে 'রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ' এর কাঠামো রক্ষায় উত্তর প্রদেশ সরকারের অঙ্গিকারের ব্যর্থতায় মহম্মদ আসলাম বনাম ইউনিয়ন অব্ ইন্ডিয়া (Mohd. Aslam V Union of India) মামলার রায়দানকালে সুপ্রিমকোর্টের মুখ্য বিচারপতি ভেঙ্কটাচালিহ এবং বিচারপতি জি.এন রায়ের পর্যবেক্ষণ।

গুজরাট দাঙ্গা (Gujarat riots)

2002 সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গুজরাটে ব্যাপকহারে সহিংসতা শুরু হয়। গোধরা স্টেশনে হঠাৎ সহিংস উন্মাদনা দেখা দেয়। অযোধ্যা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী করসেবক (Karsevaks) বোঝাই ট্রেনের একটি বগিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঐ আগুনে 57 জন লোক মারা যায়। বগিটিতে আগুন ধরানোর ঘটনায় মুসলিমদের হাত রয়েছে সন্দেহ করে পরের দিন গুজরাটের বিভিন্ন জায়গাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দেখা দেয়। এই সহিংসতা প্রায় একমাস ধরে চলছিল। এতে প্রায় 1100 জন বিশেষত মুসলিম মারা যায়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সহিংসতা প্রতিরোধে, ক্ষতিগ্রস্থদের স্বস্তি প্রদানে এবং সহিংসতায় জড়িত অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে গুজরাট সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করে। ভারতের নির্বাচন কমিশন বিধানসভা নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। 1984 সালের শিখ-বিরোধী দাঙ্গার মত গুজরাট দাঙ্গাও সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার কাছে সরকারি যন্ত্রের পরাভূত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল।

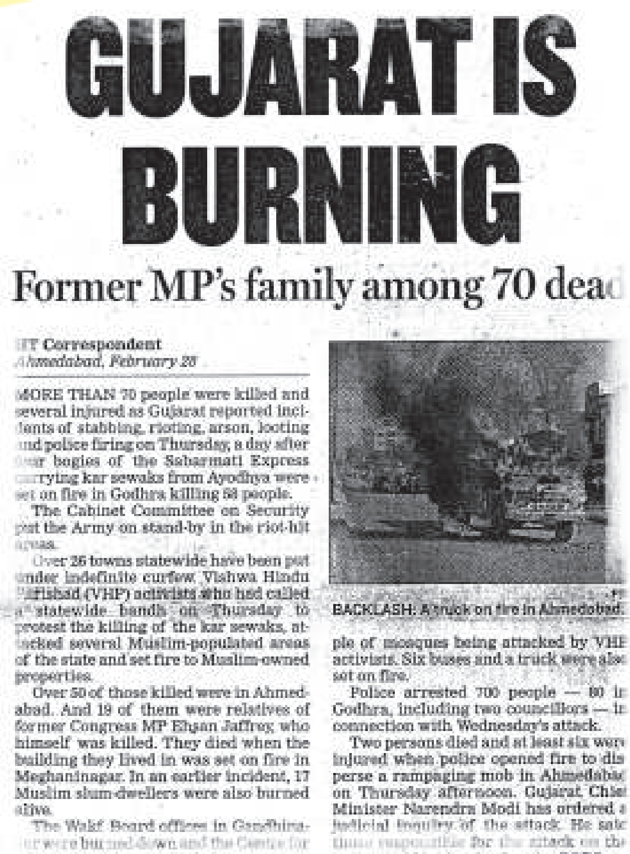

GUJARAT IS BURNING

Former MP's family among 70 dead

HT Correspondent
Ahmedabad, February 28

MORE THAN 70 people were killed and several injured as Gujarat reported incidents of stabbing, rioting, arson, looting and police firing on Thursday, a day after four bogies of the Sabarmati Express carrying kar sewaks from Ayodhya were set on fire in Godhra killing 58 people.

The Cabinet Committee on Security put the Army on stand-by in the riot-hit areas.

Over 26 towns statewide have been put under indefinite curfew. Vishwa Hindu Parishad (VHP) activists who had called a statewide bandh on Thursday to protest the killing of the kar sewaks, attacked several Muslim-populated areas of the state and set fire to Muslim-owned properties.

Over 50 of those killed were in Ahmedabad. And 19 of them were relatives of former Congress MP Ehsan Jaffrey who himself was killed. They died when the building they lived in was set on fire in Meghaninagar. In an earlier incident, 17 Muslim slum-dwellers were also burned alive.

The Wakf Board offices in Gandhinagar were burned down and the Centre for Islamic Studies in Vadodara was ...

BACKLASH: A truck on fire in Ahmedabad.

... ple of mosques being attacked by VHP activists. Six buses and a truck were also set on fire.

Police arrested 700 people — 80 in Godhra, including two councillors — in connection with Wednesday's attack.

Two persons died and at least six were injured when police opened fire to disperse a rampaging mob in Ahmedabad on Thursday afternoon. Gujarat Chief Minister Narendra Modi has ordered a judicial inquiry of the attack. He said those responsible for the attack on the train would be detained under POTO.

“1947 সালের 27শে ফেব্রুয়ারি ‘মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু এবং উপজাতি এবং বাকি বিষয়সমূহ’ শির্ষক সংবিধান সভার পরামর্শদানকারী কমিটির সর্বপ্রথম আলোচনা সভায় সর্দার প্যাটেল বর্ণনা করেছিলেন :

আমাদের সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের জন্য প্রমাণ দেওয়ার দাবি একটি মেকি দাবি, একটি মিথ্যা দাবি এবং এ ব্যাপারে ভারতে আমাদের চেয়ে আর কেউই বেশি তৃপ্ত হতে পারে না। তাদের প্রত্যেককেই সন্তুষ্ট করাই হল আমাদের মিশন। চল প্রমাণ করি যে আমরা আমাদের শাসন করতে পারি এবং আমাদের অন্যদের শাসন করার কোনো আকাঙ্খা নেই।”

“গোধরাকাণ্ড দিয়ে শুরু হওয়া গুজরাটের মর্মস্পর্শী ঘটনা দুই মাসের বেশি সময় ধরে রাজ্যে সহিংসতার বাতাবরণ তৈরি করে এবং জাতিকে গভীরভাবে মর্মাহত করে। রাজ্যের জনগণের জীবন, স্বাধীনতা, সমতা এবং মর্যাদার অধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের সর্বাত্মক ব্যর্থতা সম্পর্কে কমিশনের মতামত নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অশান্তি প্রশমিত করে শান্তি ও সম্প্রিতি বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই সকল উচ্চ উদ্দেশ্যাবলি ন্যায়, প্রজাতান্ত্রিক সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং দেশের আইনের উপর ভিত্তি করেই অর্জন করা প্রয়োজন ছিল।”

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট 2001-2002

The Indian EXPRESS

THE FIRE AND THE FUEL

CM IS COOL

AT GROUND ZERO

DOUSING THE FLAMES

An eye for an eye blinds Gandhinagar

ON BLACK THURSDAY, THE EXCEPTION

Defence Minister, the Army reach Mr Modi's state

70 dead, cops watched with their eyes wide shut

Sangh lends a hand to save VHP's face: a glimmer of hope

'HOW CAN I FACE THE WORLD?'

Gujarat incidents a blot: PM

No let-up in Gujarat carnage

গুজরাটের মত ঘটনার দৃষ্টান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে ধর্মীয় ভাবাবেগ ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে।

> “মুখ্যমন্ত্রীর (গুজরাট) প্রতি আমার বার্তা এই যে তিনি ‘রাজধর্ম’ (Raj dharma) পালন করবেন। জাত, বর্ণ এবং ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে একজন শাসকের কোনো বৈষম্য করা উচিত নয়”— প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী, আমেদাবাদ, 4ই এপ্রিল, 2002”

এক নতুন ঐক্যমতের আবির্ভাব (Emergence of a new consensus)

1989 সালের পরের পর্বকে কংগ্রেসের পতন এবং বি.জে.পির উত্থানের সময়কাল হিসাবে দেখা হয়। যদি তুমি এই পর্বের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জটিল প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে চাও, তবে তোমাকে কংগ্রেস এবং বি.জে.পি দলের নির্বাচনী পারদর্শিতার মধ্যে তুলনা করতে হবে।

কংগ্রেস এবং বি.জে.পির পরিবর্তনশীল নির্বাচনী পারদর্শিতা (1984-2004)

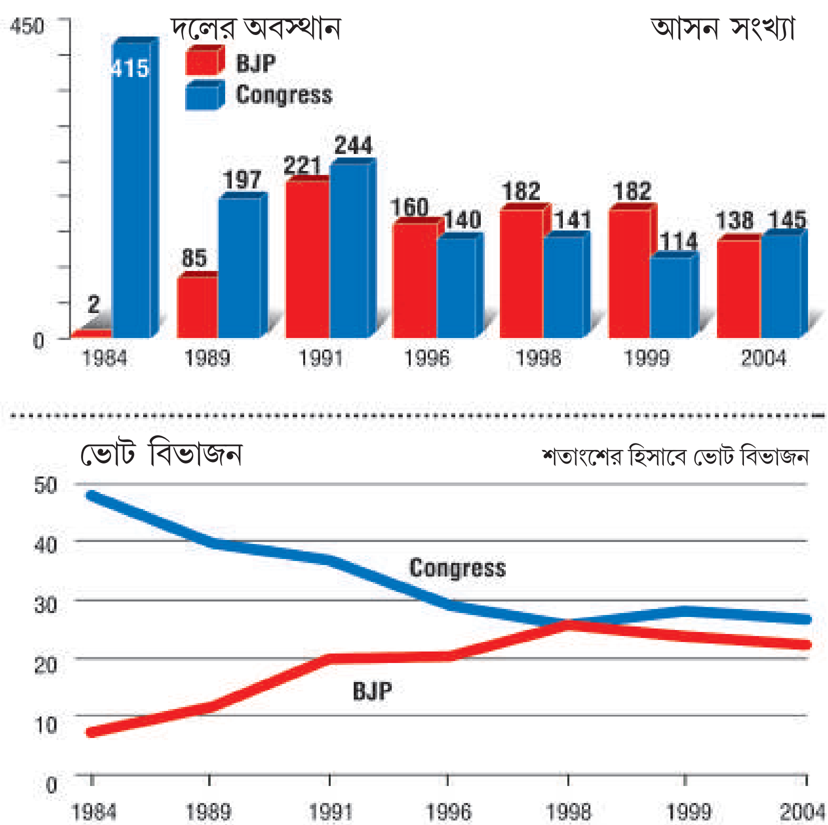

এখন, চলো আমরা লেখচিত্রে প্রদত্ত তথ্যের অর্থ বোঝার চেষ্টা করি।

- তুমি লক্ষ করবে যে বি.জে.পি এবং কংগ্রেস দল এই পর্বে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়োজিত ছিল। যদি তুমি

তাদের 1984 সালের নির্বাচনের সাথে তুলনা কর, তবে তাদের রাজনৈতিক ভাগ্যের মধ্যে কী পরিবর্তন লক্ষ্যকরবে ?

- তুমি লক্ষ করবে যে 1989 সাল থেকে কংগ্রেস এবং বি.জে.পি— দুই দলের প্রাপ্ত মোট ভোট পঞ্চাশ শতাংশের বেশি হয়নি। তাদের অর্জিত মোট আসন সংখ্যা লোকসভার আসনের অর্ধেকের বেশি ছিল না। তাই, বাকি ভোট এবং আসন কোথায় গেল ?
- কংগ্রেস এবং জনতাদলের 'পরিবারের' উভয় চার্টের দিকে তুমি লক্ষ কর। এই দলসমূহের মধ্যে যারা এখনও আছে, তাদের মধ্যে কোন্ দলগুলি কংগ্রেস পরিবারেরও অংশ নয় বা জনতা পরিবারের সদস্য নয় ?
- নব্বইয়ের দশকের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বি.জে.পির নেতৃত্বাধীন জোট এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোটের মধ্যে বিভক্ত। এই দুই জোটের কোনো একটিরও অংশ নয় এমন রাজনৈতিক দলগুলির তালিকা কি তুমি তৈরি করতে পার ?

লোকসভা নির্বাচন-2004 (Lok Sabha Elections 2004)

2004 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল বৃহত্তর আকারে জোটে প্রবেশ করে। এন.ডি.এ এর পতন ঘটলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ এলায়েন্স) ক্ষমতায় আসে। এই সরকার বাম মোর্চার দলসমূহ থেকে সমর্থন লাভ করে। 2004 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দলের আংশিক পুনরুত্থান লক্ষ করা যায়। 1991 সালে প্রথমবারের মত এই দল তার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। যাই হোক 2004 সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দলসহ মিত্র দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের সাথে বি.জে.পি এবং তার মিত্র দলগুলির প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান খুবই নগণ্য ছিল। এভাবেই দলব্যবস্থা সত্তরের দশক থেকে প্রায় নাটকীয়ভাবে বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের নব্বইয়ের দশ থেকে উদ্ভাসিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে চারটি রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠী যথা— কংগ্রেসের সাথে জোটবদ্ধ দলসমূহ, বি.জে.পির সাথে জোটবদ্ধ দলসমূহ, বামপন্থী দলসমূহ এবং এই গোষ্ঠীত্রয়ের বাইরে অবস্থানকারী দলসমূহের ধারণা আমাদের সামনে প্রতীয়মান হয়। এই পরিস্থিতি বহুমুখী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধারণাই ব্যক্ত করে এবং বহুমুখী রাজনৈতিক মতাদর্শের ধারণার তাৎপর্য বহন করে।

ক্রমবর্ধমান ঐক্যমত (Growing consensus)

যাই হোক, বেশিরভাগ দলের মধ্যে বহু সংবেদনশীল বিষয়ে এক ব্যাপক ঐক্যমতের ধারণা গড়ে উঠেছে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বহুবিধ দ্বন্দ্বের মধ্যেও বেশিরভাগ দলের মধ্যে এক ঐক্যমতের ধারণার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই ঐক্যমত চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথমত, নতুন অর্থনৈতিক নীতি— নতুন অর্থনৈতিক নীতিকে অনেকে বিরোধিতা করলেও বেশির ভাগ দল নতুন অর্থনৈতিক নীতিকে সমর্থন করেছে। বেশিরভাগ দল বিশ্বাস করে যে এই নীতিসমূহ দেশকে সমৃদ্ধির পথে এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক শক্তিতে এক সম্মানজনক স্থানে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল 2004

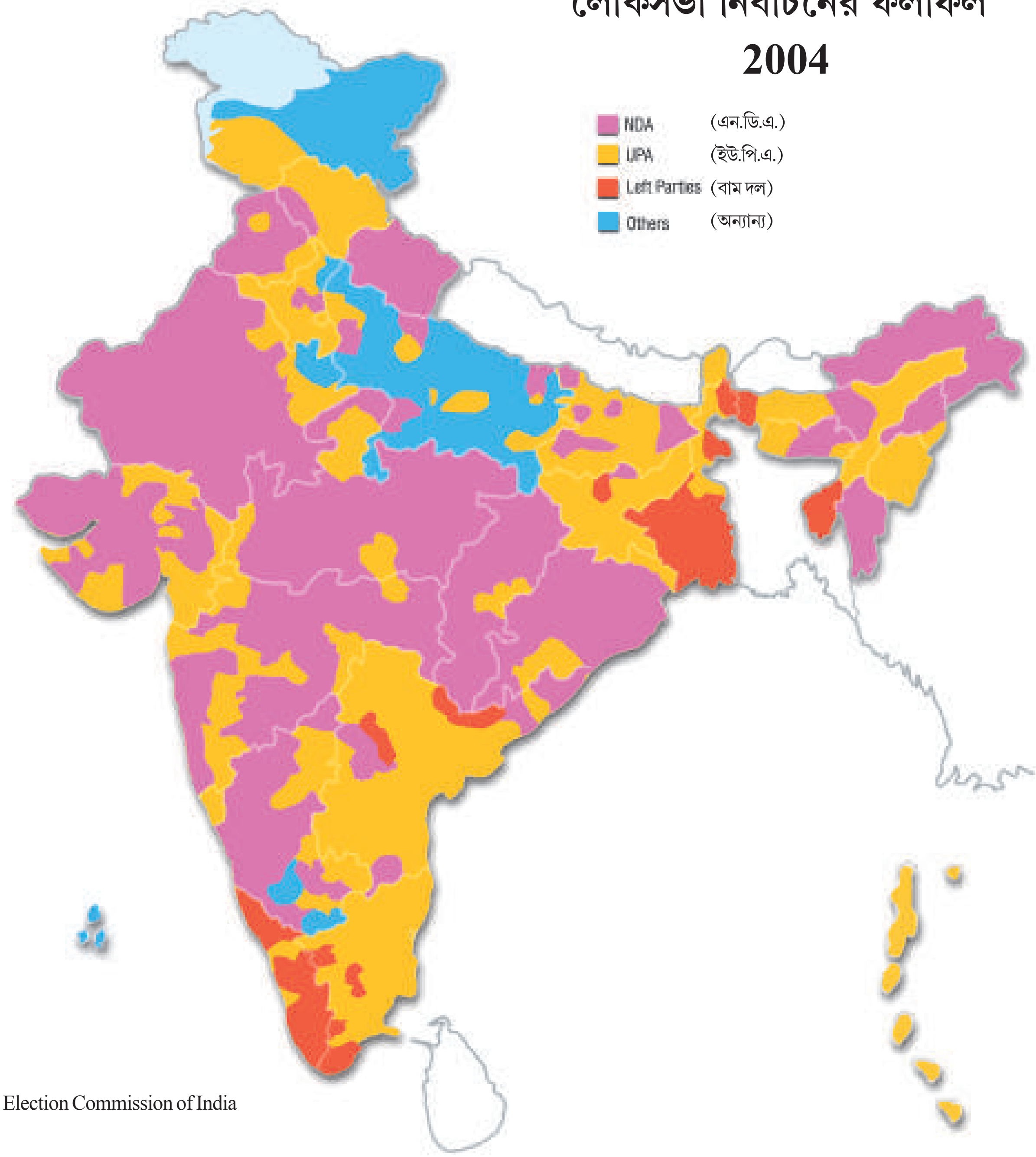

Source : Election Commission of India

Note : মানচিত্রে প্রদত্ত এই বর্ণনা স্কেল অনুসারে নয় এবং ভারতের বহিঃ সীমানার প্রামাণ্য বর্ণন হিসাবে নেওয়া ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, পশ্চাদপদ শ্রেণির রাজনৈতিক এবং সামাজিক দাবীর গ্রহণীয়তা— পশ্চাদপদ বর্ণের সামাজিক এবং রাজনৈতিক দাবির প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক দলসমূহ স্বীকার করে নিয়েছে। এর ফলে এখন সকল রাজনৈতিক দলই শিক্ষা এবং চাকুরিতে 'পশ্চাদপদ শ্রেণির' জন্য আসন সংরক্ষণের যৌক্তিকতা সমর্থন করছে। রাজনৈতিক দলগুলি ও.বি.সি সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতার অংশিদারত্ব নিশ্চিত করতে সচেষ্ট।

তৃতীয়ত, দেশ শাসনে রাজ্যস্তরের দলের ভূমিকার স্বীকৃতি— রাজ্য স্তরের এবং জাতীয়স্তরের দলসমূহের মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই গুরুত্ব হারাচ্ছে। আমরা এই অধ্যায়ে দেখেছি যে জাতীয়স্তরে রাজ্যস্তরের দলসমূহ ক্ষমতার অংশীদার হচ্ছে এবং বিগত কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের রাজনীতিতে এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে।

চতুর্থত, মতাদর্শগত চুক্তি ব্যতিরেকেই মতাদর্শগত অবস্থান এবং রাজনৈতিক জোটের চেয়ে বাস্তব বিচার বিবেচনার উপর গুরুত্ব আরোপ— জোট রাজনীতি রাজনৈতিক দলসমূহের দৃষ্টি মতাদর্শগত ব্যবধান থেকে ক্ষমতার অংশিদারমূলক ব্যবস্থাপনার উপর পরিবর্তিত করেছে। তাই, এন.ডি.এ এর বেশিরভাগ দল বি.জে.পির 'হিন্দুত্ববাদের নীতিকে সমর্থন করেনি। তথাপি, তারা একসাথে সরকার গঠন করে এবং পূর্ণ মেয়াদী ক্ষমতা ধরে রাখে।

এসকল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিকট ভবিষ্যতে রাজনীতিকে পরিশিলিত করতে চলেছে। ভারতে কংগ্রেসের একক প্রাধান্য বিস্তারকারী দল হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার আলোচনা দিয়েইই আমরা রাজনীতির আলোচনা শুরু করেছি। ঐ পরিস্থিতি থেকে আমরা এখন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতিতে এসে পৌঁছেছি যা প্রধান রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের মধ্যে দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট ঐক্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই, রাজনৈতিক দলসমূহ এই ঐক্যমতের পরিধির মধ্যে কাজ করলেও গণ-আন্দোলন এবং সংগঠনসমূহ যুগপৎ নতুন রূপ, লক্ষ্য ও উপায় পরিগ্রহ করেছে। গণ-আন্দোলনসমূহ দারিদ্রতা, উচ্ছেদন, ন্যূনতম মজুরি, জীবিকা এবং সমাজিক নিরাপত্তাকে রাজনৈতক এজেন্ডা করে রাষ্ট্রকে তার দায়িত্বশীলতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। অনুরূপভাবে শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ এবং ধর্মের নিরীক্ষে জনগণ ন্যায় এবং গণতন্ত্রের মত বিষয়সমূহকে তুলে ধরছে। আমরা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে পারি না। আমরা সবাই জানি যে গণতান্ত্রিক রাজনীতি ভারতে শান্তিপূর্ণ সহায়বস্থানের জন্যই প্রয়োজনীয় এবং এই অধ্যায়ে উল্লেখিত কিছু উপাদানের ধারাবাহিক চর্চার উপরই তা বজায় থাকবে।

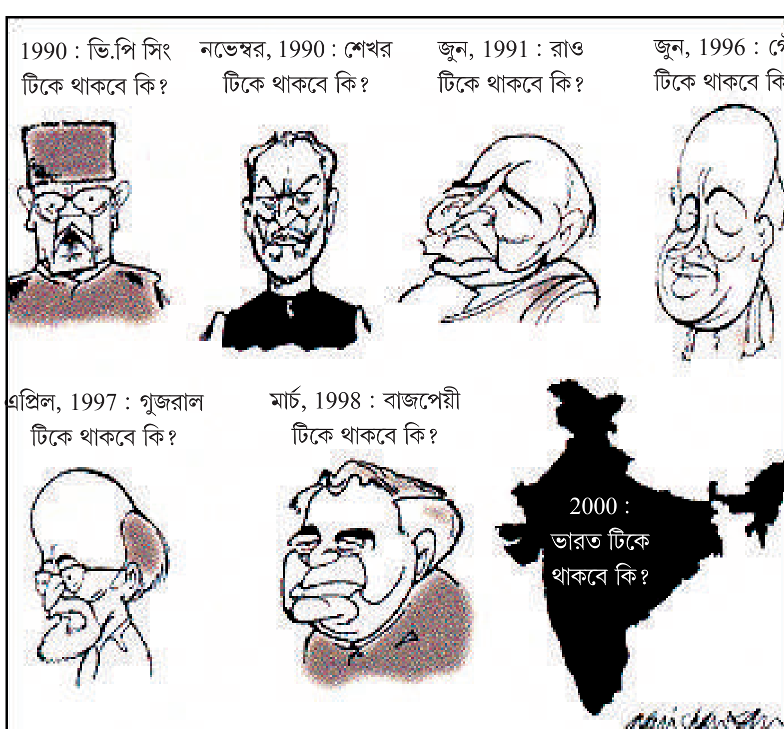

Credit: Ravishankar/India Today

ষোড়শ লোকসভায় রাজনৈতিক দলের অবস্থান
(19.02.2015 সাল পর্যন্ত)

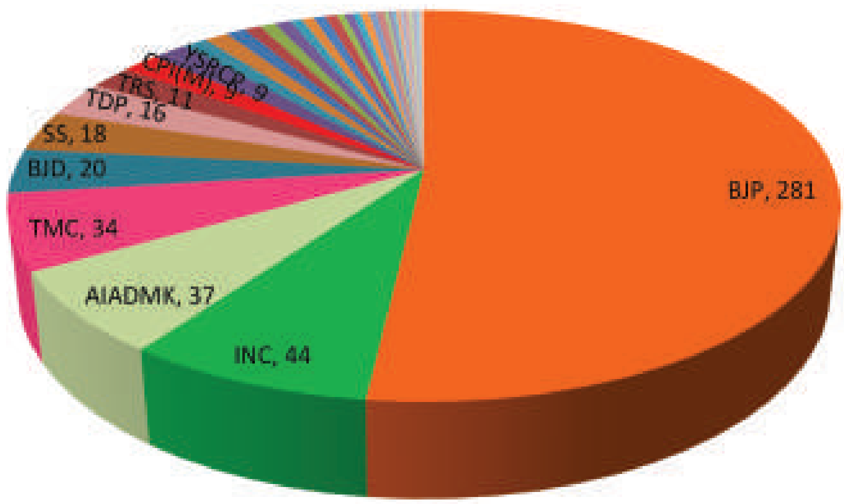

- ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) (281)
- ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস INC (44)
- অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড়া মুন্নেত্রা কাজহাগাম (AIADMK) (37)
- অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস TMC (34)
- বিজু জনতা দল (BJD) (20)
- শিবসেনা (SS) (18)
- তেলেগু দেশম (TDP) (16)
- তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি (TRS) (11)
- কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট) CPI(M) (9)
- যুবজন শ্রমিক রাইঠু কংগ্রেস পার্টি (YSRCP) (9)
- ন্যাশানালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (6)
- লোক জনশক্তি পার্টি (6)
- সমাজবাদী পার্টি (5)
- আম আদমি পার্টি (4)
- রাষ্ট্রীয় জনতা দল (4)
- শিরোমনি অকালি দল (4)
- অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রটিক ফ্রন্ট (3)
- জম্মু এবং কাশ্মীর পিপলস্ ডেমোক্রটিক পার্টি (3)
- রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টি (3)
- ইনডিপেনডেন্টস্ (3)
- ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল (2)
- ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (2)
- জনতা দল (সেকুলার) (2)
- জনতা দল (ইউনাইটেড) (2)
- ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (2)
- আপনা দল (2)
- কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়া (1)
- অল ইন্ডিয়া এন.আর. কংগ্রেস (1)
- কেরালা কংগ্রেস (M) (1)
- নাগা পিপলস ফ্রন্ট (1)
- ন্যাশানাল পিপলস্ পার্টি (1)
- পট্টলি মাক্কাল কাটচি (1)
- রিভলিউশনারি সোসালিস্ট পার্টি (1)
- সিকিম ডেমোক্রটিক ফ্রন্ট (1)
- অল ইন্ডিয়া মজলিস্-ই-ইত্তেহাদুল মুসলীমীন (1)
- স্বাভিমানী পক্ষ (1)

উৎস : (http:/loksabha.nic.in)

অনুশীলনী

1. উন্নি-মুন্নির একগুচ্ছ এলোমেলো প্রেস ক্লিপিংকে অর্থানুসারে বিন্যাস কর এবং ঘটনার পরম্পরা অনুসারে সাজিয়ে লিখ।

(a) মণ্ডলের সুপারিশসমূহ এবং সংরক্ষণবিরোধী বিক্ষোভ
(b) জনতা দল গঠন
(c) বাবরি মসজিদ ভাঙ্গান
(d) ইন্দিরা গান্ধির হত্যা
(e) এন.ডি.এ সরকার গঠন
(f) গোধরাকাণ্ড এবং তার প্রভাব
(g) ইউ.পি.এ সরকার গঠন

2. মিলিয়ে লিখ—

(a) ঐক্যমত্যের রাজনীতি	(i) শাহবানু মামা
(b) বর্ণভিত্তিক দল	(ii) ও.বি.সি সম্প্রদায়ের উত্থান
(c) ব্যক্তিগত আইন এবং লিঙ্গাজনিত ন্যায়	(iii) জোট সরকার
(d) আঞ্চলিক দলের শক্তি বৃদ্ধি	(iv) অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ক চুক্তি

3. 1989 সালের পরে ভারতীয় রাজনীতির প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ বিবৃত কর। রাজনৈতিক দলের কোন্ কোন্ বহুমাত্রিক বিষয়সমূহ এইসকল পার্থক্যের জন্য দায়ী?

4. "জোট রাজনীতির নয়া পর্বে রাজনৈতিক দলসমূহ মতাদর্শের ভিত্তিতে ঝুঁকছে না বা জোট ভেঙে বের হচ্ছে না"— তুমি এই বক্তব্য সমর্থন বা বিরোধিতা করার জন্য কী কী যুক্তি তুলে ধরবে?

5. জরুরি অবস্থাত্তোর রাজনীতিতে (Post Emergency Politics) এক তাৎপর্যবাহী দল হিসাবে বি.জে.পি দলের আবির্ভাবের ঘটনাবলী চিহ্নিত কর।

6. কংগ্রেস দলের একাধিপত্যের অবসান ঘটলেও দেশের রাজনীতিতে তার প্রভাব অব্যাহত রয়েছে— তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ কর? যুক্তি দাও।

7. অনেকেই বিশ্বাস করেন যে দেশের গণতন্ত্রের সফলতার জন্য দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা কাম্য। বিগত 30 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান ভারতের দল ব্যবস্থার সুবিধাসমূহের উপর একটি রচনা লিখ।

8. অনুচ্ছেদটি পড় এবং নিচের প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদান কর :

ভারতে দলীয় রাজনীতি বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কংগ্রেসি ব্যবস্থা শুধুমাত্র তার নিজেকেই ধ্বংস করেনি, কংগ্রেস জোটের খণ্ডীকরণ স্ব-উপস্থাপনার উপর নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করেছে, যা দলীয় ব্যবস্থা এবং বহুমুখী স্বার্থের গ্রন্থীকরণে তার ক্ষমতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।... বহুমুখী স্বার্থের কার্যকরী গ্রন্থীকরণ এবং পুঞ্জীকরণকারী দলীয় ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক দলের উদ্ভব করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সম্মুখীন।—জোয়া হাসান (Zoya Hasan)

(a) তুমি এই অধ্যায়ে যা পড়েছ তার আলোকে লেখকের উল্লেখ করা রাজনৈতিক ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লিখ।

(b) এই অধ্যায় থেকে ব্যবস্থাপনার অভাব এবং গ্রন্থীকরণের অভাবজনিত এমন একটি উদাহরণ দাও যা এই অনুচ্ছেদে রয়েছে।

(c) রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে বহুমুখী স্বার্থের গ্রন্থীকরণ এবং পুঞ্জীকরণ প্রয়োজনীয় কেন?

চল আমরা একসাথে কাজ করি

- এই অধ্যায়ে ভারতীয় রাজনীতির 2004 সালের নির্বাচন (চতুর্দশ লোকসভা) পর্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাবলির ধারণা প্রদান করে। পরে 2009 সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউ.পি.এ জয়লাভ করে। 2014 সালের নির্বাচনে বি.জে.পি নেতৃত্বাধীন এন.ডি.এ জয়ী হয়। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন দলের অবস্থান 193 পৃষ্ঠায় দেওয়া হল—
- লোকসভার ওয়েবসাইটে (http://loksabha.nic.in) ষোড়শ লোকসভার সদস্যদের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।
- ভারতের নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (http://eci.nic.in) থেকে 2009 সালের নির্বাচন (পঞ্চদশ লোকসভা) এবং 2014 সালের নির্বাচনের (ষোড়শ লোকসভা) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ফলাফলের তথ্য সংগ্রহ করে তাদের নির্বাচনী পারদর্শিতার তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপণ কর।
- 2004 সাল থেকে ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক মুহূর্তের একটি সময় তালিকা প্রস্তুত কর। এটা তোমার শ্রেণিকক্ষে ছড়িয়ে দাও এবং আলোচনা কর।